সন্ন্যাসী

পার্ব্বতীয় উপন্যাস।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"We must convince men that they are all sons of one sole God, and bound to fulfil and execute one sole law here on earth; that each of them is bound to live, not for himself, but for others, that the aim of existence is not to be more or less happy, but to make themselves and others more virtuous; that to struggle against injustice or error (wherever they exist) in the name and for the benefit of their brothers, is not only a right but a duty; a duty which may not be neglected without sin, the duty of their whole life."

"How many mothers had I caused to weep! How many more must learn to weep, should I persist in the attempt to rouse the youth of Italy to noble action—to awaken in them the yearning for a common country."

"More powerful upon me than any advice or any danger, were the exceeding grief and anxiety of my poor mother. Had it been possible for me to have yielded, I should have yielded to that."

Joseph Mazzini

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা;

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, আনন্দ-আশ্রম হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯৮ সাল।

উৎসর্গ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন

মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রিয়দর্শন,

আমি চির-দরিদ্র,—এ জীবনে কখনও রত্নের অধিকারী হইতে পারি
ই, বোধ হয় কখনও পারিব না। কেন পারিব না, তাহা আপনি বুঝিয়া-
; বুঝিয়াছেন, নির্জ্জীব অধীন বাঙ্গালী কখনও আর রত্নের অধিকারী হইবে
কারণ, কত যত্ন করিয়া আমাকে আপনি যে সকল রত্ন সংগ্রহ করিতে
য়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই অসার বালুকণা, অবশিষ্ট যাহা ছিল,
া দস্যু বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে। আমাকে আপনি আর কখনও
সংগ্রহ করিতে দেখিবেন না। এদেশ রত্নের আকর হইলেও, বর্ত্তমান
য় মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। আমি দীন দরিদ্র, চিন্তা-রত্নহীন, তবে
ানার চরণে কি অর্পণ করিব?

নাই কিছুই! আপনি সংসারের আসক্তিশূন্য হিতৈষী, দেশের বন্ধু,
আমার? মনের কথা জগতে ব্যক্ত করিলে কি হইবে? এইমাত্র
ন, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য যাহা, আমার জীবনের কল্পনার পরি-
ও তাহা; বিভিন্ন এই, আপনি স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিয়া
ার্থ হইয়াছেন, আমি এখনও কল্পনার তরণীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।
নাকে আদর্শ করিয়া এ তরণীকে স্বীয় সাধনার স্রোতে ভাসাইতে
ালে কত সুখী হইব!

কত সুখী হইব, কিন্তু তবুও ত রত্ন মিলিল না। আপনি কি রত্ন ভিন্ন
কিছুতেই পরিতোষ লাভ করেন না? না—আপনাকে আমি এরূপ
ার্থ জ্ঞান করি না। আমার হৃদয়ের যে স্থানে আপনি বিরাজ করিতে-
া, তাহা আমার জানিতে বাকী নাই, আর আমি আপনার হৃদয়ের এক

পার্শ্বে কি প্রকার মলিন বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাহাও আপনি জানেন আপনার জীবনের উচ্চ আদর্শে আমার আত্মা পবিত্রতার আভাস পাইয়াছে। আমার এই ধর্ম্ম-শূন্য মলিন আত্মা আপনার সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে কি না, তাহা আপনিই জানেন। আমি তাহা অনুসন্ধান করিতে চাহি না, আমার অনুসন্ধানের অধিকার নাই। আমি জানিয়াছি, আমার উপহার যতই সামান্য হউক না কেন, আপনার ঐ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, তাহাই অমৃতের ন্যায় গৃহীত হইবে। মনের কথা আজ ভাষার দ্বারা কি প্রকারে প্রকাশ করিব?

"সন্ন্যাসী" আমার হৃদয়ের অতি ভালবাসার পদার্থ, আজ ভূষণহীন, আজ ইহার "আত্মা" মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। "সন্ন্যাসী" রত্ন নহে, সামান্য বালুকণা; সন্ন্যাসীর কষ্টের জীবন অধ্যয়ন করিয়া এ সংসারে কাহারও নয়ন হইতে জল পড়িবে, এ আশা আমার নাই। সম অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন কে কাহার আদর বুঝিতে পারে? "সন্ন্যাসী" আর কোথাও স্থান পাইবে না, তাহা জানি, কিন্তু আপনার ঐ পবিত্র হৃদয়ে ইহাকে উপবিষ্ট দেখিলেই আমি কৃতার্থ হইব। "সন্ন্যাসী" ভূষণহীন, ধর্ম্মবিহীন, অপবিত্র, মলিন; আমি রত্নহীন, সংসারের দরিদ্র,—কারুণ্য পূর্ণ হৃদয়ে উপহার গ্রহণ করুন, সামান্য বস্তু গ্রহণ করিয়া সংসারে মহত্ত্বের পরিচয় দিন। আমার তৃষিত নয়ন দেখিয়া জলে প্লাবিত হউক।

কলিকাতা।
ফাল্গুন ১২৮৫ সাল।

আপনার স্নেহের
দেবাপ্রসন্ন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

সন্ন্যাসীর পূর্ব্ববারের পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদ দুটী এবার অতি কষ্টে পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইল। একটী পরিচ্ছেদ 'প্রথম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদ হইয়াছে; অন্যটী তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদ হইয়াছে। এই দুটী পরিচ্ছেদই 'সন্ন্যাসীর' ভূষণ নামে আখ্যাত হইয়াছে। পরিবর্ত্তন করাতে ইহাদের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একেবারে অপ্রকাশিত থাকা অপেক্ষা ইহাই ভাল, এই বিবেচনায়, সাধারণ সমীপে প্রকাশিত হইল।

সন্ন্যাসী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে।

দ্বিপ্রহর রজনী,—জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে চাঁদ মিটী মিটী হাসিতেছে। ক্রীড়াশীল চতুর মেঘ চন্দ্রের প্রফুল্ল হাস্যবদন দেখিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িতেছে, চাঁদ তবুও হাসিতেছে। এ অপরূপ প্রকৃতির ছবি কে দেখিবে? গ্রাম নিস্তব্ধ,—কোলাহল রহিত। ধন্য নিদ্রার মোহিনী-শক্তি, কি প্রকার প্রলোভন দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া গ্রামের সকল জীবজন্তুকে আপন রাজ্যের প্রজা-শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছে;—চক্ষু থাকিতে সকলেই দর্শন-শক্তি হইতে বঞ্চিত, কর্ণ থাকিতে সকলেরই শ্রবণশক্তি কার্য্যাক্ষম। সকলই নীরব, কেবা ছবি দেখিবে, কেবা প্রকৃতির নীরব সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইবে? দেখুক বা না দেখুক তাহাতে চন্দ্রের কি? নিঃস্বার্থ পরোপকার এ সংসারে চন্দ্রেই নিবদ্ধ; নচেৎ আর কে এমন নিস্তব্ধ সময়ে, সকল প্রকার যশ মানের আশা ছাড়িয়া, কোমল জ্যোতি বিস্তার করিতে পারে? এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গ্রামের সকলই নিদ্রায় অভিভূত, কিন্তু একখানি ঘরে মৃদু মৃদু ভাবে প্রদীপ জ্বলিতেছে; সে ঘরের সমস্ত দ্বারই মুক্ত, চন্দ্রের আলো যদৃচ্ছাক্রমে মুক্ত দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজত্ব করিতেছে। গৃহে দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক, দুইটীই জাগরিতা—একটী কুলবধূ, আর একটী সহচরী। এই গভীর নিশীথ সময়ে ইঁহারা কি করিতেছেন?

কুলবধূ। আমি পরোপকার বুঝিনা, ধর্ম্ম বুঝিনা; অন্যের চক্ষে জল দেখিলে মুছাইতে ইচ্ছা হয় কি না, তাহাও এখন জানি না; পরের দুঃখ দেখিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভিজে কি না, তাহাও অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু এখন যাহা বুঝিতেছি, তাহা নিশ্চয় করিব। সংসারের সকলই ভু

ইয়া দিয়াছি, থাকিয়া কি করিব? আর আমি আজ যে বেশ পরিলাম,—ইহা এজন্মে আর পরিত্যাগ করিব না; আমি সকল কথাই সরলভাবে তোমাকে বলিলাম, এক্ষণ আমাকে বিদায় দাও।

সহচরী। কোন্ প্রাণে তোমাকে বিদায় দিব? বিদায় দিয়া কি লইয়া থাকিব, বলত? যতক্ষণ আমার কথার উত্তর না পাইব, ততক্ষণ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না।

কুলবধূ। কেন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছি, তাহা তুমি ত জানই; যে না জানে তাকে বরং বলিতে পারি, তোমার নিকট বলিব কেন? এ মনের কোন্ কথা তোমার নিকট গোপন করেছি?

সহচরী। আমি যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে আর এখানে থাকা উচিত নয় বটে, কিন্তু চল আমরা বাড়ীতে যাই, সেখানে ত আমাদের সকলই আছে। আর এ বেশেই বা কেন যাইবে? পায়ে ধরি, আমাকে মনের কথা খুলিয়া বল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, একাকিনী গৃহে থাকিয়া কি করিব?

কুলবধূ। তুমি কোথায় যাইবে? আমি যে পথে চলিয়াছি, সে পথে যাইয়া আজ পর্য্যন্তও কেহ সুখী হইয়াছে, শুনি নাই, তুমি আমার সহিত কোথায় যাইবে?

সহচরী। তবে তুমি চলিয়াছ কেন? সে পথে যদি এতই কষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাকে বিদায় দিব না। তুমি কি করিবে?

কুলবধূ। আজ আমাকে বাঁধা দিতে পারে, এমন লোক ত দেখি না;—আমি যে পথে চলিয়াছি, এ পথে যাইলে আমি সুখী হইতে পারিব, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে নিষেধ করিও না।

সহচরী। পাড়ার আর সকলকে ডাকিয়া আনি, তাহারা তোমার এ বেশ দেখিয়া কি বলেন, দেখি।

কুলবধূ। তাহারা কি বলিবেন? এ জগতে আমার কি কেহ আপনার জন আছে? আমি কি ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি?

সহচরী। তবে ডাকি; তবে ডাকি?

"ছি ওকি, ছি ওকি সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ, আমাকে কি তুমি তাই ঠিক করেছ, আমাকে কি তুমি তাই ঠিক করেছ?" এই কথা বলিতে বলিতে সেই অভয়া বিদ্যুৎবেগে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহচরীও 'সেকি?—আমিও যাই,' বলিতে বলিতে ছুটিলেন।

নীরব জগতে নিদ্রার ক্রোড় হইতে নয়ন উন্মীলন করিয়া রজনীর এ দৃশ্য কেহই দেখিল না। দেখিল, কেবল সেই মৃদু হাসি হাসিয়া আকাশের চাঁদ। এ দৃশ্যের সাক্ষী রহিল অস্থায়ী চঞ্চল মেঘের আড়াল হইতে কেবল সেই অমিয়া-মাখা চন্দ্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শশ্মানে।

"দিক-হারা পথ-ভ্রান্ত পথিক, তুমি কোথায় যাইতেছ? অমাবস্যার রাত্রি, ভীষণ অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন,—এ ভয়ানক স্থান, এ রাত্রিতে এস্থানে, মানব,তুমি কেন একাকী ভ্রমণ করিতে আসিয়াছ?"

একজন সন্ন্যাসী, যোগ সাধন করিবার মানসে, অমাবস্যার রাত্রে কোন শ্মশানে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জগৎ নিদ্রায় অভিভূত, নিস্তব্ধ; বায়ু বৃক্ষের পত্র-পুঞ্জ ভেদ করিয়া শব্দ করিতে করিতে একদিক হইতে অন্যদিকে যাইতেছিল। শ্মশানের নিকটে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। সেস্থান হিমালয় পর্ব্বতের অতি সন্নিকট। বায়ু অত্যন্ত শীতল,—সন্ন্যাসীর শরীর বিভূতি আবৃত নহে, শীতে রোমাঞ্চিত। আকাশের নক্ষত্র কেবল সন্ন্যাসীর নয়নকে আকর্ষণ করিতেছিল। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দীর্ঘিকার স্বচ্ছ তরঙ্গায়িত সলিল সহ ক্রীড়া করিতে করিতে ভাসিতেছিল, সেদিকে সন্ন্যাসীর নয়ন একবারও পতিত হইতেছিল না। বৃক্ষের পত্র ভেদ করিয়া বায়ু ধাবমান হওয়াতে যে শব্দ উৎপন্ন হইতেছিল, সেদিকে মন ছিল না, কেন ছিল না, তাহা আমরা জানি না। সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধ-নয়ন হইয়া আকাশের নক্ষত্র দেখিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন;—

"মন, সংসারের দুর্গম পথের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইয়াছ,—আপনার অবলম্বন খুজিয়া পাইতেছ না? অবলম্বন কি? ঐ নক্ষত্র কি প্রকার সুন্দর,—কিন্তু অবোধ, অজ্ঞান, বুঝিলাম না, উহার ভিতরে কি আছে? বুঝিলে কি উহাকেই অবলম্বন করিতে পারিতাম না? আমাপেক্ষা বিজ্ঞ যিনি, তিনি বলিয়াছেন,উহাতে শ্রেষ্ঠ জীবের বাস আছে; থাকিতে পারে,কিন্তু আমিত তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না যখন,তখন ও

বিশ্বাস করিতে পারি না; যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহা অবলম্বন করিতে পারি না; তবে নিশ্চয় নক্ষত্রমণ্ডল আমার অবলম্বন নহে। তবে অবলম্বন কি? আমিই বা কি? কেন এ পথে আসিলাম?—কেন বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাইলাম? কেন আমার অবলম্বন পাইলাম না। সংসার ছাড়িয়া পর্ব্বত, আবার পর্ব্বত ছাড়িয়া এই নীরব শ্মশানে আসিয়াছি কেন? কারণ—সংসারে আমার অবলম্বন নাই; পর্ব্বতে বিভীষিকাময় প্রলোভন, তাইত এক্‌' পথ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি। সংসার অবলম্বনশূন্য;—সংসার আশ্রয়-শূন্য—কেন না সংসারে পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রেমের চিত্র দেখিতে পাই না—সংসারের সকলি চঞ্চল। কেন চঞ্চল, তাহা আমি বুঝিয়াছি। হায়,আমার মন যাহা চায়,তাহা সংসারে মিলিল না। সংসারে ভালবাসা আছে,—সে ভালবাসার অর্থ স্বার্থ,—তাইত সব ভাসাইয়া দিয়াছি; আর আমি লক্ষ্যবিহীন হইয়া অকূলে ভাসিয়াছি। কোথায় যাইব, জানি না; লক্ষ্য কি, জানি না, অবলম্বন কি, বুঝি না। শরীরও আমার না, আমিও শরীরের না, এ সংসারে আমার অবলম্বন কি, বুঝি না। যাহা অবলম্বন ছিল, তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। আমি কি, বুঝি না; আমার মন কি, জানি না; কেবল জানি, আমার অভাব; সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য এই শ্মশানের আশ্রয় লইয়াছি; কিন্তু এই শ্মশানের এমন কি শক্তি আছে যে,আমার অভাব পূর্ণ করিবে? শ্মশান,সংসারের সম্বন্ধ পরিত্যাগের স্থান!—যিনি শ্মশান-সেবক তিনিই মৃত, তাঁহার চিহ্নও আর দেখা যায় না! কোথায় মৃত জীব? সংসারের শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়; কিন্তু আর সকল? শরীরই কি জীবের সর্ব্বস্ব? বুঝি না, বুঝিতে পারি না। যদি তাই হয়, তবে আর অবলম্বন অন্বেষণ করি কেন? মরিবার জন্য আসিয়াছি, মরিয়া যাই, অবলম্বনে আর প্রয়োজন কি? মরিয়া যদি এই কঠোর জীবনের পথ শেষ করিতে পারি, তবে আর ভাবনা কি? তবেত, জীবনের অবলম্বন এবং লক্ষ্য, কেবল শ্মশান! কি সুখকর স্থান! কোলাহল-বিরহিত,—গম্ভীর, এ স্থানের প্রকৃতি কি মধুর!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই অচেতন অবস্থা যাহা, তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর্ব্বত শেখরে।

সেই সুস্নিগ্ধ অন্ধকারময়ী রজনী যথা সময়ে অন্তর্হিত হইল। আকাশের সেই উজ্জ্বল তারকাবলী মিট্ মিট্ করিয়া ক্রমে নিবিয়া গেল। নিস্তব্ধ শ্মশানের সেই গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইল। বায়ুর পরাক্রম-হ্রাসের সহিত সলিলের তরঙ্গ-লীলা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। আকাশের চতুর্দ্দিকে, দেখিতে দেখিতে, মেঘ সঞ্চিত হইল। উত্তরে গাঢ় কাল মেঘের ন্যায় গগনভেদী হিমময় পর্ব্বত শোভা পাইতে লাগিল। সেই সময়ে সেই অচেতন, অবলম্বন-শূন্য, ভাবনায় আকুল, সংসার-বীতরাগ সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা লাভ হইল, সন্ন্যাসী উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বসিয়া দাঁড়াইলেন। মস্তিষ্ক তখনও ঘূর্ণায়মান, হৃদয় তখনও অস্থির, সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন। তারপর কি করি-লেন? ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া কি ভাবিয়া যেন ধীরে ধীরে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিলেন। পর্ব্বতের সন্নিহিত বিস্তৃত অরণ্য যেখানে অত্যন্ত ঘনীভূত,—সেদিকে মনুষ্য ভ্রমেও ভয়ে পদ-সঞ্চালন করে না,—যেখানে কেবল বন্য জন্তুগণের আবাস, সেই দিকে চলিলেন,—অরণ্য ভেদ করিয়া একাকী উত্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় পুরুষ, অত্যন্ত সাহসী। সন্ন্যাসী সাহসের বলে ভয়ানক অরণ্য ভেদ করিয়া দুর্গম পর্ব্বতের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সে পথে মনুষ্য কখনও চলে নাই, সে স্থান অত্যন্ত ভীষণ বিভীষিকাময়। সেখানে কোথাও প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া অল্প সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থান ক্রমান্বয়ে লম্ব-ভাবে ৫০০।৬০০ ফিট আকাশের দিকে উঠিয়াছে, কোথাও ঘোর অরণ্য,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল প্রস্তর রাশি ভেদ করিয়া আপন আপন মস্তক গগনে তুলিয়াছে; কোথাও বা পর্ব্বত বিদারিত করিয়া স্বচ্ছ সলিল অবিরত নিম্নে ধাবিত হইতেছে; কোথাও বা গভীর অতলস্পর্শ ক্ষুদ্র গুহা; সেদিকে চাহিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, শরীর বিকম্পিত হয়। এরূপ স্থলে মানবের পদস্খলন হইলে, কোথায় যে তাহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়, তাহা নির্ণয় করাও মানবের ক্ষমতার অতীত। এই প্রকার দুর্গম স্থান সন্ন্যাসীর পাদচারণের

ভূমি, সন্ন্যাসীর ভ্রমণের প্রশস্থ ক্ষেত্র। সুকৌশলে নিমেষ মধ্যে সন্ন্যাসী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর রাশি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর পদ একবারও স্খলিত হইল না;—শরীরভেদ করিয়া একবিন্দুও ঘর্ম্ম বহির্গত হইল না;—এই প্রকার দুর্গম স্থান ভেদ করিয়া সন্ন্যাসী কোথায় চলিলেন? লক্ষ্য কি? লক্ষ্য যাহাই হউক, সে লক্ষ্য লাভ সন্ন্যাসীর একান্ত বাঞ্ছনীয়; ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, শরীর ক্লীষ্ট নহে, অবিশ্রান্ত চলিলেন। মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইল,—বেলা ক্রমে কমিয়া আসিল। সূর্য্যের রশ্মি প্রায়ই সে দুর্গম স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না; মেঘমালাই রশ্মির প্রধান প্রতিবন্ধক; আর যদি বা কখনও মেঘরাশি স্খলিত বা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কিম্বা উর্দ্ধে স্থানান্তরিত হয়, তাহা হইলেও গগনস্পর্শী বৃক্ষ সকলের ঘনীভূত পত্র ভেদ করিয়া রশ্মি পৌঁছিতে পারে না। প্রাতে এবং অপরাহ্নে উভয় পার্শ্বের আকাশস্পর্শী পর্ব্বতমালা সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে। সন্ন্যাসীর পথ প্রায়ই সূর্য্যের রশ্মি-শূন্য। অল্প বেলা থাকিতে সন্ন্যাসী পর্ব্বত চূড়া অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। এক চূড়া অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতেই সম্মুখে আর এক প্রকাণ্ড চূড়া, তারপর আবার চূড়া, এই প্রকার প্রায় ৩০।৪০টী ক্ষুদ্রতম শেখর অতিক্রম করিয়া, একটী বৃহৎ শেখর সন্নিহিত গুহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা অবসান প্রায়। গুহার দ্বারদেশে পাদচারণের শব্দ শ্রবণে গুহা-স্বামী চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে, এ স্থানের শান্তি-বিনাশকারী হইয়া কে আসিলে?'

স্বামীজী তখন তপশ্চর্য্যা শেষ করিয়া ফল মূল ভক্ষণোদ্দেশে প্রস্তুত হইতেছিলেন। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, আমি।

স্বামী বলিলেন,—"হরিনারায়ণ"? এস বৎস, অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই।

সন্ন্যাসী গুরুদেবের চরণে ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিলেন, তারপর বলিলেন,—দেব! আমি অবলম্বন শূন্য হইয়াছি,—আমার মন অস্থির হইয়াছে, তাই আপনার নিকটে আসিয়াছি।

স্বামীজী উত্তর করিলেন,—আমি তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি; ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাধীন পদার্থে সুখ অন্বেষণ করিতে যাইয়া মানব কখনও সুখী হইতে পারে না; কারণ, ইন্দ্রিয় চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের অবলম্বনও চঞ্চল, এ সকল

বিষয় আজ আমি বিশেষ করিয়া বলিব না, তবে এই মাত্র বলি, ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, না হইলে মনুষ্যের মন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অস্থির হইয়া পথ-ভ্রান্ত হয় ও অগম্য, অস্বাভাবিক পথে যাইয়া উপস্থিত হয়। সংসারের প্রলোভনে জয়ী হওয়া অত্যন্ত কঠিন, রিপুকে একেবারে বশ করিতে না পারিলে কেহই জয়লাভে সমর্থ হয় না। যাহা সংসার, তাহা চিরকাল সংসার, তাহা চিরকাল চঞ্চল। এ সংসারে অর্থাৎ এই পার্থিব জগতে তাঁহারই অবলম্বন আছে, যিনি ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত ভোগ বিলাস হইতে মনকে ফিরাইয়া, সেই অতীন্দ্রিয় পদার্থে মন সমর্পণ করিতে পারেন। সংসারের সুখ আর সংসারের শান্তি সকলই নশ্বর শরীরের ন্যায় ক্ষয়শীল ও চঞ্চল; তবে অচঞ্চল, অবিনশ্বর পদার্থ ভিন্ন চির উন্নতিপ্রিয় মনের অবলম্বন আর কে হইবে? তুমি বা কে, আমি বা কে, যদি আমাদের চির উন্নতিশীল আত্মার অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি। আত্মা অবয়ব-রহিত,—সংসারের অবলম্বন রহিত; মনের বৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়াধীন, চিন্তা সকলের দাস স্বরূপ, আত্মার অবলম্বন এ সংসারের কোন পদার্থ নহে। যাঁহারা মনকে রিপু সকলের উত্তেজিত ভাবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া, আত্মার কুশলের দিকে প্রধাবিত করিতে পারেন, তাঁহারাই এ সংসারে ধন্য। মনকে সংসারের নরকে ফেলিয়া দিয়াছ, বৎস, তোমার আত্মা আর কাহাকে অবলম্বন করিবে বল ত? মন আত্মার যন্ত্র স্বরূপ, এই যন্ত্র বিকৃত হইলে আত্মা অস্থির হয়, অবলম্বন শূন্য হয়; তোমার মনকে সংসার হইতে টানিয়া আন,আত্মার কল্যাণের প্রতি ধাবিত কর, প্রকৃত অবলম্বন যাহা, তাহা অনায়াসে লাভ হইবে। নচেৎ মনকে সংসারের বাজারে ছাড়িয়া দিয়া কখনও আশা করিও না, আত্মাকে শান্তিতে রাখিতে পারিবে। আত্মার অবলম্বন এক ভিন্ন দুই নহে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, যিনি আত্মার চির উন্নতিশীলতা স্বীকার করেন, তিনিই জানেন, আত্মার অবলম্বন এক। সংসারের পদার্থ শরীর ও ইন্দ্রিয়, সংসারের সুখ পাইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে; কিন্তু আত্মা অবয়ব-রহিত এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত, কি প্রকারে সংসারে শান্তি পাইবে? যখন আত্মার যন্ত্র মন সংসারের সুখ অন্বেষণ করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধনে রত থাকে, তখনই আত্মা রোগগ্রস্ত হয়। তোমাকেও সেই রোগ অধিকার করিয়াছে। বৎস! আমরা যে সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি, ইহার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। ভোগ

বিলাসের আসক্তি পরিত্যাগ কর, প্রলোভনে জয় লাভ কর, সংসারের সুখ বিসর্জ্জন দেও, আত্মার অবলম্বন আপনিই লাভ হইবে; নচেৎ মনকে সংসারে রাখিয়া কেন চঞ্চলমতি বালকের ন্যায় আত্মার অবলম্বন অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হও? রোগ নির্ণয় না হইলে কখনও উপযুক্ত চিকিৎসা হইতে পারে না; আমি তোমার যে রোগ নির্ণয় করিলাম, ইহা কি যথার্থ নহে?

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল, সহসা এক আশ্চর্য্য ভাব উপস্থিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী স্বামীজীর পায়ের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রভু! আমি মরিয়াছি, আমি ডুবিয়াছি,—আমার আর উপায় নাই, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।"

স্বামী অবিচলিত ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন; তারপর সন্ন্যাসীর মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"বৎস! এক্ষণ সুস্থির হও, এক্ষণ সুস্থির হও।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপত্যকা ভূমিতে।

যে পর্ব্বত গুহায় গুণরাম স্বামীর যোগাশ্রম, তাহার উত্তর দিকেই পর্ব্বত ক্রমনিম্ন হইয়া সমতল ভূমি আশ্রয় করিয়াছে; সেই শেখর হইতে সমতল ভূমি ২০০০ হাজার হাত নিম্নে। সমতল ভূমির এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া একটী প্রবল বেগবতী নদী, উত্তর পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে, বিদ্যুৎবেগে চলিয়া যাইতেছে; ঐ নদীর নাম তৃষ্ণা; ঐ নদীই অন্য একটী নদীর সহিত মিলিত হইয়া জলপাইগুড়ীর পূর্ব্ব সীমায় প্রশস্ত বক্ষ ধারণ করিয়া তৃষ্ণা নামে খ্যাত হইয়াছে। দারজিলিঙের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমায় বড় রঙ্গিত ও ছোট রঙ্গিত নামে দুইটী নদী প্রবাহিত আছে। ছোট রঙ্গিত অপেক্ষা বড় রঙ্গিত অত্যন্ত বেগবতী; বড় রঙ্গিত সিকিম প্রদেশ ভেদ করিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎপত্তি স্থান হিমগিরি; ছোট রঙ্গিত নেপাল এবং দারজিলিঙ্গ সীমার মধ্যভাগের সহস্র সহস্র ঝরণার মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। এই ছোট এবং বড় রঙ্গিত মিশিয়া যে স্থানে এক হৃদয় এবং এক বক্ষ ধারণ করিয়াছে, আমরা সে স্থানের অনেক

পূর্ব্বদিকের কথা বলিতেছি। সে স্থানের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় ভূটানের সীমান্ত প্রকাণ্ড পর্ব্বত; উত্তরে সিকিম্ প্রদেশ, পশ্চিমেও সিকিম অধিকৃত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণী। তখনও সে সকল স্থান কুটীল চক্রান্তের মোহিনী শক্তির প্রভাবে ইংরাজ-করায়ত্ত হয় নাই।

বৃক্ষপূর্ণ পর্ব্বতের অতুল শোভা, গিরি-সঙ্কটের ভয়ানক বিভীষিকা, নির্ঝরিণীর আশ্চর্য্য সুমধুর স্বর, হিমগিরির গগনভেদী শ্বেত-মস্তকের রমণীয় মূর্ত্তি, আর উপত্যকা ভূমির মেঘ উৎপত্তি এবং মেঘের অত্যাশ্চর্য্য লীলা ও ক্রীড়া কাহারও লেখনী বর্ণনা করিতে আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নাই। কবির আশ্চর্য্য লেখনী-নিঃসৃত স্বভাবের যে সৌন্দর্য্য পাঠ করিয়া একদিন মোহিত হইয়াছিলাম, এ নয়ন সমক্ষে যখন সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ক্রীড়া করিতে আসিল, তখন ভাবিলাম, কোথায় স্বর্গ, আর কোথায় নরক! প্রাকৃতিক শোভা অনেক প্রকার; অফুরন্ত পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যরাশি তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; আবার পার্ব্বত্য শোভার মধ্যে হিমগিরি সন্নিকটস্থ স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কবির লেখনী আজন্ম যোগ তপস্যা করিলেও এ স্থানের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে পারিবে না। অনন্ত আকাশে ভাসমান মেঘরাশির সহিত যে প্রকাণ্ড বিস্তৃত পর্ব্বতরাশি, অবিরত, বরফ মস্তকে ধারণ করিয়া, লীলাখেলা করিতেছে—একখানি মেঘ নামিতেছে, একখানি উঠিতেছে, পর্ব্বতস্থিত বরফ-রাশি সূর্য্যের রশ্মিতে অল্পে অল্পে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, আর সেই স্খলিত বরফরাশি হইতে উৎপন্ন অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ সাগর-সঙ্গমে ছুটিতেছে, কাহা-রও বাধার প্রতি দৃক্‌পাত নাই,—সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যাই-তেছে; আবার সেই স্রোত হইতে অপরাহ্নে শত সহস্র খণ্ড মেঘ নিমেষ মধ্যে উৎপন্ন হইয়া অনন্ত আকাশ পানে ধাবিত হইতেছে। নিমেষ মধ্যে সহস্র সহস্র খণ্ড মেঘের উৎপত্তি, নিমেষ মধ্যে বায়ুভরে তাহাদিগের গগন স্পর্শ; নিমেষ মধ্যে অনন্ত সাগরে পরিণতি; আবার নিমেষ মধ্যে পর্ব্বতের ভীম মূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ; এ সকল যিনি দেখিয়াছেন, তাহার নয়ন হইতেই অলক্ষিতে বারি পতিত হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে; কিন্তু কি সাধ্য মানবের যে, সেই সৌন্দর্য্যরাশি অন্যের নিকট বর্ণন করিয়া কৃতার্থ হইবেন? পর্ব্বতবাসী ভাবুকগণই অনুভব করিতে পারেন, নিমেষ মধ্যে বৃষ্টির উৎপত্তি, নিমেষ মধ্যে সূর্য্যদর্শন, আর নিমেষ মধ্যে অকূল সাগর-সঙ্গম কি পদার্থ! কোথাও কিছু নাই, আকাশ পরিষ্কার,—চতুর্দ্দিকের

পর্ব্বত গগন স্পর্শ করিয়াছে, চতুর্দ্দিকেই নির্ঝরিণীর সুস্বর কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে; চতুর্দ্দিকের পাখীর কলরব একই সময়ে কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিতেছে; চক্ষু নির্নিমেষে কতই কি দেখিতেছে! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আবার দর্শক একাকী সমুদ্রে ভাসিতেছেন! কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! কোথায় লুকাইল সেই গগনভেদী ভীষণ পর্ব্বত, কোথায় গেল শব্দ, কোথায় গেল কলরব, কোথায় গেল আকাশ, কোথায় গেল আশ্রিত ভূমি, দর্শককে মেঘে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, দর্শক নিমেষ মধ্যে অকূল সমুদ্রে ভাসিলেন। ভাসিলেন, কতক্ষণের নিমিত্ত? হয়ত এক মুহূর্ত্ত পরেই গগনে আবার সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি দীপ্তি পাইতেছে। কোন কোন পর্ব্বতের স্থানে স্থানে রশ্মি, কোথাও অন্ধকার, কোথাও খণ্ড-মেঘ, কোথাও আবার সেই বৃক্ষ সমূহ। বিধাতার লীলা—কোথায় বা গেল সাগর—কোথায় বা গেল অনন্ত বারিপুঞ্জ। যখন দর্শক এইরূপ শোভা দেখিতে নিমগ্ন হন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবিয়া যায়; কি সাধ্য তাঁহার যে সেই দৃশ্য বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ হইবেন? উপত্যকা,মেঘ-উৎপত্তির স্থান। আমরা যখন মেঘোৎপত্তির শোভা দেখি,তখন আত্মহারা হইয়া বলি, "মেঘ, সময় পাইয়াছ, লীলা খেলা কর, একবার উৎপন্ন হও, একবার ঊর্দ্ধে উঠ, আর একবার পতিত হইয়া পৃথিবীর বক্ষ শীতল কর; আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হই; এ কথা আর কাহাকে বলিতে যাইব না, কারণ কে বুঝিবে? সংসারের সত্য ঘটনাও লোকের নিকট অবিশ্বাসের যোগ্য, তোমার এই লীলা-চাতুরী সংসারের লোকের নিকট কি বলিব!" যখন পর্ব্বতবাহিনী নির্ঝরিণীতে ছোট বড় নানা মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে,দেখি, তখন বলি,"মৎস্য, ক্রীড়া কর, সাগর হইতে এই ৪০০০ হাত উপরে ক্রীড়া করিতে আসিয়াছ, ক্রীড়া কর; আমরা বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই, জড়বাদ-পক্ষপাতী অবিশ্বাসীর অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাউক।" আমরা যখন উপত্যকায় দাঁড়াইয়া দেখি, সেই উত্তরের গগনস্পর্শী শুভ্র পদার্থরাশি হইতে এক খানির উপর আর এক খানি করিয়া বরফরাশি স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তখন বলি, "প্রকৃতির শোভা, এ সংসারে তুমিই সুখী; আমরা অসার সংসারের লোক, অপদার্থ হইয়া গেলাম নরকের শোভা দেখিয়া; পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া তোমরা এই প্রকারে সাগরে প্রধাবিত হইয়া যাও।"

আর এসকল কথার প্রয়োজন নাই; অযথা প্রলাপ বাক্য ব্যয় করিয়া অসম্ভব কীর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টার ফল কি, পাঠকগণের ধৈর্য্য বিনষ্ট করিয়া

...কি? আমরা এক্ষণ সংক্ষেপে সেই প্রকৃত শোভার ভাণ্ডার উপত্যকা হইতে আমাদিগের উপন্যাসের অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হই। সেই উপ... এক পার্শ্বে প্রবল স্রোতস্বতী তৃষ্ণার সন্নিকটে একটী ভুটীয়া দেব...। মন্দিরের ভিতর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সহিত পরেশনাথ প্রভৃতি আরও ...ক দেবমূর্ত্তি বিশেষ বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দিরের চতু-পার্শ্বে সহস্র সহস্র দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। মন্দিরের পুরোহিতগণ লামা নামে খ্যাত। লামা শব্দ তিব্বৎ ভাষায় পুরোহিতের নামান্তর। লামাগণ বিশুদ্ধাচারী—পরম ধার্ম্মিক, অনেক যোগ তপস্যা ভিন্ন কেহই লামা হইতে পারেন না। পার্ব্বতীয় সকল জাতিরই লামা নাম ...র অধিকার আছে। লামাগণের সন্তান সন্ততি থাকে না, কারণ অবি-বাহিত ভিন্ন কেহই লামা হইবার উপযুক্ত নহে। লামাদিগের কার্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, এবং যোগ তপস্যা। আমরা যে মন্দিরের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ঐ মন্দিরে অনেকগুলি লামা থাকিতেন; তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি ঋষিতুল্য, শ্মশ্রু-বিরহিত, চুল পরিপক্ক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংসারের ভোগ বিলা-সের আশা পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার নির্জ্জীব এবং নিস্তেজ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও এক প্রকার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই মন্দিরের নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে পাহাড়ীদিগের বসতি। এই উপত্যকার পূর্ব্বধারেই প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী গগন ভেদ করিয়া আকাশে উঠি-য়াছে, এই পর্ব্বত ভুটানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর; ইহার উপরে স্থানে স্থানে ভুটানের সৈন্য থাকিত।

মন্দিরের নিকটেই একটী অপ্রশস্ত পথ; সে পথ কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে, তাহা আমরা এক্ষণ বলিব না। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, এই নিবিড় অরণ্যময় পর্ব্বতশ্রেণীতে এই ক্ষুদ্র সোপানা-...শোভিত না থাকিলে, ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসের এক অধ্যায় কলঙ্ক-...র চিহ্ন স্বরূপ হইয়া পৃথিবীকে প্রতারিত করিত না, আর দুর্ভেদ্য ... দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও সিকিম রাজ্য যে কলঙ্কের বোঝা মস্তকে বহন ...ছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া এই দূরদেশবাসী নির্জ্জীব শরীরের শীতল ...বিন্দু নিশ্চল ধমনীর মধ্যে উষ্ণতর হইয়া বেগে ধাবিত হইত না। ...র আবর্ত্তনের ঘোরতর জঞ্জাল রাশি পরিপূর্ণ ঘটনাচক্র যতদিন কুটীল ...মী হইয়া চলিবে, ততদিন আমাদের সুখ শান্তির আশা কোন্ অতল-

স্পর্শ জলধির নিম্নে লুক্কায়িত রহিবে, তাহা কে জানে? বিধাতার অনন্ত লীলা-চক্র-ব্যূহ ভেদ করিয়া সে আশা-চিত্র নিরীক্ষণ করা মানবের সাধ্যাতীত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যশলাল সিংহ ও তাঁহার কন্যা মরীচি।

যশলাল সিংহ সিকিমের সীমান্ত প্রদেশের শান্তিরক্ষক সেনাগণের অধিনায়ক। যশলালের বয়স ৪০ বৎসরের অধিক নহে; শরীর বলিষ্ঠ, সৎসাহসী, পূর্ব্বে তিনি সামান্য তীরধারী সেনার কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার বুদ্ধি, বল এবং সুকৌশলে সিকিম রাজ্য অনেক দিন পর্য্যন্ত শান্তিতে ছিল। যশলাল সুশিক্ষিত না হইয়াও বুদ্ধি এবং প্রতিভাবলে সিকিম রাজ্য রক্ষার্থ যে সকল মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, বিদেশীয় লেখনী প্রসূত পক্ষপাতী পঙ্কিল ইতিহাস তাঁহার বিষয় উল্লেখ না করিলেও, সন্নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে চিরকাল সে সকল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিত। আর যদি কখনও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশবাসী,—প্রান্তরবাসী জাতি সকলের সহিত ইহাদের মনের ভাব, সহানুভূতির সুকৌশলে, বিনিময় হইতে থাকে, তাহা হইলে তখন এই যশলাল সিংহ অনন্তকাল ভারতবাসীর অন্তরে স্বদেশের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ জাগরূক থাকিবেন।

যশলাল সিংহের জন্ম লেপ্‌চা বংশে। পর্ব্বতবাসী জাতি সকলের মধ্যে লেপ্‌চা জাতি সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। কেবল সৌন্দর্য্য বলিয়া নহে, ইহাদিগের স্বভাব বিনম্র ও অমায়িক, হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ; মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। ইহাদিগের জীবনের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব এই যে, কখন ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ দৃষ্ট হয় না। সকলেই যেন এক পরিবার ভুক্ত; সকলেই সকলকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে। এই একতার আর একটী সুন্দর প্রকৃতি এই, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া অনাহারে মরিয়া গেলেও স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে চায় না। অনেক স্থলেই দেখা যায়, যখন আর আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী মিলে না, তখন ইহারা আলুর ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষের মূল ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে। বর্ত্তমান সময়ে চায় বাগনা

প্রভৃতিতে অনেক লোক প্রবেশ করিলেও, যখন তাহাদিগের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটু কঠোর নিয়ম প্রচলিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠে, তখনই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া চাকরী ছাড়িয়া দেয়। সময় সময় স্বাধীনতা-অপহরণকারী-গণের প্রতি ইহারা এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে যে, যতক্ষণ তাহাদের উষ্ণ রক্ত শীতল মৃত্তিকায় পাতিত করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহারা সুস্থির হয় না। লেপ্‌চা জাতির পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ অধিকতর বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকায় এবং অত্যন্ত সুশ্রী।

পর্ব্বতবাসী জাতিসমূহের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই স্বাধীন, কেহই কাহারও অধীন নহে; ভালবাসাও কোন নিয়মে আবদ্ধ নহে। যাহার সহিত যাহার প্রণয় জন্মে, সে-ই তাহাকে বিবাহ করে; এই প্রকার স্বেচ্ছাবিবাহে কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। বর কন্যার প্রণয় জন্মিয়াছে, ইহা কর্ত্তৃ-পক্ষীয়দিগের কর্ণগোচর হইলেই তাহারা বিবাহের আয়োজন করে; আর যদি কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিয়া সেই প্রকার বিবাহে কর্ত্তৃ-পক্ষীয়েরা অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে বরকন্যা পলায়ন করিয়া স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক একত্রে বাস করে; উহাই তাহাদিগের বিবাহ। বাল্যবিবাহ ও অসম্মত বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। বিধবাবিবাহ ইহাদিগের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে।

যশলাল সিংহের দুইটী কন্যা, দুইটীই সুন্দরী; একটীর বয়স দ্বাবিংশতি বৎসর, অন্যটীর বয়স বিংশ বৎসর মাত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীর নাম সুরুচি, ছোটটীর নাম মরীচি। শৈশব সময় হইতে দুই ভগ্নী গলা ধরাধরি করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে খেলা করিয়া বেড়াইতেন; দুই ভগ্নীরই মন পবিত্র, পাপের অস্পৃশ্য, দুইটীই একসঙ্গে মিলিয়া বুদ্ধদেবের মন্দিরে দেব সেবায় নিযুক্তা থাকিতেন। যশলাল সিংহ কন্যাদিগকে বাল্যকাল হইতে উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাহাদিগের স্বভাবের স্বাভাবিক সুন্দর গতিরোধ করিতেন না। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মন্দিরের কুমারী-শ্রেণীতে কন্যাদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

সেই মন্দিরে প্রত্যহ লামাদিগের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে একটী লোক আসিতেন; তিনি হিন্দি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। লামাগণ তাঁহার নিকট হইতে হিন্দুদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, আর তিনি তাঁহা-দিগের নিকট বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। মরীচি এবং সুরুচি উভয়েই

মনোযোগ পূর্ব্বক পর্ব্বতবাসী এবং প্রান্তরবাসী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পরস্পর শাস্ত্র-বিনিময় ক্রিয়া সন্দর্শন করিতেন।

এই প্রকার ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, মরীচির হিন্দি ভাষা অধ্যয়ন করিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। যে লোকটী লামাদিগকে হিন্দিতে হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ শিক্ষা দিতেন, তিনি একজন সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত, তিনি ৬।৭ বৎসর একাদিক্রমে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতের সংস্কৃত পাঠ ও তাহার হিন্দিতে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মরীচির উক্ত ভাষাদ্বয় শিক্ষা করিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহার পিতা যশলাল সিংহের নিকট মনের কথা বলিলেন। তাঁহার পিতা কন্যার বিদ্যাশিক্ষার্থ আন্তরিক যত্ন অনুভব করিয়া আহ্লাদ সহকারে লামাগণকে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে মরীচির অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। লামাগণ প্রান্তর হইতে আগত পণ্ডিত জীউকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলে, উক্ত পণ্ডিত মরীচিকে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভালবাসার সুন্দর ছবি।

এক বৎসরের মধ্যে, পণ্ডিতের বিশেষ চেষ্টায় এবং স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে, মরীচি বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন। এক বৎসরের পর হইতেই মরীচি পণ্ডিতের সহিত হিন্দিতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন।

বিজন অরণ্যেও ফুল ফুটে, ভীষণ মরুভূমিতেও সরসী শোভা পায়। যেখানে কণ্টক, সেখানেও কোমল পদ্ম থাকে ; আবার যেখানে বজ্রপাৎ হয়, সেখানেও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। মনুষ্যের অজ্ঞাতসারে জগতে কত প্রকার বিভিন্ন প্রকার আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার গণনা কে করিতে পারে ?—অরণ্যে কত ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া শুকাইয়া যায়, মনুষ্যে তার কয়টি গণনা করিয়া রাখিয়াছে ? মনুষ্যের চিন্তাশক্তি যেখানে পৌছিতে পারে না, মনুষ্য যেখানে বিভীষিকা দেখে, সেখানেও সুখ শান্তি আছে। দিন চলিয়া গেল,—বিজন অরণ্যে ফুল ফুটিল ; দিন চলিয়া গেল,—ভীষণ মরুভূমিতে সুন্দর সরসী সৃষ্ট হইল। যেখানে কণ্টক ছিল, সেখানে কোম-

লতা আসিল। যেখানে কাঠিন্য শোভা পাইত, সেখানে বিনম্রভাব উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইল,—পর্ব্বত-পালিতা বনলতা মরীচি, অপ্রেমের কণ্টক-ময় রাজ্যে বাস করিয়াও, প্রেমের কুসুম হৃদয়ে ধারণ করিলেন। মরীচির উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ নয়ন কোমল চন্দ্রের ন্যায় শতধারে চতুর্দ্দিকে প্রেমের জ্যোতি বিস্তার করিতে লাগিল। এ দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইল কে? সেই পর্ব্বত-বিহারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। মরীচির পড়া শুনায় শিথিলতা জন্মিল, পড়িবার সময় একাগ্র মনে সস্নেহ নয়নে পণ্ডিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। পর্ব্বতপালিতা বনলতা প্রেম কি, প্রণয় কি, কিছুই ভাল করিয়া জানে না, বিশেষতঃ লামাগণ অবিবাহিত, সে স্থানে স্ত্রী পুরুষের মিলন অতি অল্প; তবুও পণ্ডিতের পানে চাহিয়া থাকে। মরীচির দেখিতে ভাল লাগিত ঐ একটী পদার্থ;—পণ্ডিতের মুখশ্রী; শুনিতে ভাল লাগিত ঐ একই স্বর,—পণ্ডিতের মুখ-বিনিঃসৃত অমৃতময় সংস্কৃত কবিতা। মরীচির আর পুস্তকে মন নাই, বিমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় উন্নত কর্ণে, সজল নয়নে পণ্ডিতের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; তিনি এরূপ ভাবের যথার্থ মর্ম্ম কি, বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অনেক প্রকার উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিত না; পুস্তক সম্মুখে খোলা থাকিলেও মরীচি এক পৃষ্ঠাও এক দিনে সমাধা করিতে পারিতেন না, কেবল বলিতেন,—'পণ্ডিত মহাশয়! আপনার কথা শুনিতে আমার বড় ভাল লাগে;—আবার সেই কবিতাটী বলুন।' এই প্রকারে সমস্ত দিবস বিরক্ত হইয়া পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, মরীচি বসিয়া মৃদু মৃদু ভাবে হাসিতে থাকিতেন; সে ছবি দেখিয়া কোন্ পাষণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে? পণ্ডিত কি উপায়ে মরীচির এই স্বভাব সংশোধিত হইতে পারে, উপায়হীন হইয়া চিন্তা করিতেন।

কিছুদিন পরে অনুরাগের এই প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। যাহা ভাল লাগিত আগে কেবল কল্পনায়, এখন তাহা মনে ধারণা হইল; এতদিন ভাল লাগিত যাহাকে কেবল বাহ্যিক স্বরে ও সৌন্দর্য্যে, এইক্ষণ তাহাকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল। মরীচি এক্ষণ আর সংস্কৃত কবিতা শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, এখন আর কেবল মুখের প্রতি তাকাইয়াই তৃপ্ত হন না; এখন মনের কথার বিনিময় করিয়া, পরস্পর এক হইবার ইচ্ছা হইয়াছে। এখন মরীচি সকল সময় কেবল গল্প করিয়াই সময় নষ্ট করিতে ভালবাসেন।

সে গল্প কি প্রকার? পাঠক, পর্ব্বতে উঁকি মারিয়া একবার বিকশিত প্রেমকুসুম দেখিয়া লও। তোমরা অন্ধকার রজনীতে শিব-মন্দিরে অবলার মৃদু হাসি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছ, তোমরা কুন্দনন্দিনীর অর্দ্ধ-পরিস্ফুট প্রণয়ের গীতিতে পরিতোষ লাভ করিয়াছ; তপস্বিনী কপালকুণ্ডলার সরল কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ, ঠিক কথা; আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। একজন ভালবাসিলে অন্য সেই ভালবাসায় নিমেষ মধ্যে আকৃষ্ট হয়, এ চিত্র তোমরা অনেক দেখিয়াছ। উপকারী বন্ধুর প্রতি কোমলমতি রমণীর ভালবাসা কি প্রকারে আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা তোমরা দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ এবং মৃণালিনী পড়িয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। এ সকল স্বাভাবিক চিত্রে বাস্তবিকই হৃদয় পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ভাল'র ধারে মন্দ ফুল কি ফোটে না? কোকিলের ধারে কাক কি ডাকে না? তাই বলি, আমাদের এই অস্বাভাবিক পর্ব্বত-কন্দরস্থ লুক্কায়িত পবিত্র প্রেমের অস্ফুট চিত্রের প্রতি তোমরা একবার তোমাদের চির পরিতৃপ্ত নয়নকে ফিরাও। এ চিত্রও তোমাদেরই জন্য।

মরীচি এখন স্পষ্ট করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনার কি বিবাহ হইয়াছে? যদি বিবাহ হয়ে থাকে"—আর কথা মুখ হইতে বাহির হয় না। এই প্রকার অর্দ্ধ প্রশ্ন কতবার জিজ্ঞাসা করিয়া মরীচি তিরস্কৃত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পণ্ডিত বলেন,—তোমার সে খবরে কাজ কি, তোমার কাজ অধ্যয়ন, অধ্যয়নে নিযুক্তা থাকিবে।

মরীচি বলেন,—আচ্ছা আমি ভালকরে পড়া অভ্যস্থ করিলে কি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন?

পণ্ডিত মহাশয় অগত্যা তাতেই স্বীকার করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বলেন, আজ বলিব না, কল্যকার পাঠ অভ্যস্ত হইলে বলিব। এই প্রকার করিয়া ১৫।১৬ দিন চলিয়া গেল, এই অবসরে মরীচি আর একখানি পুস্তক সমাপ্ত করিলেন, কিন্তু তবুও প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। একদিন পণ্ডিত মহাশয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন,—পণ্ডিত মহাশয়! আপনার পায়ে পড়ি, বলুন, আপনার বিবাহ হইয়াছে কি না? আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পণ্ডিত। তোমার প্রয়োজন অধ্যয়ন, অন্য কোন বস্তুতে তোমার প্রয়োজন থাকা উচিত নহে।

মরীচি। পণ্ডিত মহাশয়! আপনার বাড়ীতে আর কে আছেন? আপনি কত বৎসর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন?

পণ্ডিত। এ সকল সংবাদে তোমার প্রয়োজন কি? আমরা সন্ন্যাসী, কাহারও নিকটে জীবনের কোন অংশ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না; তুমি আমাকে অযথা প্রত্যহ বিরক্ত করিও না; এই প্রকার করিলে আমি আর তোমাকে পড়াইব না।

মরীচি। আপনি সন্ন্যাসী,—তাত শুনিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, কি করিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায়? আমার ইচ্ছা আমিও আপনার ন্যায় সন্ন্যাসিনী হই; পণ্ডিত মহাশয় বলুন না, কি করিলে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায়?

পণ্ডিত। ইহ সংসারের কোন পদার্থে মনকে আসক্ত না রাখিয়া, যিনি জীবের কল্যাণের আকর পরব্রহ্মের প্রতি মনকে ধাবিত করিতে পারেন, তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হওয়া অত্যন্ত কঠোর সাধনা; ইচ্ছা করিলেই সকলে সন্ন্যাসী হইতে পারেন না।

মরীচি। আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ; আপনি যখন সন্ন্যাসী হইতে পারিলেন, তখন আমি পারিব না কেন? বলুন না, কি করিলে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায়?

পণ্ডিত। আমি তোমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ভার পাই নাই; আমি তোমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না, যদি তোমার আর অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ না থাকে, তবে কল্য হইতে আর আমি এখানে আসিব না।

মরীচি। তবে থাক্ আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। আপনি এখানে না আসিলে আমিও আর এখানে থাকিব না।

পণ্ডিত। তুমি কোন্ স্থানে যাইবে?

মরীচি। আমি সন্ন্যাসিনী হব!

পণ্ডিত। কি প্রকারে সন্ন্যাসিনী হইবে?

মরীচি। আমি আপনার ন্যায় সাজ ধারণ করিব; আর আমার জীবনের কাহিনী কাহাকেও বলিব না।

পণ্ডিত। আমি তোমার পিতার নিকটে এ সকল কথা বলিব ; বাস্তবিক তোমাকে এতকরে বুঝাইয়াও যখন তোমার মন ফিরাইতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় আমি তোমাকে শিক্ষা দিতে অক্ষম, এ সকল কথা তোমার পিতার নিকট এবং লামাগণের নিকট বলিব। তুমি আমাকে যে ভাবে বিরক্ত করেছ, এ কথা তাঁহারা শুনিলে নিশ্চয় তোমার প্রতি বিরক্ত হইবেন। তুমি এখনও আমার কথা শুন।

মরীচি। বাবা আমার কি করিবেন? বাবা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তিনি কখনও আমার মতের অন্যথাচরণ করিবেন না। আপনি এদেশীয় আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না বলিয়া এ প্রকার বলিতেছেন ; কন্যা উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে ; পিতা মাতার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

পণ্ডিত। আমি শুনিয়াছি, বিবাহ সম্বন্ধে এই নিয়মই বটে, কিন্তু তুমি তোমার পিতার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, এ কথা শুনিলে তোমার পিতা নিশ্চয় তোমার প্রতি রাগান্বিত হইবেন। আর লামাগণের এই মন্দির হইতে নিশ্চয় তুমি দূরীভূতা হইবে। তুমি আমার এ সকল কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। আমার নিকট শিক্ষা লইয়া তুমি সন্ন্যাসিনী হইলে, আমারও সর্ব্বনাশ হইবে।

মরীচি। আমার কিছুই হইবে না, তাহা নিশ্চয়, তবে আপনার বিপদ ঘটিবারই সম্ভাবনা। আমাকে বলুন,—আপনি বিবাহ করিয়াছেন কি না? নচেৎ পিতার নিকট বলিয়া দিব, আপনিই শিক্ষা দিয়া আমাকে সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন, পিতা তাহা শুনিলে আপনার জীবন ধারণ করা ভার হইবে।

পণ্ডিত। তুমি মিথ্যা কথা বলিবে? তা আমার কখনও বিশ্বাস হয় না। আর যদিই বল, তাতেও আমি ভীত নহি ; যদি তোমার মিথ্যা কথা শুনিয়া তোমার পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে আর আমি কি করিব? যখন এ দেহ ধারণ করিয়াছি, তখন নিশ্চয় একদিন মৃত্যু হইবে ; আমি মৃত্যুর ভয়ে আমার মতের বিরুদ্ধে কখনই কার্য্য করিতে পারিব না।

মরীচি। আপনিই ত একদিন আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আত্ম-

ঘাতী হওয়া মহাপাপ, আজ যদি আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার মৃত্যুর দ্বার উদ্ঘাটন করেন, তবে কি আপনার পাপ হইবে না ?

পণ্ডিত। তুমি যাই বল না কেন, আমার জীবনের কাহিনী কখনও তোমাকে বলিব না। এই কথা বলিয়া পণ্ডিত মরীচির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তার পরদিন হইতে আর মরীচির সহিত পণ্ডিতের স্যাক্ষাৎ নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অবলার প্রকৃতি।

তার পরদিন, তার পরদিন, তার পরদিন, এই প্রকার দিন আসে আর দিন যায়। মরীচি ইচ্ছা পূর্ব্বক অমৃতের আশায় যে গরল গোপনে চুম্বন করিয়াছিলেন, তাহার জ্বালা ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হইল। সুরুচি এ সকল কিছুই জানিতেন না, কনিষ্ঠা ভগ্নী বিদ্যাবতী হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কতই সুখ, তিনি দিন রাত্রি দেবমন্দিরের কার্য্যে তৎপর থাকেন। দিন আসে, দিন যায়, পণ্ডিত আর আসেন না ; মরীচির মুখ আর প্রফুল্ল হয় না, মরীচির আর কিছুই ভাল লাগে না।

ভগিনীর দুঃখ, ভগিনীর অসহ্য যন্ত্রণা আগে ভগিনীই অনুভব করিতে পারিলেন। ভগিনীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা ভগিনীই জানে। পুরুষকে ভালবাসা, পবিত্র প্রেমের গভীর উত্তেজনায় অন্যকে ভালবাসা, এ সকল মানব চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ সাধনা হইলেও, সেই দেবমন্দিরবাসিনী ভগিনীগণের শিক্ষার নিয়ম বিরুদ্ধ-কার্য্য। আসক্তি নির্ব্বাণ করিতে হইবে, সেখানকার এই শিক্ষা। মরীচি এই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেন না, তিনি সকলকেই হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। পণ্ডিত এ সকলই জানিতেন, জানিয়া তিনি সতর্ক হইলেন, তিনি জ্ঞানী। অবোধ যুবতী মরীচিও এ সকল জানিতেন, কিন্তু তিনি মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বৃত্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন, দেবমন্দিরের প্রধান শিক্ষা আত্ম-সংযমে অক্ষমা হইলেন। সুরুচি ভগিনীর মনের ভাব উত্তমরূপেই বুঝি-লেন, চারি পাঁচ দিন পরে মরীচিও কোন কথা ভগিনীর নিকট গোপনে

রাখিলেন না। সুরুচির মনে আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু তিনি এই নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য ভগিনীকে কোন প্রকার তিরস্কার করিলেন না। আর কি করিলেন? এই সকল পবিত্র চিত্র যাহাতে হৃদয় মন হইতে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতে পারেন, তজ্জন্য একান্ত মনোযোগী হইলেন। কারণ মন্দিরের কঠোর নিয়ম ভালবাসার বিরোধী। এ সকল কথা মন্দিরবাসী স্ত্রী পুরুষ এবং মরীচির পিতা মাতা গুরুজন সকলের নিকটেই গোপনে রহিল।

মরীচির রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে যাইয়া সুরুচির দেবসেবা কমিয়া গেল, মন্দিরের কার্য্য করিতে তাদৃশ সময় পাইতেন না। মন্দির-বাসী সাধকগণ মরীচির পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সুরুচির এ ত্রুটি প্রসন্ন মনে মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। সুরুচি ভগিনীকে লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কোন প্রকারে মরীচিকে অন্য মনস্ক করিতে পারিলেই রোগ প্রতিকার হইবে।

মরীচি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে পরিতৃপ্তা হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে মনের জ্বালা ক্রমে ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কোন একটী ভাল ফুল দেখিলে কিম্বা কোন একটী ভাল পাখীর গান শুনিলে তাহার মনে হইত, আজ পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া এই সুখ ভোগ করিলে কত হর্ষ বৃদ্ধি হইত। অতুল শোভার ভাণ্ডার পর্ব্বতে শ্রেণীগাঁথা মেঘরাশি দর্শন করিলে শকুন্তলা ও কাদম্বরীর জীবনের এক অধ্যায় তাহার মনে পড়িত। বিচিত্র শোভাযুক্ত বৃক্ষলতা বেষ্টিত শীতল স্থানে গমন করিলে, তাহার মনে স্বামীর পরিত্যক্তা, সরলমতি সীতার কথা জাগিয়া উঠিত। এই সকল কথা মনে হইলে তাহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িত।

সমস্ত দিন এই প্রকার ভাবে পর্ব্বত-শেখরে, পর্ব্বত-গুহায়, অরণ্যে, কাননে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন।

একদিন পর্ব্বত শেখরে ভ্রমণ করিতে করিতে মরীচি বলিলেন,— আচ্ছা দিদি, তুমিত আমাকে প্রত্যহ কত প্রকার উপদেশ দেও, বলত সুন্দর প্রস্ফুটিত ফুল দেখিলে, তুমি তাহা আগ্রহ সহকারে ছিঁড়িয়া আনিতে যাও কেন?

সুরুচি। ফুল দেখিলে বড় মামা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, তাঁর জন্য ফুল তুলি।

মরীচি। তাঁহার সন্তোষের জন্য তুমি এত লালায়িত হও কেন?

সুরুচি। তাঁহার নিকট আমি অনেক উপকার পাইয়াছি, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন।

মরীচি। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কি আমি কোন উপকার পাই নাই? তবে তাঁহাকে ভালবাসা কি আমার উচিত নহে? তিনিও ত আমাকে ভালবাসেন।

সুরুচি। তাঁহাকে ত তুমি ভালবাসিয়াই থাক, ভালবাসিতে নিষেধ করে কে? তবে যাহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, তাহা করা উচিত নহে। আমি ফুলকে যে প্রকার ভাবে ভালবাসি, আমি আমার বড় লামাকে যে প্রকার ভালবাসি, তুমিও সেই প্রকার ভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে ভালবাস। তবে অবৈধ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমরা পর্ব্বতবাসিনী, আমরা বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রণালীকে ঘৃণা করিয়া থাকি; তুমি বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাও, তজ্জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিয়া থাকি।

মরীচি। তুমি এই মাত্র বলিলে, ফুল পাইলে বড় লামা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং বড় লামার নিকট হইতে তুমি অনেক উপকার পাইয়াছ বলিয়া তুমি ফুল তোল; বাস্তবিক বড় লামাকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন ফুল তোলাতে তোমার আর কোন উপকাব নাই। আমিও ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি, তবে তিনি যাহা ভালবাসেন, আমি তাহা করিব, তাতে তুমি আপত্তি কর কেন?

সুরুচি। তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের মনস্তুষ্টার্থে কি করিতে চাও? ফুল তুলিবে? তা যত পার তোল না কেন?

মরীচি। তিনি ফুল তোলাকে পাপকার্য্য বলেন; তিনি বলেন, বৃক্ষের সৌন্দর্য্য যাহারা অপহরণ করে, তাহারা যারপর নাই পাষণ্ডী; তিনি ফুলে সন্তুষ্ট হন না।

সুরুচি। তবে তুমি কি করিতে চাও?

মরীচি। আমিও তাঁহার ন্যায় বেশ ধরিব।

সুরুচি। তাতে কি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন?

মরীচি। বোধ হয় হইবেন। আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে এ সংসারে কে না সুখী হয়?

সুরুচি। তুমি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? এমন কথা বলিও না,

বাবা শুনিলে তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যে কথনই প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না।

মরীচির মুখ মলিন হইল, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, দিদি, কাল যে দুইটী সাহেব মন্দিরে আসিয়াছিল, উহারা বেশ, দেখিলে বোধ হয় উহারা দেবতার ন্যায়, উহাদিগকে আমার ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

সুরুচি। উহারা ম্লেচ্ছজাতি, উহাদিগের মুখ দেখিলেও আমাদিগের ধর্ম্ম লোপ হয়, তুই কেমন করে বলিলি, উহাদিগকে তোর ভালবাসিতে ইচ্ছা করে?

মরীচি। তুমি যাহাই বল, বিদেশীয় লোকের প্রতি তুমি গালাগালি বর্ষণ করিও না; বিদেশীয় লোক দেখিলেই আমার ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। উহাদিগের মনের ভাব জানিতে পারিলে আমি কত সুখী হই! আমার ইচ্ছা করে, আমি উহাদিগের সহিত যাই।

সুরুচি। তুই হলি কি? যা মুখে আসে, তাই বল্‌ছিস্, একটুও লজ্জাবোধ হয় না। তুই আজ যা যা বল্লি, এ সকলই বাবার নিকট বলে দেব। ম্লেচ্ছ জাতি আমাদিগের পরম শত্রু, বাবা বলেছেন, এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহারা গোলমাল করিয়া এই অঞ্চলের সর্ব্বস্ব অপহরণের চেষ্টায় আছে; তুই কেমন করে ইহাদের সহিত যাইতে চাহিলি? ইহারা বনের পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত জাতি; বাবা আরও বলেছেন, ইহারা যে রাজ্যে গমন করিয়াছে, সেই রাজ্যেরই পূর্ব্বশ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমি তোর এ সকল কথা বাবাকে বলে দেব।

মরীচি মৃদু মৃদু ভাবে হাসিলেন, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমি বাবাকে বলে দিও, তিনি আমাকে বিলক্ষণ জানেন।

সমস্ত দিবস এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলিয়া দুইটী ভগ্নী আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রলোভন ও মানবের মন।

বাতাস পাইলে নির্ম্মল, বীচিমালা-শূন্য, পরিপাটী নদীবক্ষ আন্দোলিত হয়, আহ্লাদে হউক আর নিরানন্দেই হউক, আপনার ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া আপনিই নৃত্য করিয়া উঠে। আবার অন্যস্থলে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিরাশি বাতাস পাইলে স্বীয় তেজের মহিমায় মাতিয়া উঠে, একটী শিখা হইতে শত শিখা উৎপন্ন হইয়া নিমেষ মধ্যে মহা অগ্নিকাণ্ড সৃজন করিয়া তোলে। ভৌতিক জগতের এই সকল অপরিহার্য্য নিয়মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া মানবের ক্ষমতার অতীত। কত নৌকাপথযাত্রী, আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া, বায়ুর গতি স্থির দেখিয়া আশার বলে নদীতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, কে তাহার গণনা করিয়া রাখিয়াছে? আবার কত পল্লীগ্রাম, দৈনিক জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের ব্যবহার্য্য দ্রব্য লইয়া ক্রীড়া করিতে যাইয়া যে মহা অগ্নিকাণ্ড উৎপাদন করিয়া নিমেষ মধ্যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাও গণনা করা সাধ্যাতীত। ভৌতিক কাণ্ডের অদ্ভুত লীলা চাতুর্য্য চিরকাল আপন কৌশলপূর্ণ ক্রীড়ায় মত্ত থাকিবে,—মানবের কোন প্রকার বল প্রয়োগেই সে সকল স্থগিত হইবার নহে। মনুষ্যের মনও নদীবক্ষের ন্যায়, মনুষ্যের মনও আন্দোলনের বস্তু। মনুষ্যের মনও যতই নির্ব্বাণোন্মুখ হউক না, সুপবনে ইহা হইতেও প্রজ্জ্বলিত শিখা বাহির হয়। মানব মন দর্পণের ন্যায় চঞ্চল ছায়াময় প্রতিকৃতির ভাঁণ্ডার কি না, তাহা আমরা এ স্থলে আলোচনা করিব না। চঞ্চল ভালবাসর প্রতিরূপ স্থায়ীরূপে মানব মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে কি না, সে প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই, তবে এই মাত্র জানি, মানব যতই জ্ঞানী হউন না কেন, যতই চিন্তাশীল হউন না কে, কাননের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিলে তাহার মনে যে চঞ্চল সুখের অভ্যুদয় হয়, তাহা তিনি আপন ক্ষমতায় মরুভূমে বসিয়া ভোগ করিতে পারেন না। নদী-জলে অবগাহন করিয়া দুইটী রমণী ক্রীড়া করিতেছেন, একবার ডুবিতেছেন, আবার ভাসিতেছেন, ফুল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, দুইটীই সাঁতার দিয়া

ফুল ধরিতে যাইতেছেন, সন্তরণোৎপন্ন তরঙ্গাঘাতে ফুল অভিমান সহকারে আরো দূরে সরিয়া যাইতেছে, রমণীগণ ক্লান্ত হইয়া ফিরিলেন, এ চিত্র দেখিলে সকলের মনেই ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সেই ভাবান্তরের রূপান্তর থাকিতে পারে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু যাহার মনে অস্থায়ী বিমল আনন্দ নিঃস্বার্থ ভাবে উদিত হয়, তাহার মনের সেই আহ্লাদের সুখ সে দৃশ্য না দেখিলে কখনই হইত না। কিম্বা অন্য কথায় বলিতে হইলে, আমরা যাহা বলিব, তাহা এই,—প্রলোভনে মন বিচলিত হইতে পারে। প্রলোভন হইতে দূরগত মানবের মন যে বিচলিত হইবার নহে, তাহা আমরা বলি না; কিন্তু যে কখনও প্রলোভন দেখে নাই, তাহার মন বিচলিত হয় না। তবে যদি বল, সে সংসারের সুখ দুঃখেরও ধার ধারে না, সে স্বতন্ত্র কথা। নদীতে তরঙ্গের লীলা-চাতুর্য্য কখনও শোভা না পাইলে নদীর এত আদর হইত কি না, তাহা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা বলি, শোভা সৌন্দর্য্য দেখিলে মানবের মন পরিবর্ত্তিত হয়; বাতাস পাইলে নদীবক্ষ ক্রীড়া করে। আমরা বলি, মানবের মনে দর্পণের স্বচ্ছগুণের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা বলি, মানব যতই ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হউন না কেন, সংসারের শোভা সৌন্দর্য্যে, প্রেম ও প্রণয়ে, তাহার মনেও শোভা সৌন্দর্য্য, প্রেম ও প্রণয় প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ঐ সকল যদি বিঘ্নকারী হয়, তবে মানবকে কে রক্ষা করে? মাজী যদি পটু হয়, মানবের জ্ঞান ও বিবেক যদি বলযুক্ত থাকে, সারবান থাকে, তবে সহস্র তরঙ্গ কাটিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে প্রকার বিবেক সম্ভবে না। মাজীর দোষে এই ভবনদীর তুফানে অনেক নৌকা আরোহী সমেত অতল পাপ-সলিলে নিমগ্ন হইয়া চিরকালের তরে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। আবার অন্যদিকে মাজীর গুণে ঐ এক নদীতেই শত সহস্র নৌকা একই সময়ে তরঙ্গ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমরা যাহা বুঝাইবার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বোধ হয় সহজ হইয়া আসিয়াছে,—নদীতে বাতাসে তরঙ্গ খেলে, সংসারের প্রলোভনে মানবকে বিচলিত করে। নচেৎ সিংহাসনের সুখের অধিকারী মানব সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া প্রলোভনে ভুলিয়া বিষপাত্র চুম্বন করিত না। নচেৎ ক্লিওপেট্রা এ সংসারের অপযশের বোঝা মস্তকে বহন করিতেন না, নগেন্দ্র নাথ সোণার সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ করিতেন না; ওস্মান বিষম

যাতনায় পুড়িয়া মরিত না; কষ্টর কলঙ্কের ডালি বহন করিয়া ইংরাজকুলের অগৌরব হইত না। এ সকল চিত্র, পাপের চিত্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে, এ সকল অস্বাভাবিক ঘটনা। সুকৌশলী বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য, বিকশিত ঘটনা বা ভাবরাশিকে পরীক্ষা করিয়া পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণ করা সহজ কথা নহে। তজ্জন্য, সময় সময় এক জনের পাপ অন্যের নিকট পুণ্য, এক জনের পুণ্য অপরের নিকট পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। সময়-চক্রের আবর্ত্তন প্রতিনিয়ত ঘটনার রেখা অঙ্কিত করিয়া এই বিশাল বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডকে জ্ঞানে পূর্ণ করিতেছে; কিন্তু কে নিশ্চয় রূপে, কি বাহ্য জগত কি অন্তর জগত, ইহার ভিতরের কোন অংশ তন্ন তন্ন করিয়া চিরস্থায়ীরূপে কোন একটা ঘটনাকে পাপ বা কোন ঘটনাকে পুণ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া যাইতে পারেন?

পণ্ডিত মহাশয় ইচ্ছা পূর্ব্বক মরীচির সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন, কিন্তু মনে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে যতই জ্ঞানী মনে করুন না কেন, তিনি যে সম্যক প্রকারে মরীচির মন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না; তবে ইহা জানি, আন্দোলিত হইলেও ডুবিবার লোক পণ্ডিত নহেন। তাঁহার বিবেক মাঝী সুচতুর, তাঁহার জ্ঞান সুমার্জ্জিত। সংসারী ধার্ম্মিক আর সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রভেদ এই, সংসারী ধার্ম্মিক সংসারে থাকিয়া স্বীয় বলে প্রলোভনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করাকে মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সন্ন্যাসী প্রলোভনকে বিষময় জানিয়া দেখিবামাত্র তাহা পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাসীর মন দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যেখানে তাঁহারা প্রলোভনের বস্তু দেখিতে পান কিম্বা দেখিতে পাইবেন, তাহার সন্ধান বুঝিতে পারেন, সেই স্থান হইতেই তাঁহারা পলায়ন করেন। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী মানব যে সকল সময়ে কোন্‌টা বিষ আর কোনটা অমৃত চিনিয়া লইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়; তজ্জন্যই অনেক সময় সন্ন্যাসীগণ অনেক নীতিপূর্ণ উপদেশরাশি যাহাতে নিবদ্ধ, তাহাকেও পাপের প্রলোভন মনে করিয়া, আপনাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখেন।

পণ্ডিত মনে মনে চিন্তা করিলেন, মরীচির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি,

কিন্তু গোপনে এই প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আরো ভাবিলেন, যশলাল সিংহকে এ সকল কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ তিনি কন্যাদিগকে দেবমন্দিরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন; তাঁহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। আরো ভাবিলেন, মরীচি আমাকে বলিয়াছিল "আপনি যদি আমার কথার উত্তর না দেন, তবে বাবাকে বলিয়া দিব, আপনিই আমাকে ভুলাইয়া আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়াছেন।" এই কথা শুনিলে মরীচির পিতা ক্রোধে অন্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হইলেই বা আমার কি, আমি সন্ন্যাসী, তিনি আমার কি করিবেন? আমার মন যদি ঠিক থাকে, তবে মনুষ্যের ভয় করিব কেন? আর আমার মন যদি অস্থির হইয়া থাকে, তবে মনুষ্যের ভয় না থাকিলেই বা আমার আত্মরক্ষার উপায় কি?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু রক্তিম হইল, অনেকক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; অনেক ভাবিলেন, অনেক বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, তার পর যশলাল সিংহের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারের কয়েকটী মনের কথা। *

হে বৃটীশ দেব! আমরা সংসারের স্থানচ্যুত দুঃখী, দরিদ্র; বিষণ্ণ মনে দুঃখের কাহিনী বলিয়া দুটী চারিটী পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিন কাটাই, তোমরা আমাদের প্রতি এত ক্রোধ প্রকাশ কর কেন? তোমরা উচ্চ জীব, ঊনবিংশ শতাব্দী তোমাদেরই সুখ সমৃদ্ধি ও গৌরবের সেতু হইয়া আসিয়াছে। তোমরা পৃথিবীর গৌরব, সুতরাং আমাদেরও গৌরবের স্থল; আমরা ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধা লইয়া নানা উপচারে তোমাদিগের পূজা অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা ধর্ম্মকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখিয়াছি; দেখ, পৃথিবীতে এক সময়ে নানা দেবতার মন রক্ষা

* সন্ন্যাসী প্রণয়নের সময়, লর্ডলীটনের সাহায্যে, বঙ্গসম্বন্ধীয় আইন প্রচারিত হয়। এই পরিচ্ছেদ গ্রন্থকারের সেই সময়ের হৃদয়ের ভাব-প্রকাশক।

করা যায় না বলিয়া আমরা তোমাদের স্তুতি, তোমাদের পূজার প্রণালী, তোমাদের সন্তোষবৃদ্ধির উপায় তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করিয়াছি। কলেজ বল, স্কুল বল, সর্ব্বত্রই তোমাদিগের স্তুতিগান শিক্ষার স্থল। দেখ, চতুষ্পাঠী সকল ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, দেখ, সামান্য পাঠশালায়ও আজ কাল তোমাদের স্তুতিবিদ্যা অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা কোটি কোটি স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, যুবা বৃদ্ধ একত্র হইয়া, ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া, হে কলির দেব, তোমাদিগের উপাসনায় যোগ দিয়াছি, তোমাদিগের সেবায় সময় কাটাইয়া কৃতার্থ মনে করিতেছি। দেখ, তোমরা আমাদিগের নিকট বাইবেল আনিয়া কোনও কার্য্য করিতে পার নাই; আমরা এক সময়ে কতটী ধর্ম্ম মানিব? আমরা, হে শ্বেতাঙ্গ দেব, তোমাদের উপাসক, তোমাদের সেবক, তোমাদের দাস; আমরা যিশুখ্রীষ্টকে লইয়া কি করিব? তোমরা আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে যে সুখ বিতরণ করিয়া থাক, অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত শত সহস্র যিশুও কি তাহা বিধান করিতে পারে? তাই দেখ, বাইবেলকে আমরা তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি; তাই দেখ, কম্‌টিকে আমরা হৃদয়ে কত আহ্লাদে ধারণ করিয়াছি, তাই দেখ, মিলকে কত ভালবাসিতে শিখিয়াছি; কেন বল ত? অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতে যাইলে, পাছে তোমাদের সেবার ত্রুটি হয়, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বজীবের মূলাধার ব্রহ্মাণ্ডের স্বামীকেও, দেখ, আমরা হৃদয়ে স্থান দেই নাই। আজ করযোড়ে, হে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, ধনে, মানে, বলে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে এই ভূমণ্ডলে অতুল কলির দেব, আমরা করযোড়ে এই বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা আমাদের প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইয়াছ কেন? বল, ভারতের আশা ভরসা, কোন্ অপরাধে ভারত তোমাদের চরণে অপরাধী। বল, কোন্ পাপের দণ্ড দিবার জন্য তোমরা এই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ? আমাদের আর উপায় নাই, তাই আমরা তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। আমরা ঈশ্বরকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছি, দেখ, আমাদের হৃদয় মরুভূমি হইয়াছে। আমাদের আর উপায় নাই, দেখ, ধন, জন, বল, বীর্য্য সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমাদের দর্শন আমাদের হৃদয় তৃপ্তিকর, তোমাদের বিজ্ঞান আমাদের মঙ্গলের সেতু, তোমাদের কাব্য আমাদের উপদেষ্টা, তোমাদের রাজনীতি আমাদের শিক্ষাগুরু; দেখ দেব, আমাদের আর

কি আছে? ভৌতিক ভারত দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইও না, ভয়ে কাঁপিয়া যাইও না। উত্তরদিকে ঐ যে দুর্ভেদ্য অটল হিমাদ্রি শেখর, বরফের ডালি মস্তকে বহন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, চাহিয়া দেখ, উহার প্রাণ নাই, উহা বক্ষ বিদারণ করিয়া তোমাদেরই সেবার আয়োজন করিয়া দিতেছে; ঐ হিমালয় এখন তোমাদেরই উপাসক হইয়াছে। দারজিলিং, সিমলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আর কোন দিকে প্রমাণ গ্রহণ করিতে যাইও না; দেব, দুঃখে তোমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, ঐ হিমালয় এখন তোমাদেরই যশ ঘোষণা করে, কিন্তু নেপাল আর ভূটান ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া স্বাধীন-ভাবে কেবল অশ্রুবরিষণ করিতেছে! ভয় কি দেব, ভৌতিক ভারতের সকলই ত তোমাদের সেবা করে। ঐ দেখ, পূর্ব্ব পশ্চিমে উপসাগরদ্বয় তোমাদিগেরই পদ ধৌত করিয়া দেয়, তোমাদিগকেই ভারতে লইয়া আইসে, আবার তোমাদিগকে ভারতের রত্ন বাছিয়া দেয়। বল ত উহারা এত উদার না হইলে তোমাদের কি উপায় হইত? হায়! ভৌতিক ভারত এত উপাসনা করিয়াও তোমাদের মন পাইল না!!

দেব! স্থির হও, চঞ্চল হইও না। ঐ দেখ সিন্ধুনদী, যে স্থানের নাম লইলে মৃত জীব বল পায়, প্রাণ পায়; এখন কেবল তোমাদেরই স্তুতি করে। কই, দেখত সিন্ধুর তীরবর্ত্তী লোকের শোণিত কি আর উষ্ণ হয়? গুইকুমারের অপরাধের দণ্ডবিধান করিবার ছলনে কেশে ধরিয়া উহাকে সিংহাসন হইতে নামাইলে, কই, ঐ নদী ত একবারও তাহার আশ্রিত তনয়দিগকে ডাকিয়া বলিল না; কই, চিরদিন আশ্রিত হইয়াও একবারও ত উহার সলিল উচ্ছ্বলিত হইয়া গুইকুমারের জন্য অশ্রু ফেলিল না! দেব! ভীত হও কেন? সিন্ধুনদী এখন তোমাদেরই উপাসক; গুইকুমার এখন তোমাদেরই গোলাম; হলকার এখন তোমাদেরই পদসেবক!

আবার দেখ সরযূ, যার তীরে এক দিন কত কাণ্ড সমাধা হইয়া গিয়াছে, যার কূলে এক সময়ে কত গৌরব জন্মিয়াছে, এখন দেখ সে সকল স্বপ্ন হইয়াছে, এখন সে সকল কবির কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; সরযূ এখন একবারও এ সকল সত্যযুগের কাহিনী বলিয়া তোমাদের উপাসকদিগকে উত্তেজিত করে না। সরযূ এখন তোমাদেরই।

ঐ যে পতিতপাবনী গঙ্গা, দেখ, ইহাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিবার সময়ে ভগীরথের কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, কত সাধনার পর ইনি

ভারতকে উদ্ধার করিতে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন; দেখ, আর ইহার পতিতপাবনী নামের মহিমা নাই, ভারতকুল আর ইহার তটে বসিয়া বাল্মীকের নাম করে না, আর ইহার তটস্থিত অট্টালিকা-রাজিতে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মযাজকগণ বেদ পাঠ করে না; এখন ঐ মৃদু কলকল ধ্বনি, এখন ঐ সুস্নিগ্ধ সলিল, এখন ঐ সকলই তোমাদের; তোমাদের সুবিধা, সুখ সমৃদ্ধিই এখন ইহার একমাত্র কল্পনা হইয়াছে। ভয় কি দেব! ভৌমিক ভারতের চিত্র দেখিয়া ভয় পাও কেন? ঐ যে যমুনা, যার নাম স্মরণ করিলে, এই দুঃখ যন্ত্রণায় দগ্ধপ্রায় চিত্তও আবার উৎসাহে মাতিয়া উঠে, হায়! কি বলিব, সেই যমুনাও বিশ্বাসঘাতিনী। তোমরা ত এ সকল বিলক্ষণ বুঝিয়াছ; গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী সকলই তোমাদের। ঐ বিন্ধ্যাচল তোমাদের; ঐ পঞ্জাব, ঐ সিন্ধু তোমাদের। সকলই তোমাদের; আমাদের আর কি আছে? পূর্ব্বের গৌরবের কথা যাহা শুনিয়াছিলে, সে সকল এখন কল্পনা, সে সকল এখন স্বপ্ন। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির, ভীম, কর্ণ, অর্জ্জুন কি আর আমাদের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলে? রামচন্দ্র কি আর স্বদেশবৎসলভাব এই মৃত জীবনে উদ্দীপন করিতে আইসে? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা কি ভারত-ললনাগণের মনে সাধ্বীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়? কণিক, চাণক্য, শ্রীকৃষ্ণ আর কি আমাদিগকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে আসে? কপিল, শঙ্করাচার্য্য কি আর দর্শন লইয়া আমাদিগের জ্ঞান বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে? চরক, অত্রি, সুশ্রুত প্রভৃতি কি আর বিজ্ঞানের ছলনায় আমাদিগকে ছলনা করিতে আসে? বাপুদেব, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মগুপ্ত কি জ্যোতিষ এবং অঙ্কবিদ্যা লইয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করে? নানক, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য কি আর আমাদের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয়? ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি ও কালিদাস কি আর কাব্যের পাত্র হাতে করিয়া আমাদিগের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে আগমন করে? দেব, সকলই নীরব, আমরা তোমাদের উপাসক, আমরা তোমাদের আচার-প্রণালীর দাস, আমাদের কণ্ঠ তোমাদের ভাষা প্রচার করে, হস্ত তোমাদের রাজ্যের মঙ্গল দিবারাত্রি ঘোষণা করে, ঈশ্বরই জানেন, অন্তর কেবল অহরহঃ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া যায়! কেন না, হায় এত করিয়াও তোমাদের মন পাইলাম না, এত সাধনা করিয়াও তোমাদিগের সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে

পারিলাম না। দেখ, অন্তরে-আগুন জ্বলে, এ তোমাদেরই নিষ্ঠুর ব্যবহারে। আমাদের সকল দুঃখ, সকল মনস্তাপ, সকল আশা, সকল ভরসা যদি কেবল ক্রন্দন করিয়াই আমরা শেষ করিতে বাসনা করি, তবে তাহাও তোমরা দিবে না কেন? আমরা সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর পতিতপাবন, দোহাই তোমাদের, দোহাই তোমাদের—আমাদিগের ক্রন্দনের বেগ থামাইতে যাইও না, আমাদিগকে অন্তরে মারিও না। আমরা তোমাদেরই ক্ষীণ দেহধারী মলিন ভারতবাসী, আজ ব্যাকুল হৃদয়ে, একবাক্যে প্রার্থনা করি,আমাদিগের লেখনীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া রাখিও না।

দেখ দেব, আমরা কি অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছি? ফরাশীদিগকে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া তোমরাই ১৮৭২ সালের অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলে, তারপর তোমরাই সেই অনল আবার নির্ব্বাণ করিলে, ফরাশী-দিগকে আশা দিয়াও সাহায্য করিলে না; সিডন সময়ে তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়া আপনি পৃথিবীর উচ্চ আসন গ্রহণ করিলে! সুলতান তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই রুসিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে সকলই আশা-মরীচিকা হইয়া গেল; তোমরা এক তিলও সুলতানের সাহায্য করিলে না; প্লেভ্‌নাতে তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। দেখ, তোমরা মধ্য হইতে সাইপ্রস্ লাভে সমর্থ হইলে। এ সকল দেবচরিত্রের সৌন্দর্য্য, দেবচরিত্রেই শোভা পায়। আমরা এ সকল দেব-ভাবের অধিকারী আজও হই নাই, রাজনীতি তোমাদের জন্যই শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধূর্ত্ততা মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছে। আমরা সামান্য মানব, আমরা দেবপ্রকৃতি লাভে কি প্রকারে সমর্থ হইব? আমাদের অঙ্গে অঙ্গে মিল নাই, হৃদয়ে সাহস নাই, দুর্ব্বল মানব আমরা, প্রলোভনের দাস, বিলাসের অধীন, আমরা দেবপ্রকৃতি লাভে অসমর্থ। দেখ, আমাদিগকে অবিশ্বাস কর কেন? সিপাহিযুদ্ধে আমরাই তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছি, নচেৎ ঐ সোণার প্রতিমা ত জলে ডুবিয়া যাইত। নেপালের সাহায্য না পাইলে, আমরা ত আর তোমাদের সুন্দর মূরতি দেখিতে পাইতাম না। কত বলিব, শিখযুদ্ধ মনে কর, আফগান্ যুদ্ধ মনে কর, ব্রহ্মযুদ্ধ মনে কর, সিপাহিযুদ্ধ মনে কর, নেপালের যুদ্ধ স্মরণ কর, বল ত দেব, কোন্ সময়ে আমরা তোমা-দিগকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি? আমরা প্রবঞ্চনা জানি না, আজ আমরা তোমাদের চক্ষে অভক্ত হইলেও, আজ আমরা দেবতার মন না পাইলেও, এক দিন

আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া এ জগতে বিখ্যাত ছিলাম, আমরা প্রবঞ্চনা, ছলনা, বঞ্চনা জানি না।

আবার দেখ, আমাদের অন্তর কেমন সুন্দর কোমল প্রকৃতিতে গঠিত; আমরা তোমাদিগের বিরুদ্ধে কত কথা শুনি, আবার সকলই ভুলিয়া যাই। কোন দূর দেশের দাসত্ব উঠাইয়া দিবার জন্য তোমরা একবার যুদ্ধ করিয়াছিলে, সেই যুদ্ধের ব্যয় ভার আমরা বহন করিয়াছিলাম, সে কষ্ট আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। স্বর্গে (লণ্ডনে) কোথায় কোথায় নাকি কত শোভা সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়াছ, উদরে অন্ন না দিয়াও আমরা সে সকল ব্যয় দিয়াছি। হায়, আমাদের কোন্ পাপে আজ তোমাদের সে সকল মনে নাই? অকৃলাণ্ডের সময়ে যে প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়া সিকিম রাজার নিকট হইতে দারজিলিং কাড়িয়া লইয়াছিলে, তাহা আমরা শুনিয়াই ভুলিয়া গিয়াছি। ডেলহাউসির রাজত্ব হইতে ক্যানিং পর্য্যন্ত তোমরা যে প্রভূত ক্ষমতা নিচয়ের অলৌকিক লীলা খেলিয়াছিলে, সে সকলই মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছি। ভুটানের সহিত সন্ধি করিবার ছলনা করিয়া বিজনীর রাজাকে যে প্রকারে পথের ভিখারী করিয়াছ, তাহা দেখিয়াও যেন দেখি নাই। আরো ভুলিয়াছি কত! বারাণসী মহাশ্মশানে একদিন যে সকল রাজাদিগকে বন্দী করিয়া কষ্ট দিয়াছিলে, সে সকল, দেখ দেব, আর মনে রাখি নাই। আমীর খাঁর ন্যায় যে সকল হতভাগ্যকে ভারতভূমি হইতে বিনা অপরাধে চিরজীবনের তরে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, তাহাও ভুলিয়াছি। ভুলিয়াছি আরো কত! দলীপ সিংহের জননীর অন্যায়-নির্ব্বাসন ভুলিয়াছি। ঝান্সির রাণীর দুর্দ্দশা ভুলিয়াছি, চিলেনওয়ালার সমর ভুলিয়াছি, মুলতান যুদ্ধের কারণ ভুলিয়াছি, অযোধ্যা, নাগপুর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশের দুর্দ্দশার বিষয় সকলই ভুলিয়াছি। আরো ভুলিয়াছি দেব—বলিতে আজ শরীর শিহরিয়া উঠে, মৃত জীবনে রক্ত সঞ্চার হয়,—ভুলিয়াছি মল্হাররাও গুইকুমারের দুর্দ্দশা। এখন সকলই ভুলিয়া গিয়াছি, আশা ভরসা, ভাবী পরিণাম আর কিছুই গণনা করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের কাশ্মীর, আমাদের বরদা, আমাদের ইন্দোর, আমাদের হাইদ্রাবাদ, আমাদের কুচবেহার, আমাদের সিকিম, আমাদের ভুটান, এখন সকলই তোমাদের, সকল অম্লান বদনে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি; সকল ভুলিয়া গিয়াছি;—রাখিয়াছি কি? কেবল অশ্রুজল! ইহার বারও

তোমরা রুদ্ধ করিতে বসিয়াছ, ইহাও আজ আমরা সহ্য করিতে বসিয়াছি।

আমাদের কি অপরাধ দেব, বল। আমরা স্বদেশের প্রতি অকৃতজ্ঞ, আমরা মাতৃভূমির বক্ষে কুঠারাঘাত করিয়াছি, সকল স্মৃতি ইহার বক্ষ হইতে প্রক্ষালিত করিয়াছি বলিয়া কি তোমরা আমাদিগকে প্রতারক ঠিক করিয়াছ? আমরা দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসা শিল্প প্রভৃতি ছাড়িয়া তোমাদিগের মসি-যুদ্ধে জীবনকে নিযুক্ত করিয়াছি বলিয়া কি আমাদিগকে কাপুরুষ মনে করিয়াছ? দেশীয় আচার ব্যবহার সকল ভুলিয়া তোমাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া কি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছ? দেশের ভাষা,দেশের অলঙ্কার,দেশের বীর্য্য,দেশের সুসাহস,দেশের রীতি নীতি সকলই ভুলিয়াছি, ইহাতে যদি তোমরা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া এই প্রকার শাসন বিধান করিয়া থাক, তবে আমরা নিরুপায়, তবে আমরা নিশ্চয় বুঝিলাম, আমাদিগের আর কোথাও সুখ নাই। আমরা গগন কাঁপাইয়া হাহাকার ধ্বনি করি, তোমরা শুনিয়া সুখী হও।

আমরা তোমাদের অনুকরণ করি, তাহাতে তোমরা বিরক্ত হইয়াছ, এমন ত বোধ হয় না; কারণ তাহাতে ত তোমাদেরই লাভ। তবে কি অপরাধ আমাদের? অপরাধ আছে,—আমরা মুখে অনেক কথা বলি, কার্য্যে কিছুই করি না, দেশকে নিদ্রা হইতে জাগাইতে যাই, কিন্তু ঘরের লোককে ঘুমাইতে দেখিয়া যাই; আমরা পরের অশ্রু মুছাইতে অগ্রসর হই, কিন্তু আত্মীয় বান্ধবের অশ্রু মুছাই না। আমরা বিদেশীর মনস্তুষ্টার্থ সকলই পরিত্যাগ করি, কত অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু স্বদেশীর জন্য কিছুই করি না। আমরা অন্যদেশের সহিত একতা করিতে যাই, কিন্তু ঘরে ভাই ভাই কাটাকাটী করিয়া মরি। এ সকল আমাদের অপরাধ আছে, দেব, তোমাদের দেব প্রকৃতি, তোমরা আমাদের এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া রাগান্বিত হইতে পার বটে। কিন্তু এ সকল কি উপায়ে দূর করিব? উপায় বলিয়া দেও, দেব, মুখ বন্ধ করিও না? মনের কথা বলিতে দেও। আমাদের আরো অপরাধ আছে,—আমরা জ্ঞান অনুসন্ধান না করিয়াই জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। আমাদের মধ্যে দশটী লোক যদি প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তোমরা এই প্রকার কঠোর [illegible] বিধান করিতে না, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি। ভারতের বিশকোটী

লোকের মধ্যে এক কোটীও যদি জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগকে এত অপরাধী মনে করিতে না, তাহা আমরা বুঝিয়াছি; কি করিব দেব, অধীন সেবক আমরা, জ্ঞানহীন, বলহীন, মূর্খ, একতা-বিহীন, আমাদিগকে ক্ষমা কর।

আমরা ছাই, ভস্ম, কত কি বলি, বলিয়া মনের ক্ষোভ মিটাই। সভায় বক্তৃতা আমাদের ক্রন্দন, আমরা আর কিছুই জানি না; কার্য্যক্ষম হইয়াছি, নচেৎ কে কাঁদিয়া বেড়াইত? খবরের কাগজে আমাদের হৃদয়ের দুঃখ, পুস্তকে আমাদের বিষের যন্ত্রণা, এ সকল পরস্পর পরস্পরের নিকটে বলিলে একটু জ্বালা কমিয়া যায়, তাই বলি; তাতে তোমরা ভীত হইও না, তোমাদের ভীত হইবার কারণ নাই। দেখ না দেব, আমরা সামান্য তরণী চালাইতে অক্ষম; দেখ না দেব, আমরা সামান্য সমাজ-তরণী খানিকেও ভাল পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারি না। তোমারা ত সকলই দেখিতেছ, ভারতের কত রমণী বাল-বৈধব্য-যন্ত্রণায় হাহাকার করিতেছে, কত অশ্রুপাত দিন রাত্রি মৃত্তিকায় পড়িয়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে? দেখ না দেব, কত যুবতী কৌলিন্য প্রথার অনুগামিনী হইয়া বিষণ্ণ বদনে রহিয়াছে; দেখ না দেব, কত ব'লিকা অসময়ে পুত্রশোকে কাতরা হইয়া দিন যামিনী যাপন করিতেছে! আমরা সামান্য তরণী ভাল পথে চালাইতে পারি না; কল্পনায় বিভীষিকা দেখিয়া আমরা ভীত হইয়া যাই, যেখানে কোন ভয় নাই, সেখানেও চড়ার ভয়, দস্যুর ভয় করিয়া কত যাত্রীকে অসময়ে ডুবাইয়া দেই। তোমরা কলির দেবতা, সভ্যতার সোপান, তোমরা কি না জান! দুর্ভিক্ষ হাহাকারে ভারত বিকম্পিত,—কত সন্তান, কত যাত্রী অসময়ে মরিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা তরী চালাইতে পারি না। সামান্য সমাজ-তরণী বাহিতে আমাদিগের এত কষ্ট, বল ত, আমরা কি প্রকারে রাজনীতির জাহাজ চালাইব? তোমরা ত সকলই বুঝিতে পার! তবে যদি কোন মূর্খ যাত্রী বৃথা চীৎকার করে, সে ত তাহার নিষ্ফল রোদন-ধ্বনি, তোমরা দেবতা, তোমাদের তাহাতে দয়া হয় না? তবে যদি আমাদের ন্যায় দুই চারিজন মূর্খ, জ্ঞানহীন ক্রন্দনের ধ্বনি গগনে তোলে, তবে তাহা শ্রবণে তোমাদের কৃপার ভাব মনে হয় না? আমরা কাঁদিতে জানি, তাই কাঁদি, আর কি? একবার কাঁদিয়াই সব দুঃখ ভুলিয়া যাই! দোহাই দেব, আমাদিগকে কাঁদিতে দেও, মুখ বন্ধ করিও না, মুখ বন্ধ করিও না। দেব! দণ্ড বিধানের ক আর

তোমাদের ত্রুটি নাই, তোমরা উপযুক্ত দেবতা। বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ গণ্ডা আইন প্রসব করিয়া তোমরা আমাদিগের হাড় জ্বালাতন করিয়াছ, তাহাতে কোন কথা বলি নাই। রাজসূয় যজ্ঞ হইতে এপর্য্যন্ত তোমরা যে সকল দণ্ড বিধান করিয়া ভারতের অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়াছ, সে সকলি অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছি; একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই। কর আদায় করিতেছ, কর, কোন কথা বলিব না। আমাদিগের পৃষ্ঠে পা রাখিয়া যদি তোমরা সুখী হও, তবে বল, আমরা পৃষ্ঠ পাতিয়া দেই; আমরা উপাসক, ক্ষমতা-বিহীন, যাহা বলিবে, তাহাই করিতে সম্মত আছি; কিন্তু একটী পারিব না, এই লেখনীকে নিরস্ত করিতে পারিব না;—এই দগ্ধ মুখকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিব না। আন্দামানকেও সুখে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি, তবুও জীবন থাকিতে হৃদয়ের বেগ বাহির না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা সকল সহ্য করিতে পারি, সকল সহ্য করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের বর্ত্তমান শাসন-দণ্ড আর সহ্য করিতে পারি না। দোহাই দেব, রক্ষা কর।

ভয় কি তোমাদের, দেব! তোমাদের রাজত্ব কে লইবে? উনবিংশ শতাব্দী তোমাদেরই, কে আর ভারতের সিংহাসনে বসিবে! এ কলঙ্কের সিংহাসন আর কে লইবে, ইহা তোমাদেরই; ভয় কি দেব, ইটালী আর ভারতবর্ষ এক নহে;—আয়রলণ্ড আর হিন্দুস্থান এক নহে। ভয় কি দেব! ইটালীর ম্যাট্‌সিনি ভারতে নাই; ভয় কি দেব! জর্ম্মানির বিষমার্ক ভারতে নাই; ভয় কি দেব! গ্যারিবল্‌ডির ন্যায় বীরের উত্থান ভারতে অসম্ভব; ভয় কি তোমাদের! হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দখল করিয়াছ; এক-ছত্র-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, যাহা আর কেহই পারে নাই, তাহা সংস্থাপন করিয়াছ, এক্ষণ শান্তিতে রাজ্য ভোগ কর। যদি তোমরা আপনারা বুঝিতে অক্ষম হইয়া থাক, তবে আমাদের কথা বিশ্বাস কর, উনবিংশ শতাব্দীতে আর কাহারও সিংহাসন ভারতে স্থান পাইবে না। ভয় কি দেব! তোমরা দেবতা, আমরা মানব; তোমরা কৌশলী, আমরা শান্ত জীব; আমাদিগের আশঙ্কা কি? তবে যদি কখনও এমন সময় আগমন করে যে, ম্যাট্‌সিনির ন্যায় ক্ষণজন্মা কোন হিতৈষীর শুভ আগমন হয়, তখন, ঈশ্বরই জানেন তোমাদের শত সহস্র চেষ্টায়ও কিছু হইবে না; তখন অনায়াসে তোমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। তবে সে সময় যতদিন না আগমন করে, তত-

দিন তোমরা ভীত হও কেন? ততদিন দুঃখী দরিদ্রের প্রতি প্রাণ-হন্তারক আইন জারী কর কেন? ইহাতে তোমাদের অগৌরব ভিন্ন গৌরব নাই; ইহাতে তোমাদের অপযশ ভিন্ন সুযশ নাই, ইহাতে তোমাদের ক্ষমতার অপ-ব্যবহারের পরিচয় ভিন্ন উপকারের প্রত্যাশা কিছুই নাই।

যাও দেব, সুখে রাজত্ব কর গিয়া, যতদিন তোমাদের রাজত্ব আছে। আমরা কাঁদি, আমরা দুঃখের কথা নগরে নগরে গাইয়া বেড়াই, তোমরা আমাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিও না। আমরা মৃতজীব, মৃদু মৃদু ভাবে ক্রন্দন করিয়া এই কষ্টের জীবন অতিবাহিত করি।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিষের প্রণালী।

পণ্ডিত যখন যশলাল সিংহের আশ্রমে পৌঁছিলেন, তখন বেলা অবসান প্রায়। পৌঁছিয়া দেখিলেন, দুইটী শ্মশ্রুধারী শ্বেতপুরুষ মনের আনন্দে বিদ্যুতের ন্যায় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীতে লোক নাই, তিনি অনুমানে বুঝিলেন; কারণ তিনি জানিতেন, যশলাল সিংহের কোন লোক থাকিলে, ইহারা তাহার বাড়ীতে উঠিতে পারিত না, কারণ ইহারা ম্লেচ্ছ জাতি। ইহা অনুমান করিয়া তিনি দ্রুত-পদনিক্ষেপে পশ্চাৎদিকে পলায়ন-তৎপর হইলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরে সেই দুইটী শ্মশ্রুধারী সাহেবের দৃঢ় মুষ্টিতে পণ্ডিতের দুই হাত আবদ্ধ হইল। সাহেবেরা কোমল দৃষ্টিতে বলিল,—"তুমি বোধ করি এই বাড়ীর কেহ হইবে? আমাদিগকে দেখিয়া পালাও কেন? আমরা তোমাকে অনেক পুরস্কার দিব। আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দেও।"

পণ্ডিত উত্তর করিলেন, তোমরা ম্লেচ্ছ, অগ্রে আমার হাত ছাড়িয়া দেও, তারপর যাহা হয় বলিব।

সাহেবেরা নিঃসন্দেহ চিত্তে হাত ছাড়িয়া দিল, তারপর বলিল;— আমরা শুনিয়াছি, যশলাল সিংহের দুইটী কন্যা আছে; তাহারা কোথায় গেল?

পণ্ডিত। যশলালের কন্যার কথা তোমরা কোথায় শুনিলে?

সাহেব। কল্য আমরা ভুটীয়া দেবমন্দিরে যাইয়া সকল কথা [illegible]

করিয়া দেখিয়াছি; সেই খানে দুইটী সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে ধরিতে পারি নাই; এক জনের নিকট শুনিয়াছি, উহারা যশলালের কন্যা।

পণ্ডিতের নিকট সকল স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, বলিলেন, তোমরা ম্লেচ্ছ, কি প্রকারে ভূটীয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিলে?

একটী সাহেবের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ভীমস্বরে অসি নিষ্কাশিত করিয়া বলিলেন, এই অসির বলে। তোমার সে সকল সংবাদে প্রয়োজন কি, এই অসি দেখিতেছ না? আমাদের কথার উত্তর দেও, নচেৎ তোমারও ভূটীয়া লামাদিগের দশা ঘটিবে।

পণ্ডিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, যদি উত্তর না দেই?

সাহেব। যদি উত্তর না দেও, তবে এই তরবারিতে তোমার মৃত্যু সম্পাদন করিব।

পণ্ডিত। আমি সন্ন্যাসী, আমি মৃত্যুর ভয় করি না। আমাকে মারিলে যদি তোমাদের বিশেষ ইষ্ট লাভ হয়, তবে আমাকে মার।

সাহেব। তোমাকে মারিলে আমাদের লাভ নাই; তোমাকে রাখিলেই লাভ আছে, কারণ তোমার নিকট অনেক সংবাদ পাইব।

পণ্ডিত মনে মনে হাসিলেন, তার পর বলিলেন, তোমরা এ রাজ্যে আসিয়াছ কেন?

সাহেবেরা পণ্ডিতকে সামান্য সন্ন্যাসী জ্ঞান করিয়া বলিল, এ রাজ্যে আমাদের রাজত্ব স্থাপন করিতে আসিয়াছি।

পণ্ডিত। কোথা হইতে আসিয়াছ?

সাহেব। আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। তোমাকে অনেক কথা বলিয়াছি, আর কিছুই বলিব না; এখন আমাদের কথার উত্তর দেও।

পণ্ডিত। আর একটী কথা বল; তোমরা এ রাজ্য লাভ করিতে আসিয়াছ কি নিমিত্ত? আর রাজ্য লাভ করিতে আসিয়াই বা ভূটীয়া লামাদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে কেন?

সাহেব। তোমাকে এ কথারও উত্তর দিব,—কারণ তোমার নিকটে আমরা অনেক আশা করি। তোমাকে এ রাজ্যের রাজা করিয়া দিব। এ রাজ্য ভূটান এবং নেপালের মধ্যস্থল, আমরা ভূটান এবং [illegible] রাজত্ব স্থাপনের আর কোন উপায় দেখি না; তবে সিকিম

প্রদেশের রাজা দুর্ব্বল ; ইহাকে অনায়াসেই আমরা জয় করিতে পারিব। ভূটীয়া লামাগণ আমাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করায় আমরা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। তাতে তোমার কি ; তুমি আমাদের সকল কথার উত্তর দেও, আমরা খ্রীষ্ট উপাসক, নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাকে এ প্রদেশের রাজা করিয়া দিব।

পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন, আমি সন্ন্যাসী, আমি রাজ্য লইয়া কি করিব ? ইংরেজদিগের দুরভিসন্ধি এবং চক্রান্ত উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন ; তার পর বলিলেন,—

'আচ্ছা বাপু, তোমরাত রাজ্য জয় করিতে আসিয়াছ, তোমরা আবার যশলালের কন্যাদিগকে অনুসন্ধান করিতেছ কি নিমিত্ত ?

সাহেব। তাহারও কারণ আছে, আমরা পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। শুনিয়াছি, যশলাল সিংহ তাহার বয়স্থা কন্যাদিগকে অবিবাহিত রাখিয়াছেন ; আমরা এ সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না। আমরা তাহার কন্যাদিগের দুরবস্থা দূর করিব।

পণ্ডিত মনে মনে সাহেবদিগকে সর্পের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন,—একটু ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব। এই বলিয়া পণ্ডিত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিভীষিকা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যশলাল সিংহ আপন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বদিনের অত্যাচার, লামাগণের প্রতি ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্য এবং দেবমন্দির লুণ্ঠন, এই সকল অপরাধের জন্য ইংরাজদিগকে কি প্রকার শাস্তি বিধান করা উচিত, ইহার সুপরামর্শের জন্য যশলাল সিংহ অশ্ব আরোহণে সিকিম রাজসন্নিধানে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া যাই আশ্রমে উপস্থিত হইল, অমনি এক জন দেশী সর্দ্দার অশ্বের বল্‌গা ধরিল। সর্দ্দার ইংরাজ বেতনভোগী দূত।

যশলাল সিংহ বলিলেন,—তুমি অশ্বের বল্‌গা ধরিলে কেন ?

সর্দ্দার নিমেষ মধ্যে উত্তর করিল—তোমার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে; সে সকল কথা অতি গোপনে তোমার নিকট বলিব। যশলাল অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সর্দ্দার তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক যেদিকে অরণ্য অত্যন্ত নিবিড়, সেই দিকে লইয়া চলিল। অরণ্যের সন্নিহিত একখণ্ড প্রস্তরের উপরে দুইজনে উপবিষ্ট হইলে পর সর্দ্দার বলিল,—যশলাল, ইংরাজদিগের সহিত বৃথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি ইহাদিগের শাসন প্রণালী কখনও দেখ নাই, দেখিলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে,ইংরাজ-শাসন পরম সুখের বস্তু, নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমার ইচ্ছা হইত। তোমাকে আমি ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে বলি না, ইহাদিগের সহিত যে সৈন্য আছে, তুমি যদি বাধা না দেও, তুমি যদি ইহাদিগের প্রতিকূলে না দাঁড়াও, তবে নিশ্চয় ইহারা জয়লাভ করিতে পারিবে। দুই দিন হইল আমি আদিষ্ট হইয়া ভুটানের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন, ভুটানের প্রবেশ দ্বার ভিন্ন, তিনি আর কোথায়ও সাহায্যার্থ গমন করিবেন না; তিনি ইংরাজদিগের ভুটানে প্রবেশ করিতে দিবেন না বটে,কিন্তু তোমাদিগকেও সাহায্য করিবেন না। তুমি বিজ্ঞ, আমি যদিও ইংরাজ বেতনভোগী, তথাপি স্বদেশের মায়া ছাড়িতে পারি না, তাই তোমাকে এতগুলি পরামর্শের কথা বলিলাম।

যশলাল সিংহ ধীরভাবে বলিলেন, ইংরাজেরা কি বলে?

সর্দ্দার। তাহারা তোমাকে অতিক্রম করিয়া সিকিমে প্রবেশ করিতে চাহে। তাহাতে ভ্রুকুঞ্চিত কর কেন, সে ত সুখেরই কথা।

যশলাল। তাহাতে তাহাদের স্বার্থ কি?

সর্দ্দার। আমি জানি না, তবে তাহারা বলে, দেশ পর্য্যটন করা তাহাদিগের স্বভাব।

যশলাল। তবে তুমি জয়লাভের কথা বলিলে কেন?

সর্দ্দার। তুমি যদি সহজে দ্বার না পরিত্যাগ কর, তবেই তোমার সহিত যুদ্ধ বাধিবে।

যশলাল। ইংরাজদিগের সহিত যখন দারজিলিং সম্বন্ধে আমাদিগের বন্দোবস্ত হয়, তখন কথা ছিল, ইহারা সামান্য প্রজার ন্যায় দারজিলিঙ্গে কয়েকখানি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের সুবিধা করিয়া

রাখিবে, নচেৎ কি আমরা তিন শত টাকা কর ধার্য্যে এতগুলি পর্ব্বত ছাড়িয়া দিতাম? এক্ষণ ক্রমে ক্রমে দেখিতেছি, ইহারা দারজিলিঙ্গে রাজত্ব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার কেবল দারজিলিং পাইয়াও বোধ হয় ইহাদিগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই; তাই কোন ছল ক্রমে সিকিমে প্রবেশ করিয়া, ইহাকে দখল করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। এবার আমরা সর্পকে বিশেষরূপে চিনিয়াছি, এবার কখনই ইহাদিগের কথায় সম্মত হইব না।

সর্দ্দার। কোন্‌টী ভাল বলত; ভাল মন্দ ত তোমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, বলত ইংরাজগণ দারজিলিঙ্গে আসিয়াছে, সেই ভাল, না এতদিন কতকগুলি পর্ব্বত অরণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই ভাল। তুমিত সকলি বুঝিতে পার, কোন্‌টা ভাল, বল ত?

যশলাল। আমাদিগের অধিকারভুক্ত স্থান অরণ্য হইয়া থাকে, সেও ভাল, তবুও অন্যের রাজত্ব ভাল নহে।

সর্দ্দার। এই জন্যই ত তোমাদিগকে অসভ্য বলিয়া থাকে, এই জন্যইত তোমাদিগের এত বিপদ ঘটে।

যশলাল। আমাদিগকে অসভ্যই বলুক আর যাহাই বলুক, আমাদিগের স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া কখনও সুসভ্য হইতে চাহি না। আমাদিগের জীবনই বিপদের তরণী, তুমি সে জন্য ভয় দেখাও কেন?

সর্দ্দার। আমি তোমাদিগের বলবীর্য্য সকলি জানি, আমার নিকটে আবার আস্ফালন কেন?

কি জান সর্দ্দার? যশলালের চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, স্বীয় বলে দণ্ডায়মান হইলেন, অসি কোষ মধ্যে শব্দিত হইল; বলিলেন, তুমি অর্থের গোলাম, তুমি আমাদের বল কি জানিবে? যদি ঈশ্বর করেন, তুমি দেখিবে যশ-লালের ক্ষমতা কি প্রকার।

সর্দ্দার বিনম্রভাবে বলিলেন,—তোমাকে আমি জানি, তোমার পরা-ক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই; তোমার কথা আমি ইংরাজদিগের নিকট বলিয়াছি, তাঁহারা তোমার ভয়েই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; তোমার সহিত সন্ধি করিতে তাঁহারা এখনও প্রস্তুত আছে।

যশলাল ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বলিলেন,—আমার প্রভুর সহিত ত তাহা-দিগের সন্ধি আছেই, সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়াই ইহারা সিকিমে প্রবেশ

করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছে, আমাদের ক্ষমতা থাকে, ইহার প্রতিশোধ তুলিব। আবার সন্ধি কি ?

সর্দ্দার। তোমার প্রভুর সহিত কি সন্ধি ছিল ?

যশলাল। সন্ধি ছিল যে ইহাঁরা কখনও বড় রঙ্গিতের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সে সন্ধি কি ভঙ্গ করা হয় নাই ?

সর্দ্দার। সন্ধি ভঙ্গ করা হইয়াছে, কারণ, তোমার প্রভুর সহিত ইহাঁরা সন্ধি রাখার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

যশলাল। কেন ? এটা কোন্ সভ্যদেশের প্রণালী ?

সর্দ্দার। আমি জানি না ; তবে এই মাত্র জানি, তোমার প্রভুকে ইহাঁরা তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, তৃণের ন্যায় লোককে ইহাঁরা পদানত রাখিতে চান, তাহার সহিত আবার সন্ধি কি ?

যশলাল। বটে ? তবে আমার সহিত আবার সন্ধি কি ? আমি ত আর কোন রাজ্যের রাজা নহি, আমার সহিত আবার সন্ধি কি ? আমার প্রভু যদি তৃণের ন্যায় উপেক্ষিত হইলেন, তবে আমি ত তৃণ হইতেও ক্ষীণ, আমার সহিত আবার সন্ধির আবশ্যকতা কেন ?

সর্দ্দার। তোমাকে ইহাঁরা যমের ন্যায় ভয় করেন।

যশলাল। আমি ত আমার প্রভুরই ভৃত্য, তবে আমার প্রভুকে তুচ্ছজ্ঞান করেন কেন ?

সর্দ্দার। ইংরাজেরা জানে, অর্থের ক্ষমতায় সকলই হইতে পারে, তাই তোমার সহিত বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত।

যশলাল। অর্থের ক্ষমতা কি ?

সর্দ্দার। অর্থ লোকের মনকে বশ করিতে পারে।

যশলাল। তাতে কি ? আমিও ত আমার প্রভুর নিকটে অর্থ পাইয়া থাকি।

সর্দ্দার। ২৫০ টাকা অতি সামান্য, এই দেখ ইংরাজেরা তোমাকে ভালবাসিয়া কত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, অনুরোধ, ইহা তুমি গ্রহণ কর।

যশলাল সিংহের শরীর ক্রোধে বিকম্পিত হইল, বলিলেন, কি, আমি গোপনে ম্লেচ্ছ জাতির অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের গোলাম হইব ?——

সর্দ্দার বলিল,—গোলাম হইবে কেন, তুমি এ সকল গ্রহণ কর, এক জনের ভালবাসার দান তুচ্ছ করিও না, কেবল এ দান নহে, এই দেখ

আরও দান আছে, তুচ্ছ করিও না, এই বলিয়া সর্দ্দার পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিলেন—কাগজে লেখা ছিল, "যশলাল সিংহের সহিত আমরা সন্ধি করিয়া তাঁহাকে বড় রঙ্গিতের উত্তর ধারের সকল পর্ব্বতের অধিকার ছাড়িয়া দিলাম।"

যশলাল বলিলেন কি? বড় রঙ্গিতের উত্তর দিকে ত আমাদেরই অধিকৃত স্থান, চক্রান্ত করিয়া ইংরাজ এ সকল আমাকে অর্পণ করিতে আসিয়াছি, আর তুই সেই কৌশলী ম্লেচ্ছদিগের অর্থের গোলাম হইয়া আমার নিকটে আসিয়াছিস্; ধিক্ তোকে, কুলাঙ্গার দূর হ; তোর অর্থকে আমি তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করি। এই বলিয়া যশলাল সিংহ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সর্দ্দারের গলা ধরিয়া ঠেলিয়া ফেলিলেন; অর্থরাশির উপরে সজোরে পদাঘাত করিলেন। তারপর তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া বলিলেন, এই তরবারির সহায়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে যে শত সহস্র ইংরাজকে ভূতলে লুণ্ঠিত করিব, সেই ইংরাজের নিকট আবার উৎকোচ গ্রহণ করিব? এবার দেখিব, ইংরাজগণ কি কৌশল অবলম্বন করিয়া আত্ম নিশান দণ্ডায়মান রাখে।

এই সকল কথা বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইল; প্রত্যেক পর্ব্বত হেন উৎসাহে মাতিয়া যশলালের প্রভু-ভক্তির শত শত প্রশংসা করিল।

সর্দ্দার ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল এবং মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল—যশলাল, সাবধান, ইংরাজ দূতকে অবমাননা করিতে ছাড়িলে না, ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই পাইবে।

যশলাল পুনরায় বলিলেন,—ইংরাজদিগকে যদি ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতাম, তাহা হইলে ভয় করিতাম, সংসারের প্রবঞ্চক, প্রতারকের দূতকে অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কাপুরুষের কার্য্য, তুই যা, তোর প্রভুকে বলিস্, যশলাল তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে! এই কথা বলিয়া যশলাল স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সর্দ্দার আস্তে আস্তে বনের ভিতরে লুক্কায়িত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ ভঞ্জন হইল!!!

যশলাল সিংহ অল্পে অল্পে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আস্তে আস্তে তরবারি প্রভৃতি সৈন্যের বেশ খুলিয়া রাখিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। অন্দর মহলে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি আজ কাল অত্যন্ত গোলযোগের মধ্যে পড়িয়াছি বলিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই; আপনি কুশলে আছেন ত?

পণ্ডিত। যশলাল সিংহকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর মস্তক নত করিয়া বলিলেন,—আমি এক্ষণ অনেকটা সুস্থ হইয়াছি; আপনি আজ কাল ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন?

যশলাল। আর সহ্য করা যায় না, অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এখনকার অত্যাচার আর সহ্য হয় না; ইংরাজ-দূত সন্ধি ভঙ্গ করতঃ বলপূর্ব্বক আমাকে অতিক্রম করিয়া সিকিমে প্রবেশ করিতে চাহে, এ সকল কি প্রকারে সহ্য করিব? ইংরাজদিগের সহিত নিশ্চয় যুদ্ধ বাধিতে চলিল।

পণ্ডিত। আপনি ত কল্য রাজাজ্ঞার জন্য গিয়াছিলেন, রাজা কি বলিলেন?

যশলাল। তিনি সীমান্ত প্রদেশের ভার আমার উপর সম্পূর্ণরূপে দিয়াছেন, বলিয়াছেন "তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিও।"

আমি এখন দেখিতেছি, ইংরাজদিগকে একবার রাজ্যের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিলেই সর্ব্বনাশ করিবে, আমি প্রাণান্তেও দ্বার ছাড়িব না।

পণ্ডিত। তবে নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে? আচ্ছা যদি যুদ্ধেতে জয়লাভ করিতে না পারেন?

যশলাল। কি করিব? জয়লাভ না করিলে যাহা ঘটিবে, তাহাত এখনই ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে; শীতল রক্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিব? এ শরীরে রক্ত থাকিতে তাহা কখনই পারিব না।

পণ্ডিত দেখিলেন, যশলালের সর্ব্বশরীর আরক্তিম হইয়া উঠিল। এ সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, আপনার নিকটে কয়েকটী কথা বলিব?

যশলাল। আপনার ইচ্ছা হইলেই বলিতে পারেন। আপনার গুরুদেব আজও আগমন করেন নাই? এই কয়েক দিন মরীচির শরীর অসুস্থ হয়েছে, আপনি এই কয়েক দিন তাহাকে পড়াইতে পারেন নাই, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন? না, আপনি গুরুদেবের নিকট যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন?

পণ্ডিত। এই ৫ মাস অতীত হইল একবার গুরুদেবের আশ্রম অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছি, তখনও তিনি পর্ব্বতে আগমন করেন নাই, মনে ঠিক করিয়াছি, আর শীঘ্র তাঁহার নিকট যাইব না, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর ও মন অনেক সুস্থ আছে; বোধ হয় শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিব। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে আর গুরুদেবের নিকটে যাইব না। মরীচির অসুস্থতা সম্বন্ধেই আপনাকে কয়েকটী কথা বলিব।

যশলাল বলিলেন, বলুন, নিঃসন্দেহ চিত্তে বলুন।

পণ্ডিত। মরীচির হৃদয় আশ্চর্য্য ভালবাসায় গঠিত, এপ্রকার ভালবাসা-পূর্ণ হৃদয় আমি আজ পর্য্যন্তও দেখি নাই। আমি মরীচির ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি, কিন্তু মরীচি আমাকে যে প্রকার ভাবে ভালবাসে, বোধ হয়, আমার অদর্শনে মরীচির দারুণ কষ্ট হইতেছে। মরীচির ভালবাসা পরীক্ষা করিবার মানসে আমি এ কয়েক দিন পড়াইতে আসি নাই, শুনিলাম, মরীচি আমাকে না দেখিয়া অস্থির হয়েছে; মরীচির অসুখ আর কিছুই নহে। আমি এ প্রকার ভালবাসাকে অবৈধ মনে করি, মনুষ্যের মন প্রলোভনের দাস, মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। স্ত্রীপুরুষের ভালবাসায় পবিত্র ভাব মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। মরীচিকে আমি সংশোধনের চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, সে আমার কথা শুনিল না; বোধ হয় সে কাহাকেও ভয় করে না। আমি এ প্রকার ভালবাসাকে অবৈধ মনে করি বলিয়া এ সকল কথা আপনার নিকট না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যশলাল সিংহ একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন,—মরীচির হৃদয় সত্যই ভালবাসায় গঠিত, আমি আরো অনেকের নিকট মরীচির সরল ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, এবং পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি, কিন্ত

মরীচির হৃদয়ে অপবিত্রতা দেখি নাই। মরীচি কাহাকেও ভয় করে না, সে কথা সত্য, আমাদিগের দেশে বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাগণ কেহই ভীতা নহেন, উহা জাতীয় রমণীগণের স্বভাবসিদ্ধ পদার্থ।

পণ্ডিত। কখনও পরিবর্ত্তন দেখেন নাই, সে ত ভাল কথা, কিন্তু যদি কখনও পরিবর্ত্তন ঘটে।

যশলাল। কি করিব, স্বর্গের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া কি কন্যাকে আপনার চরণে অধীন করিয়া রাখিব? কন্যা যখন অন্যকে গ্রহণ করিতে চাহিবে, তখন অন্যকে দিব।

পণ্ডিত। মনে করুন, কন্যা কোন অবৈধ পাত্রে মন সমর্পণ করিল, অর্থাৎ যাহাকে বাস্তবিক পাইবার উপায় নাই, তাহাকে মন সমর্পণ করিল, তারপর অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইল; এরূপ স্থলে পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত নহে?

যশলাল। পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া ন্যায়সঙ্গত, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু প্রকৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অধর্ম্ম ক্রয় করিতে পারি না; ভালবাসা মানবের স্বভাব, সেই ভালবাসাকে কেহই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; তবে যদি কেহ কোন অন্যায় পাত্রে মন সমর্পণ করে, সেজন্য আমি কি করিব? সে নিজে বিষপান করিয়া নিজেই তাহাতে জ্বলিয়া মরিবে।

পণ্ডিত। আপনার কন্যা সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস কি প্রকার?

যশলাল। বিশ্বাস অটল, কন্যার হৃদয় ভালবাসায় গঠিত, কিন্তু মন পবিত্র ও সরল।

পণ্ডিত। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন?

যশলাল। এ সম্বন্ধে পারি না, কারণ আপনি মরীচির হৃদয় ও মন আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই।

পণ্ডিত। তবে কি আমি প্রতারিত হইয়াছি?

যশলাল। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় মরীচির ভালবাসা সম্বন্ধে আপনি অমূলক বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত। আমার অদর্শনে তবে মরীচির অসুখ হইল কেন?

যশলাল। ভলবাসার রীতিই ঐ, প্রেমের স্বভাবই এই, যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারে না।

পণ্ডিতের মনে সহসা গুরুদেবের কথা উঠিল, ভাবিলেন,—আমি প্রলো-

ভনের মধ্যে থাকিতে এত ভীত হইতেছি কেন? মরীচির স্নেহকে আমি গরল মনে করিতেছি কেন? যদি আমার মনই চঞ্চল হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় ধর্ম্মের সুন্দর সোপানে আর উঠিতে পারিব না; আমি কেন প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব? গুরুদেব বলিয়াছেন,—"প্রলোভনেই তোমার পরীক্ষা হইবে।" পরীক্ষায় আর বিচলিত হইব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যশলাল সিংহের নিকট তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন, তবে কল্য হইতে আমি আবার পড়াইতে আরম্ভ করিব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মরীচির হৃদয়ের মহত্ত্ব।

তার পরদিন পণ্ডিত আবার মরীচিকে পড়াইতে আসিলেন; মরীচির অসুস্থ শরীর সুস্থ হইল, তিনি আহ্লাদিত মনে আবার পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম কথা কে বলিল? মরীচির মন অত্যন্ত উৎসুক ছিল, প্রথমে তিনিই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মরীচি। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ত সন্ন্যাসী, তবে আপনার মন আবার দুঃখে বিষণ্ণ হয় কেন? আপনি ত সন্ন্যাসী, তবে আপনি আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কেন?

পণ্ডিত। আমি কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি?

মরীচি। আপনি বলিয়াছিলেন, আপনি আর আমাকে পড়াইতে আসিবেন না; আজ আবার আসিলেন কেন?

পণ্ডিত। আমি আসিয়াছি বলিয়া কি তুমি অসন্তুষ্টা হয়েছ?

মরীচি। আমার সন্তোষ বা অসন্তোষে আপনার প্রয়োজন কি? আপনি ত সন্ন্যাসী, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া লোকের মন সন্তুষ্ট করিতে যাওয়া কি আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য?

পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, আমি তোমার সকল কথা তোমার পিতাকে বলিয়াছি। তিনি যখন তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তখন আমি কেন অযথা তোমাকে অবিশ্বাস করিব? এই সকল

ভাবিয়া আজ আবার পড়াইতে আসিলাম।

মরীচি। আপনি বাবাকে কি বলিয়াছিলেন?

পণ্ডিত। বলিয়াছিলাম,—মরীচি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে; এ ভালবাসাকে আমি অন্যায় জ্ঞান করি।

মরীচি। বাবা কি বলিলেন?

পণ্ডিত। তিনি বলিলেন, মরীচির স্বভাব ভালবাসাময়, তিনি প্রেমের এই স্বাভাবিক গতি রোধ করিতে ইচ্ছা করেন না।

মরীচি। আপনি কি বাবার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন?

পণ্ডিত। কতকটা হয়েছি।

মরীচি। সন্তুষ্ট হইলেন কেন? আমি আপনাকে ভালবাসি, কে বলিল?

পণ্ডিত। আমার বিশ্বাস এই প্রকার।

মরীচি। আপনার বিশ্বাসে কি ভ্রম থাকিতে পারে না?

পণ্ডিত। যাক্, সে সকল তর্কে প্রয়োজন নাই, তুমি এখন পাঠ অভ্যাস করিতে আরম্ভ কর।

মরীচি। আমরা অবলাজাতি, পর্ব্বতে বাস করি, আমরা প্রবঞ্চনা জানি না, প্রতিজ্ঞা করিয়া সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাকে ঘোরতর পাপ মনে করি; আমার কথা সকলের উত্তর না পাইলে, আর আপনার নিকটে পড়িব না।

পণ্ডিত। কি কথার উত্তর?

মরীচি। কতবার বলিয়াছি, বলুন আপনি বিবাহ করিয়াছেন কি না?

পণ্ডিত। আর কি কথা, বল?

মরীচি। আপনি সন্ন্যাসী, অথচ আপনার মন উদ্বিগ্ন কেন, সর্ব্বদাই আপনাকে বিষণ্ণ দেখা যায় কেন? আপনি যদি দুঃখকেই ভুলিতে না পারিবেন, তবে কেন এ পথে আসিলেন?

পণ্ডিত। এ পথে আসিলাম ধর্ম্মের জন্য।

মরীচি। ধর্ম্মের জন্য? মিথ্যা কথা; ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে আমি আজ পর্য্যন্তও কাহাকে বিষণ্ণ দেখি নাই।

পণ্ডিত। আমি ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আজিও আমি ধার্ম্মিক হই নাই।

মরীচি। পর্ব্বতে আসিয়াছেন কেন? আপনাদের দেশে কি ধর্ম্ম-সাধন হয় না?

পণ্ডিত। সে সকল কথা শুনিয়া তুমি কি করিবে? পণ্ডিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

মরীচি। কোন বিষম বিষের যাতনায় আপনি দেশ ছাড়িয়াছেন, নচেৎ কেন আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখি।

পণ্ডিত। তোমার যে প্রকার বিশ্বাস, তাহাই থাকুক, আমার মন তুমি কি প্রকারে জানিবে? যাহা হউক, এখন তুমি কি করিবে, বল?

মরীচি। আপনি আমার কথার উত্তর দিবেন না?

পণ্ডিত। তোমার কথা উত্তর পাইবার যোগ্য নহে, সুতরাং উত্তর পাইবে না।

মরীচি। বোধ হয় তবে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না, কারণ আমরা অন্য কার্য্যে দেহপাত করিতে যাইব।

পণ্ডিত। আর কথার উত্তর পাইলে কি করিতে?

মরীচি। কথার উত্তর পাইলে, সকল ছাড়িয়া আপনার সহিত যাইতাম।

পণ্ডিত। আমার সহিত যাওয়া অপেক্ষা অন্য কার্য্যে দেহপাত করা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহাই করিও, কিন্তু অন্য কার্য্য কি?

মরীচি। আপনি কি কিছুই শুনেন নাই, সাহেবেরা তিন দিন হইল, আমাদিগের মন্দির লুণ্ঠন করে গিয়াছে, মন্দিরবাসিনী সকল স্ত্রীলোক একত্রিতা হয়ে অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতে যাইবে।

পণ্ডিত। এ সকল কথা কি লামাগণ শুনিয়াছেন?

মরীচি। প্রতিশোধের কথা? তা প্রাণান্তেও তাহাদিগকে বলিবেন না, লামাগণ শুনিলে কি প্রতিশোধ লইতে দিবেন?

পণ্ডিত। তুমিও কি সেই কার্য্যে যাইবে?

মরীচি। দোষ কি? আমরা অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না, আমাদিগের দেশের ধর্ম্ম এই, লোক অনাহারে মরিলেও স্বাধীনতা বিক্রয় করে না, অত্যাচারীর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে আমরা কুণ্ঠিতা নহি।

পণ্ডিত। দোষের কথা ত আমি বলিতেছি না, তুমিও যুদ্ধ করিতে যাইবে নাকি, তাহা জানিতে চাই।

মরীচি। যদি যাই, তবে আপনি কি অসন্তুষ্ট হইবেন?

পণ্ডিত। আমি কেন অসন্তুষ্ট হইব? তোমাদের দেশের প্রথা তোমরা অনুসরণ করিবে, তাতে আমার কি? আর আমার অসন্তোষেই বা তোমার আসিবে যাইবে কি?

মরীচি। আমার কি? আছে আমার কিছু, আপনার অসন্তোষে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

পণ্ডিত। না, আমি অসন্তুষ্ট হইব না, তুমি যাইও।

মরীচি। তবে নাকি আপনি সন্ন্যাসী? আপনি প্রতিহিংসাকে অন্যায় জ্ঞান করেন না?

পণ্ডিত। আমার পক্ষে করি, কিন্তু অন্যের সম্বন্ধে কি প্রকারে করিব?

মরীচি। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহার উচিত ধর্ম্মের কথা সকলকে বলেন।

পণ্ডিত। সকলে শুনিবে কেন?

মরীচি। শুনুক বা না শুনুক, তাতে ধার্ম্মিকের কি? ধার্ম্মিক বিশ্বাস করেন, তাঁহার কথা সকলেই শুনিবে। তাঁহারা কখনও লোককে ইচ্ছাপূর্ব্বক কুপথে যাইতে দেন না।

পণ্ডিত। তোমাকে বলিলেও যখন আমার কথা প্রতিপালন কর না, তখন কেন আর বৃথা বলিব?

মরীচির চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়, এ প্রকার অপবাদ দিবেন না; আমি কোন্ দিন আপনার কোন্ ভাল কথাটী অবজ্ঞা করিয়াছি? পড়িতে বলিলে পড়িনা, কেবল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছি বলে; আপনি কি আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বলেন?

পণ্ডিত। না, তোমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বলি না। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।

মরীচি। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব? আপনি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে বলিতেছেন? মনে করুন, আমি একজন সাহেবের সহিত চলিয়া যাইব, আপনি আমাকে এরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে দিতে পারেন?

পণ্ডিত। আমি না পারিলেও তোমার পিতা পারেন।

মরীচি। আপনি পিতার স্বভাবের একটুকও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তিনি কন্যাকে কখনও কুপথগামিনী হইতে দিতে পারেন না।

পণ্ডিত। তবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক হন না কেন?

মরীচি। তিনি জানেন, আমি কখনই কুপথে যাইব না।

পণ্ডিত। ইহার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন?

মরীচি। কতবার। আপনি কথা তুলিলেন কেন? নচেৎ মনের কথা মনেই রাখিতাম; আপনি আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারিণী, দুশ্চরিত্রা বলিয়া জানিয়াছেন, নচেৎ কে মনের কথা সন্ন্যাসীর নিকটে ব্যক্ত করিত? এই যে ছুরিকা দেখিতেছেন, ইহার দ্বারা পাঁচ জন দুর্দ্দমনীয় রিপুর অধীন সাহেবের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছি; আপনি অন্তরে আঘাত না করিলে কে মনের কথা আজ আপনার নিকট ব্যক্ত করিত?

পণ্ডিতের হৃদয় চমকিত হইল, সবিস্ময়ে বলিলেন, মরীচি! তোমাদের দেশীয় অন্য কোন স্ত্রীলোকের নিকটে ত এ প্রকার অস্ত্র দেখি নাই, পুরুষদিগের নিকটেই ছুরিকা থাকে, তুমি ইহা রাখিয়াছ কেন?

মরীচি। বিবাহিতা রমণীগণের নিকট এ অস্ত্র থাকে না সত্য, কিন্তু আবশ্যক বোধে ইহা রাখিবার অধিকার সকলেরই সমান। মন্দিরবাসিনী কুমারীগণের সকলের নিকটেই ইহার এক এক খানি থাকে।

পণ্ডিত। তোমার ছুরিকায় আজ রক্ত মাখান রহিয়াছে কেন?

মরীচি। "কল্য আমি আর দিদি বেড়াইতে গিয়াছিলাম, আমরা এ কয়েক দিনই বেড়াইতে যাইতাম; কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, একজন সাহেব বহির্দ্দেশে ভ্রমণ করিতেছে; সাহেব আমাদিগকে দেখিয়া ডাকিল, দিদি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন, আমি নির্ভয়ে সাহেবের নিকটে গেলাম। সাহেব আমাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। মন্দির লুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব দিন ঐ সাহেবটাকে একবার দেখিয়াছিলাম। কল্য আমাকে পাইয়া সে যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইল; আমাকে বলিল—আমরা এ দেশের রাজা হইব, তুমি আমার সহিত চল, কত সুখ পাইবে।

আমি বলিলাম, তোমার সহিত কোথায় যাইব সাহেব? তুমি যে ম্লেচ্ছ! সাহেব উত্তর করিল;—আমার দেশের আর আর সকলে ম্লেচ্ছ বটে, কিন্তু আমি ম্লেচ্ছ নহি। আমার সহিত শিবিরে চল, সেখানে তোমার জন্য কত সুন্দর সুন্দর সামগ্রী রাখিয়াছি।

আমি বলিলাম—তোমার কটা চুল কটা দাড়ি ত একরকমই দেখিতেছি, তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছ নহ ?

সাহেব বলিল, দেখনা, আমি কেমন সুন্দর।

আমি সাহেবের সুন্দর অঙ্গের পরিচয় কিছুই পাইলাম না, বলিলাম, তোমার সৌন্দর্য্য লয়ে মরে যেতে ইচ্ছা হয়।

সাহেব আমার ঠাট্টা বুঝিল না; বলিল, বিবিরা বলিয়া থাকে, আমার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আর নাই; আমার গুণ সম্বন্ধে আমি আরও সুন্দর। আমি এদেশের রাজা হইব, তুমি আমার শিবিরে চল।

আমি বলিলাম, সাহেব, তোমার গুণ স্মরণ করিলে এখনই তোমাকে লয়ে যমপুরে পলায়ন করিতে ইচ্ছা হয়।

সাহেব এবারও আমার ঠাট্টা বুঝিল না, সাহেব ক্রমেই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; আমি বলিলাম, এদিকে আসিও না।

সাহেব বলিল, কেন সুন্দরি? আমি যে তোমাকে পাইতে আসিয়াছি।

আমি বলিলাম, তোমার সহিত গেলে আমাকে কি দিবে ?

সাহেব বলিল, যা চাও তাই দিব।

আমি বলিলাম, আমি তোমার সহিত গেলে তোমরা এদেশ ছাড়িয়া যাইবে ?

সাহেব বলিল, নিশ্চয় যাইব ; তোমাকে পাইলে স্বর্গও পরিত্যাগ করিতে পারি।

আমি বলিলাম, তোমার অধীনের সকল সৈন্যকে বধ করিতে পারিবে ?

সাহেব বলিব, নিঃসন্দেহে পারিব, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

এই কথা বলিতে বলিতে সে আমার নিকটে আসিল, আমি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম, সে সহসা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিল, আমি, বলপূর্ব্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া অন্য দিকে চলিলাম, পামর আমাকে সেখানে যাইয়া লালায়িত ভাবে ধরিয়া কত মিষ্ট সম্ভাষণ আরম্ভ করিল; আমি বলিলাম—সাবধান—ম্লেচ্ছজাতি, চিরকাল কৃতঘ্ন, এ শরীরে হাত দিবি ত এখনই দেখাব।

সাহেব উন্মত্তের ন্যায় মনে ভাবিল, আমি তাহাকে ছলনা করিতেছি, বলিল, সুন্দরি, তুমি এখন অসহায়া, কে তোমাকে রক্ষা করিবে; আমিই

তোমার দেহ, প্রাণ, জীবন, মান, আমি তোমার সকলি, তুমিও আমার সকলি ; এই বলিয়া দ্রুতবেগে আসিয়া আবার আমাকে ধরিল ; আমি বল প্রয়োগ করিয়াও তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলাম না ; অবশেষে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ছুরিকা বাহির করিয়া তার বক্ষে বিদ্ধ করিলাম। পামর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল, আমি নির্ভয়ে গৃহে আসিলাম। এ সকল কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ? আমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধিনী কি না, তাহা জানি না, কিন্তু পিতা মাতার নিকট কখনই অবিশ্বাসিনী নহে।”

পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন, মরীচির সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি স্নেহ ভরে মরীচির পদচুম্বন করিলেন।

মরীচি বলিলেন, এ জীবন কলঙ্কের ভাণ্ডার, পাপের অগাধ সলিল, আপনি আমার পাপের স্রোতে আর পঙ্ক মিশ্রিত করিবেন না, আমি মহা পাপী।

মরীচির চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। পণ্ডিত বলিলেন, মরীচি কেন বৃথা অশ্রু বরিষণ কর, স্ত্রীলোকের সতীত্বের ন্যায় পরম আদরের বস্তু কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দেখি নাই, যাঁহারা আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে পারেন, স্বর্গ তাঁহাদেরই, তুমি কেন বৃথা রোদন কর।

মরীচি ক্রন্দন-স্বরে বলিলেন,—আমি নরহন্তা, পিশাচী, আপনার নিকট শিক্ষা না পাইলে কখনও কাতর হইতাম না ; আপনার নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছি, আমার জীবন তার সম্পূর্ণ বিরোধী ; আমি আজ আপনার নিকট ঘোরতর অপরাধে অপরাধিনী হইলাম।

পণ্ডিত বলিলেন, তুমি অযথা কাতর হইতেছ ? আমার ধর্ম্মেও এ প্রকার স্থলে প্রাণনাশ অবৈধ নহে। আমি তোমাকে আজ হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিতেছি ; আমি তোমার স্বর্গীয় স্বভাবের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি।

মরীচি ক্রন্দন-স্বরে আবার বলিলেন, আপনিও আমাকে অপরাধিনী মনে করিয়াছেন, নচেৎ কি কারণে আমার কথার উত্তর দিলেন না।

পণ্ডিত মরীচির হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আমি কল্য পত্রে তোমাকে সবিশেষ লিখিয়া জানাইব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতের পত্র।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মরীচি পণ্ডিতের পত্র পাইলেন, পত্রে এই লেখা ছিল।

"মরীচি,

কল্য আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাই আজ মনের সকল কথা, তোমার জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম। তুমি যখন আমার পত্র পাইবে, তখন আমি সকল পর্ব্বত শ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রান্তর পর্য্যন্ত পৌছিব, তখন নিশ্চয় তুমি আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না, আমি এ পাপচিত্র, আর তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিব না। আমি অত্যন্ত অপরাধী, আমার হৃদয় জঘন্য, হৃদয়কে পবিত্র না করিতে পারিলে নিশ্চয় আত্মঘাতী হইয়া মরিব।

মনুষ্যের মন প্রেমে গঠিত; প্রেম হৃদয়ের স্বাভাবিক ধন, এই প্রেম অত্যন্ত পবিত্র পদার্থ, তাহা জানি, কিন্তু গঙ্গা যেমন পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়াই প্রান্তরের পঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া অপবিত্র হয়, মানবের হৃদয়ও ধর্ম্ম ছাড়িয়া এই প্রেমের অনুসরণে যাইয়া সংসারের কলঙ্ককে ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাকে অপবিত্র করিয়া ফেলে। প্রলোভনে মুগ্ধ মানব এই পঙ্কিল প্রেমের অনুসরণে ধাবিত হইয়া অনেক প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করে, অবশেষে ইহার বিষে প্রাণ পর্য্যন্ত ছটফট করিতে আরম্ভ করে।

মরীচি! আমি তোমার মন বুঝিয়াছি; তোমার হৃদয় পবিত্র, তাহাও বুঝিয়াছি; কিন্তু সংসারের বিভীষিকা দেখিয়া দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, নচেৎ তোমার প্রেমকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতাম। তুমি নরক হইতে অনেক দূরে রহিয়াছ, নরকের চিত্র তুমি কখনও দেখ নাই, কিন্তু আমি নরকের কীট, চিরকাল নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিয়াছি; আমার হৃদয় পাপপঙ্কযুক্ত, সংসারের মৃত্তিকা, ঐ পাষাণভেদী পবিত্র প্রেম-গঙ্গাকে আমার পঙ্কিল হৃদয়মৃত্তিকায় আনিতে ভীত হইয়াছি; নিশ্চয় জানি ঐ প্রেম, ঐ স্বচ্ছ সলিল এ হৃদয়ে আসিলেই মলিন হইয়া

যাইবে; সংসারের অপবিত্রতায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে; তাই তোমার প্রেম-নদীকে নীচে আনিতে চেষ্টা করি নাই; আমার জীবনে আর পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতে অভিলাষ নাই।

আমি চেষ্টা করি নাই, কিন্তু তোমার পবিত্র প্রেম অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, আমার মধ্যেও যতটুক পবিত্র প্রেম ছিল, তাহা তোমাকে দিয়াছি, কিন্তু আমার যৎসামান্য প্রেমে তুমি সন্তুষ্ট হও নাই, তাহা আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিতে চাও, তাহাও বুঝিয়াছি; কি করিব? এই অপবিত্র হৃদয়ে তোমার প্রেম পবিত্র থাকিবে না, ইহা আশঙ্কা করিয়া, তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম। আমি নরকের কীট, তোমাকে ছাড়িয়া অবশ্য শান্তিতে থাকিতে পারিব না, কিন্তু তাই বলিয়া, তোমাকে কলঙ্কিত করিয়া জীবনে আর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিতে পারি না।

আমার গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—প্রলোভনের মধ্যে আমার জিতেন্দ্রিয়ত্বের পরীক্ষা হইবে, আমার হৃদয় অসার, আজও প্রলোভনের দাস রহিয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়াও আপনাকে অটল রাখিতে পারি না, প্রলোভনে জয়ী হইতে আমি আজও সক্ষম হই নাই। যখন বুঝিলাম, এ হৃদয় অল্পে অল্পে তোমার প্রতি আসক্ত হইতেছে, তখনই তোমাকে প্রলোভন বলিয়া বুঝিলাম; তখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ঠিক করিলাম। তোমার প্রতিও আমার তখন সন্দেহ হয়েছিল, তোমাকে এই প্রকার গরল পানে উদ্যত সন্দেহ করিয়া আমি তোমার পিতার নিকটে সকল কথা বলিলাম; তিনি তোমাকে জানিতেন, আমার কথাকে তিনি উড়াইয়া দিলেন। এখন বুঝিয়াছি, তোমার হৃদয় পবিত্র, আমার হৃদয় অপবিত্র; এখন বুঝিয়াছি, আমি তোমাকে সর্পজ্ঞান করিয়াছিলাম, আর তুমি আমাকে অমৃত জ্ঞান করিয়াছিলে। আজ তোমাকে মনের কথা বলি,—তুমিই অমৃত, আমিই সর্প; এ সর্পের বিষ তোমার সহ্য হইবে না, তাই তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। মরীচি, প্রলোভনে পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত আমি আজও হই নাই। আমি ডুবিলাম; আমার ধর্ম্ম জীবন অগাধ পাপ-সলিলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। হায়, আমার উপায় কি হইবে?

আমার বেশ বিশ্বাস আছে, আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের গরল দ্বারা দংশন করি নাই, কিন্তু কি জানি তবুও আশঙ্কা হয়, তাই বলিতেছি যদি তুমি

আমার বিষের দ্বারা দষ্ট হইয়া থাক, তবে পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিও, এ সকল কথা বলিবার অনেক কারণ আছে, সংসারের প্রেমের অনেক যন্ত্রণা, আমি স্ত্রীলোকের হৃদয়ে অনেক দিন হইল দংশন করিয়াছি; আমি জঘন্য মানব; আমি অযথা নিরপরাধিনী সরলা কামিনীর মনে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, আমি নরাধম, আমি নরপিশাচ। এ সকল কথা কেন বলিতেছি? আমি বিবাহ করিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী অত্যন্ত সরলা ছিলেন, আমি তাহাকে যে সকল কষ্ট দিয়াছি, তাহাতেই আমার অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হইবে। আমার স্ত্রী আমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানিত না; কিন্তু আমি অম্লান বদনে তাহার হৃদয় দংশন করিয়া তাহার সমক্ষে কত ন্যায়-বিরুদ্ধ জঘন্য কার্য্য করিয়াছি; সে সকল শুনিয়া মরীচি তুমি আর কি করিবে? এ জীবন নরকের কীটের আধার, বিষম গরলে পরিপূর্ণ; তুমি আমাকে সর্পের ন্যায় পরিত্যাগ করিও।

আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভাল থাকিব না, আমার জীবনে অনেক কষ্ট আছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি; আমার জীবন-সর্ব্বস্ব সুর-বালার অদর্শন আমার অসহ্য, সেই যন্ত্রণায় অহরহ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দিন রাত্রি অবসন্ন ভাবে বিষাদে দিন কাটাই; আজ হইতে আবার তোমার অদর্শন-জনিত কষ্টরাশি হৃদয়ে পোষণ করিলাম; জীবন হইতে ধর্ম্মের বোঝা বিসর্জ্জন দিলাম।

আমি যদি ভাল স্বামী হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে সংসারের সুখের মর্ম্ম বুঝাইতে পারিতাম; আমি অবলাকুলের ভালবাসার অযোগ্য পাত্র, তাই তোমাকে এই সকল মর্ম্মভেদী কথা বলিলাম। কিন্তু সংসারে প্রেম অপবিত্র হইলেও তাহা সুখ-শূন্য নহে। কর্দ্দমময় সংসারেই গঙ্গার অধিক আদর। প্রেমের অপরিস্ফুট চিত্রেও সংসারের উষ্ণতা ও কালিমা দূর হইয়া যায়, এই অপরিস্ফুট প্রেমেও কতলোক জীবন পাইয়া থাকে; আমি সে সকল বর্ণনা করিতেও কাতর হই, কারণ আমি স্বামী-কুলের কলঙ্ক; সংসারের প্রেমের সুন্দর মূরতি আমার নিকটে পাইবে না।

আমি চলিলাম,—বোধ হয় তোমার বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিয়া চলিলাম, কোথায় যাইব, জানি না, কত দিন হৃদয়ের আগুনে দগ্ধীভূত হইব, জানি না; ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিবেন কি না, জানি না, তবুও আবশ্যক বোধে, অনিশ্চিত পথে জীবনকে ভাসাইলাম।

তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইও, কারণ তোমার হৃদয় পবিত্র, আমি অপবিত্র হৃদয়ে তোমার ছবি আঁকিয়া লইয়া চলিলাম, কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিব না, কখনও মুছিয়া ফেলিব না।

তোমার পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইলে, আমার গুরুদেবের আশ্রমে লিখিও; তাহা হইলেই, আমি তাহা পাইব।

তোমার অকৃত্রিম স্নেহের, সংসারের গরলধারী—সন্ন্যাসী।

এই পত্র পড়িয়া মরীচি কি করিলেন; তাহা পরে বিবৃত হইবে। সন্ন্যাসী কোথায় চলিলেন? পাঠক! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইহাকেই একদিন শ্মশানে দেখিয়াছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তীরধারিণী ললনা।

সর্দ্দার তিন দিবস পরে যশলাল সিংহের সংবাদ লইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিল, এবং সামান্য ঘটনাকে ভীষণাকারে সাজাইয়া ইংরাজদিগের নিকট ব্যক্ত করিল। সর্দ্দারের সকল কথা বলা হইতে না হইতে ইংরাজ-সৈন্য যুদ্ধ-যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। নিমেষ মধ্যে চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

যখন সকলেই যুদ্ধের জন্য লালায়িত হইয়া ভীষণ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল, তখন সর্দ্দার বলিল—"দোহাই ইংরাজ বাহাদুর, আমি অতি সামান্য জীব, কিন্তু যাহা বলিতেছি, ইহা কখনই অব্যর্থ হইবে না, এত অল্প সৈন্য লইয়া তোমরা কখনও যশলালের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে না।" এই কথা শুনিয়া সকলেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় ঘৃত সংযোগের ন্যায় উষ্ণ হইয়া উঠিল, সকলেই সর্দ্দারের কথাকে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু এই সময়ে, অতিশয় বুদ্ধিমান, ধীর, এবং চতুর, সৈন্যাধ্যক্ষ, সকলকে অগ্রসর হইতে বলিয়া সর্দ্দারকে ডাকিয়া পুনরায় শিবিরে প্রবেশ করিলেন; শিবিরে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই;—

"সৈন্যাধ্যক্ষ। সর্দ্দার, তুমি কি প্রকারে জানিলে, আমরা জয়লাভ করিতে পারিব না?

সর্দ্দার। কোন যোদ্ধা আজ পর্য্যন্ত যশলাল সিংহের সহিত সম্মুখ-সমরে জয়লাভ করিতে পারে নাই; বিশেষতঃ আমাদের সৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

সৈন্যাধ্যক্ষ। পার্ব্বতবাসীরা বন্দুক দেখিলেই পলায়ন করিবে।

সর্দ্দার। বন্দুককে কেহই ভয় করিবে না, কারণ, যশলালের সকল সৈন্য গুপ্তভাবে থাকিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। আর যশলাল কি করিবে?

সর্দ্দার। যশলাল কেবল পরামর্শ দিবে; কিন্তু যখন দেখিবে যে, শত্রুকুল প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আপনি তরবারি লইয়া বাহির হইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। যশলালকে আমরা ধরিতে পারিব না?

সর্দ্দার। কোন প্রকারেই না।

সৈন্যাধ্যক্ষ। তবে আমরা কি করিব?

সর্দ্দার। উপায় আছে; কলিকাতা হইতে সাহায্য প্রার্থনা করুন, আর এদিকে আমি অজ্ঞাতসারে সিকিমের রাজার নিকট গমন করি।

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজার নিকট গমন করিলে কি হইবে?

সর্দ্দার। আমি প্রলোভন দ্বারা রাজাকে নিশ্চয় বশ করিতে পারিব। যশলাল সিংহের বিরুদ্ধে কথা বলিলে রাজার মন নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজা কি যশলালকে বিশ্বাস করে না?

সর্দ্দার। বিশ্বাস করেন, কিন্তু টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া আমার কথা শুনিবেন, এ প্রকার বিশ্বাস আছে; নচেৎ যশলাল থাকিতে ত আর কোন উপায় দেখি না; যতদিন রাজা যশলালের পরামর্শ মতে চলিবেন, ততদিন এই সকল স্থান অধিকার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজাকে টাকা দিলেই যদি যশলালের হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তাহা হইলে আর কলিকাতা হইতে সাহায্য প্রার্থনার আবশ্যকতা কি?

সর্দ্দার। সকল স্থানে কেবল প্রলোভন প্রদর্শনে কার্য্যোদ্ধার হয় না। ভয় প্রদর্শন ব্যতীত এ দেশীয়দিগের মন সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না।

সৈন্যাধ্যক্ষ। তোমার কথা যদি রাজা না শুনেন?

সর্দ্দার। আমি এক সময়ে রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলাম, আজ কাল যদিও তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বটে, কিন্তু তথাপি আমি যদি বলি যে, আপনার হিত সাধনের জন্য আমি সাহেবদিগের পক্ষে গিয়াছিলাম, তাহা হইলে তিনি সকলই বিস্মৃত হইবেন। আর যদি আমার কথা তিনি না শুনেন, তবে তখন যুদ্ধ করিলেই হইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। এ সকল কথা তুমি পূর্ব্বে বল নাই কেন?

সর্দ্দার। পূর্ব্বে সময় পাইলে বলিতাম; যশলালের নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরামর্শ করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এত শীঘ্র আপনি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, কখনও ভাবি নাই।

সৈন্যাধ্যক্ষ আর কিছু না শুনিয়া বলিল,—সর্দ্দার, তুমি অনেক পুরস্কার পাইবে, অদ্যকার যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হইতে না পারি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে সিকিম রাজার নিকট পাঠাইব। তুমি এখন বিশ্রাম করিতে যাও। এই বলিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ অশ্বে আরোহণ করিয়া কশাঘাত করিলে অশ্ব নিমেষ মধ্যে বিদ্যুৎবেগে সমর সন্নিধানে চলিল।

সমর কোথায়? সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, কেবল পথিমধ্যে তাহার সৈন্যগণের মৃত দেহ লক্ষিত হইতে লাগিল; তিনি মৃত দেহ লক্ষ্য করিয়া অশ্ব চালাইলেন। যত যাইতে লাগিলেন, ততই মৃত সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিতে লাগিলেন, সকলের শরীরেই তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। এ সকল দেখিয়া সর্দ্দারের কথা তাহার হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল।

যাইতে যাইতে অশ্ব ক্লান্ত হইল; একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় অশ্ব পদস্খলিত হইয়া অপ্রশস্ত রাস্তায় পড়িয়া গেল, সৈন্যাধ্যক্ষ আশ্চর্য্য কৌশলে আপনাকে রক্ষা করিয়া অশ্বের বল্‌গা পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রস্তর খণ্ডের উপরে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাহার পায়ে একটী তীর বিদ্ধ হইল। তিনি আপন অসির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিকে নয়নকে ফিরাইয়া দেখিলেন, একটী যুবতী যুদ্ধের বেশে তাহার পশ্চাৎদিকে ধাবিত হইয়া আসিয়াছে; যুবতীর বাম হস্তে ধনুকের ফলক, দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা; যুদ্ধের বেশে রমণীকে দেখিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ চমকিত হইলেন; হস্তের অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, বীর-পুত্রি, আহত সৈনিকের প্রতি আর অস্ত্রাঘাত করিও না, এই দেখ আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।

যুবতী বলিলেন,—সেদিনকার কথা স্মরণ কর, পাষণ্ড, সে দিন কোন্ অপরাধে মন্দিরবাসী ধর্ম্ম যাজকগণের উপর আক্রমণ করিয়াছিল? আমরা পর্ব্বতবাসিনী, নিরাশ্রয়া, অস্ত্রবিহীনা, কোন্ অপরাধে সে দিন আমাদিগকে চরণে মর্দ্দন করিয়াছিলি?

বলিতে বলিতে নিমেষ মধ্যে রমণী সৈনিকের নিকটে আসিয়া পড়িলেন, সৈন্তাধ্যক্ষ এক মাত্র কৃপার উপর নির্ভর করিয়া রমণীর নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন; বলিলেন,—বীর-পুত্রি, আমরা নারকী, আজ রক্ষা কর, আর কখনও এপ্রকার জঘন্য কার্য্য করিব না।

যুবতী ভীমস্বরে বলিলেন,দুর্ব্বৃত্ত হিংস্র জন্তুকে ফাঁদে ফেলিয়া কে কবে ছাড়িয়া দিয়াছে? বিষম গরলধারী ভুজঙ্গকে পদতলে ফেলিতে পারিলে, কে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়? পাষণ্ড, এই ছুরিকা দ্বারা আজ তোর বক্ষ বিদীর্ণ করিব।

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, বিদীর্ণ করিও, কিন্তু একটী ভিক্ষা চাই।

যুবতী। কি ভিক্ষা, বল্? তোর শত অপরাধ ভুলিয়াও তাহা পালন করিব।

সৈন্যাধ্যক্ষ। জানিতে চাই,—অদ্যকার যুদ্ধ কে করিল?

যুবতী। মন্দিরবাসিনী রমণীগণের হাতেই অধিক সংখ্যক সৈন্য হত হইয়াছে, বক্রী সৈন্যগণকে ধাবিত করিতে বাবার অধীনস্থ দুই দল তীরধারী সৈন্য গিয়াছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। তোমার বাবা কে?

যুবতী। আমি যশলাল সিংহের দ্বিতীয়া কন্যা। বাবার নাম, পাষণ্ড, কখনও শুনিয়াছিস্?

সৈন্যাধ্যক্ষ। তোমার বাবা থাকিতে তুমি যুদ্ধে আসিয়াছ কেন?

যুবতী। আমাদিগের মন্দিরের অত্যাচার আমরা ভুলি নাই!

সৈন্যাধ্যক্ষ। আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা জানিয়াছি, তোমার যাহা ইচ্ছা, এখন তাহাই কর।

যুবতীর হৃদয়ে আঘাত লাগিল, হস্তের ছুরিকা হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, বলিলেন, যাও সাহেব, তোমাকে ক্ষমা করিলাম, এ অঞ্চলে আর কখনও আসিও না। এই বলিয়া যুবতী সাহেবের নিক্ষিপ্ত অসি লইয়া স্থানান্তরে চলিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ আস্তে আস্তে শিবির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ।

সৈন্যাধ্যক্ষ মৃদু মৃদু পদসঞ্চারণ করিয়া শিবির অভিমুখে যাত্রা করি-লেন। শিবিরের নিকট যাইয়া দেখিলেন, শিবির লুণ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া দারজিলিং যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সেই বিশ্বাসী সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, সর্দ্দার! তুমি কোথায় চলিয়াছ?

সর্দ্দার। আর কোথায় যাইব? অদ্যকার দুর্দ্দশার সংবাদ দিতে দারজিলিং চলিয়াছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ। দুর্দ্দশার সংবাদ কিছু পাইয়াছ?

সর্দ্দার। যথেষ্ট পাইয়াছি, দুইটী সৈন্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা বলিল, অতি কষ্টে আমরা দুইজন প্রাণ বাঁচাইয়াছি, আর সকলেই যুদ্ধে হত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইবার এক দণ্ড পরেই যশলাল সিংহ সৈন্য লইয়া শিবির আক্রমণ করিতে আগমন করেন। শিবির রক্ষার্থ যে কয়েকজন প্রহরী ছিল, তাহারা সকলে পূর্ব্বেই পলায়ন করিল, আমি উপায়হীন হইয়া যশলালকে বলিলাম "যশলাল—সকল অপরাধেরই দণ্ড আছে, ইহা মনে রাখিও; এই ভাবেই চিরদিন যাইবে না; এখনও সাবধান হও।" সে বলিল—তুই দেশের কুলাঙ্গার,কাপরুষ, কৃতঘ্ন, তুই অর্থের গোলাম; স্বদেশের প্রতি তোর ন্যায় অকৃতজ্ঞ নারকীর দণ্ড কি নাই? আমরা দেশকে রক্ষা করিতে যাইয়া যদি দণ্ডনীয় হই, জীবনকে সার্থক মনে করিব, তুই দণ্ডের হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবি, বলত?

আমি বলিলাম,—আমার কি দণ্ড যশলাল?

যশলাল। তোর কি দণ্ড? মনে করিস্ না, ইংরাজ বাহাদুর প্রবঞ্চক-দিগকে দণ্ড বিধান না করিয়া ছাড়িবেন? তা ভিন্ন প্রতারককে বিধাতা কি করিবেন?

আমি বলিলাম—আমি তাহাদিগের প্রতি কি প্রবঞ্চকের কার্য্য করিয়াছি।

যশলাল। ইংরাজের প্রতি করিবি কেন? তোর স্বদেশের প্রতি করিয়াছিস্; নিশ্চয় জানিস্, তুই চিরকাল সকলের নিকটে অবিশ্বাসী হইয়া থাকিবি।

একথা শুনিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ মনে মনে হাসিলেন।

সর্দ্দার কহিল—"আমি বলিলাম, সে চিন্তা তোমার করিতে হইবে না, আপনি সতর্ক হও; আপনি রক্ষা পাও, তারপর পরের ভাবনা ভাবিও।

সৈন্যাধ্যক্ষ স্নেহযুক্ত স্বরে বলিলেন, সর্দ্দার, তুমি প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।

সর্দ্দার বলিল; "তারপর যশলালের আজ্ঞায় শিবির লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, আমি শিবিরের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইলাম, ভাবিলাম, যত শীঘ্র কলিকাতায় সংবাদ প্রেরিত হইবে, ততই মঙ্গল।"

সৈন্যাধ্যক্ষ।—যা'ক, এখন আর গত বিষয় স্মরণ করিয়া প্রয়োজন নাই; পূর্ব্বে তোমার কথা শুনিয়া চলিলে আর কোন বিপদ ঘটিত না। এখন তোমার প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিব। তুমি গোপনে সিকিম রাজার নিকটে অর্থ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া যাও, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, যশলাল বিশ্বাসঘাতক; যশলাল বিশ্বাসঘাতক তাঁহার মনে এবিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকিবে না, আমি আজই জলপাইগুড়ীতে সৈন্য আনয়নের জন্য লোক পাঠাইব, অন্যান্য স্থানেও সংবাদ পাঠাইব।

সর্দ্দার। চলুন, আপাততঃ দারজিলিং যাই।

সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দ্দারের কথা শিরোধার্য্য করিয়া তখনই দারজিলিং যাত্রা করিলেন।

নানাপ্রকার পরামর্শ করিতে করিতে, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সর্দ্দার যথাসময়ে দারজিলিং পৌছিলেন, দুই জনেই দুটী অশ্ব লইয়াছিলেন, দারজিলিং পৌছিতে দুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

সৈন্যাধ্যক্ষ দারজিলিং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পূর্ব্বেই সমস্ত স্থানে সংবাদ পাঠান হইয়াছে, তিনি প্রচুর অর্থ এবং উপঢৌকন সহিত সেই দিনই সর্দ্দারকে সিকিমে প্রেরণ করিলেন। তিন দিবসের মধ্যে অনেক সৈন্য আসিয়া একত্রিত হইল; কলিকাতা হইতে অনুমতি আসিল, "বিনা বিলম্বে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।" চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন হইতে লাগিল; নানা স্থান হইতে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল; যুদ্ধের প্রণালী ঠিক করিবার জন্য দারজিলিং সহরে মন্ত্রী

সৈন্যাধ্যক্ষকে মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বিখণ্ড করিব, যশলালের দণ্ডবিধান এ সংসারে কে করিবে? যদি ন্যায় অন্যায়ের বিচার এ জগতে সম্ভব হয়, তবে তাহা কখনই আপনার ন্যায় অর্থের গোলামের দ্বারা নহে। নিশ্চয় জানিবেন, আমার পুরস্কার আমি পাইব।

রাজা। কি পুরস্কার যশলাল? তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের আবার পুরস্কার কি?

যশলাল। আপনি অর্থের গোলাম, আমার কার্য্যের পুরস্কার আপনি কি দিবেন? তবে সর্ব্বদর্শী যিনি, তাঁহার নিকট কখনও আমি উপেক্ষিত হইব না।

রাজা। কি পুরস্কার যশলাল? তুমি কি কার্য্য করিয়াছ?

যশলাল। কি করিয়াছি? তাহা আপনার ন্যায় অকৃতজ্ঞ মানবের নিকট বলিলেও পাপ হয়। এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি যাহা করিয়াছি, তাহা এদেশের বিজ্ঞ মাত্রেরই হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে; আজ আমি আপনার ন্যায় প্রভুর নিকট উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও স্বদেশীর নিকট কখনই অবিশ্বাসী নহি, ঈশ্বরের নিকট কখনও অপরাধী নহি। আপনি অর্থের গোলাম, আপনি আমার কার্য্যের মহিমা কি বুঝিবেন?

রাজা। যশলাল, তুমি আমাকে যথেচ্ছা অপমান করিতেছ, তোমাকে এখনই দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

যশলাল নতশিরে বলিলেন,—রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ন্যায়ের সোপান, প্রেমের আধার; কিন্তু আপনি কি রাজা? আপনাকে রাজা বলিতে আজ আর ইচ্ছা হয় না।

রাজা। যশলাল, সাবধান; আমি রাজা নহি, তবে রাজা কে?

যশলাল। এই হতভাগ্য দেশের রাজসিংহাসন আজ শূন্য রহিয়াছে। দেশের কল্যাণের প্রতি, দেশের উন্নতির দিকে যাহার দৃক্‌পাত নাই, সে কখনই এই ঈশ্বর-সৃষ্ট স্বাধীন দেশের রাজা নহে; দেখিতেছি, সিকিমের রাজসিংহাসন আজ শূন্য রহিয়াছে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব ভিন্ন অর্থের গোলাম কখনও এ সিংহাসনের রাজা হইবার যোগ্য নহে।

রাজার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, বলিলেন, যশলাল, সাবধান, এখনি তোমাকে বন্দী করিব। আমি এই সিংহাসনের অধিকারী, তাহা কি ভুলিয়াছ?

যশলাল। আপনি কৃতঘ্ন, আপনি কাপুরুষ, অর্থের দাস, ইংরাজের গোলাম, স্বদেশের প্রাণ-হন্তা, আপনাকে একদিন ভয় করিয়া থাকিলেও আজ ভয় করিতে পারি না।

রাজা। বশ্যতা স্বীকার কর; যশলাল, নচেৎ তুমি অবশ্য দণ্ড ভোগ করিবে।

দুঃখে অপমানে যশলাল উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিলেন, তোমার কি সাধ্য আমার প্রতি কিম্বা আমার দেশের প্রতি দণ্ড বিধান করিবে? তুমি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য্য করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছ; তুমি মাতৃভূমির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, বিদেশের প্রণালীকে রাজ্যে আনয়ন করিয়াছ, তুমি কৃতঘ্ন, নরাধম, কাপুরুষ, তোমাকে ভয় করিয়া যে দিন চলিতে হইবে, সে দিন আপনিই এই অসির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া থাকিব কাহার জন্য? মনে করিও না, যশলাল দণ্ডের জন্য ভীত হইয়াছে,—আমি স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়া থাকি, দেশের নিকট অবশ্য আমি দণ্ড পাইব। কিন্তু তুমি কে?

যশলালের ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজা চমকিত হইলেন, বলিলেন, —এখনি তোমাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিব।

যশলাল। তোমার সে ক্ষমতা নাই, এই অসি আমার হাতে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই, আমার নিকট আসিতে পারে; তুমি কাপুরুষ, তুমি আমার বাহুবল কি প্রকারে বুঝিবে?

এই সময়ে সংবাদ আসিল, ইংরাজেরা যশলালের সৈন্যগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিয়াছে, এবং অচিরে সিকিমে আসিয়া পৌঁছিবে।

যশলালের হৃদয় মন অস্থির হইল, বলিলেন,—পাপিষ্ঠ, নরাধম, কৃতঘ্ন, তোর চক্রান্তেই এই দেশের স্বাধীনতা এতকাল পর বিনষ্ট হইল। এই বলিয়া যশলাল স্বীয় অসি নিষ্কাশিত করিয়া, আপন অশ্বারোহণ করিয়া ইংরাজগণের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সহস্র সহস্র পর্ব্বতবাসী যশলালের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে সমস্ত সিকিম প্রদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, তাপর অশ্বারোহণে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট গমন করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ চিত্র কে দেখিবে?

ধনীর বাড়ী—লোকে পরিপূর্ণ। বৈঠকখানায় অবিশ্রান্ত পিপীলিকার ন্যায় সারি সারি লোক আসিতেছে ও যাইতেছে; গান বাদ্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত। পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহকারী মৌমাছিই মধুর আদর জানে, কিন্তু বহুদিন সঞ্চিত মধুভাণ্ডার-লুণ্ঠনকারী তাহা কি প্রকারে বুঝিবে? মৌমাছির ছয় মাসের পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে যখন লুণ্ঠনকারীর করায়ত্ত হয়, তখন তাহার পক্ষে সে মধুর আদরের পরিমাণ করা সামান্য ব্যাপার নহে। মধু সংগ্রহকারী মৌমাছির ন্যায় যাঁহারা আপনারা বঞ্চিত থাকিয়া, অনবরত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন, তাঁহারাই অর্থের আদর জানেন; কিন্তু সেই সঞ্চিত অর্থরাশি অপর কোন ব্যক্তির অদৃষ্টে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্ট স্বীকারে মিলিয়া যাইলে তাহার পক্ষে সে অর্থের উপযুক্ত আদর কখনই সম্ভবে না; সুতরাং অনায়াসে সে সেই সঞ্চিত অর্থরাশি নিমেষ মধ্যে উড়াইয়া দিতে পারে। বসন্তপুর উত্তর বাঙ্গালার একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, ইহাতে অনেক ধনী লোকের বাস। আমরা যে ধনীর বাড়ীর বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে ধনী সময়-গহ্বরে আত্মপ্রতিমা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বিষয় স্ত্রীর নামে রেজেষ্টারি করা হইয়াছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সাবালক পুত্রের হাতে তাঁহার সঞ্চিত মধুর ভাণ্ডার অকালে পড়িয়াছে। ধনীর পুত্র যে সকল দোষে দূষিত থাকে, ইনি তদপেক্ষা কম নহেন; নাম হরনাথ রায়। হরনাথ পিতার আদরের পুত্র, আদরে প্রতিপালিত হইয়াছেন, সুখ ও ভোগ বিলাস ইঁহার জীবনের

সহচর। বাল্যকাল হইতেই বিলাসের দাস হইয়া মনুষ্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইনিই এক্ষণ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; ইহার আহ্লাদের সীমা নাই; বাড়ী এয়ারদলে পরিপূর্ণ;—কিন্তু সমস্ত বাড়ী নহে, কেবল বাহির বাড়ীই আমোদের ভাণ্ডার, আর অন্দর মহল? অন্দর মহল ঘোরতর বিষাদের আকর। আমরা একবার সেই অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া দেখিব। সেখানে কি দেখিতে পাই? অন্দর মহল সকল প্রকার আমোদ-শূন্য, দেখিলে যেন প্রাণ ফাটিয়া যায়। একটী বিধবা রমণী এক ঘরে পড়িয়া দিন রাত্রি অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন; আর এক ঘরে একটী যুবতী অধোবদনে বাম হস্তে মস্তক ন্যস্ত করিয়া মলিন ভাবে কতই কি চিন্তা করিতেছেন, সম্মুখের মৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তের সূচিকা দ্বারা চিত্রিত ও বিদারিত; যুবতী সেই চিত্রের প্রতি এক ভাবে চাহিয়া চিন্তা করিতেছেন। কি চিন্তা করিতেছেন? আমরা জানি না; তবে জানি, ঐ বিধবা রমণী হরনাথের গর্ভধারিণী জননী; আর ঐ যুবতী হরনাথের সহধর্ম্মিণী, নাম সুরবালা। সুরবালা মলিন-বসনা, শরীর জর্ণ ও শীর্ণ।

পাড়ার একটী সমবয়স্কা যুবতী প্রায়ই সুরবালাকে দেখিতে আসিত। আজ আসিয়া দেখিল, সুরবালা বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া মাটীতে কি আঁক কাটিতেছেন; সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'বউ! ও কি, তুই মাটীতে আঁক কাটিয়া কি দেখ্‌ছিস?'

"সেদিন ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, মাটীতে আঁক কাটিয়া আয়ু গণনা করা যায়; তাই দেখ্‌ছি, আর কদিন পোড়া সংসারে থাক্‌ব!"

"ছি, ওকি বউ, অমঙ্গল কামনা করিস্ কেন? তোর আবার ভাবনা কি, তুই ত রাজরাণী।

সুরবালা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, নিমেষ মধ্যে তাঁহার নয়ন বিদ্যুৎবেগে আশ্চর্য্যরূপে ঝলসিয়া উঠিল, বাষ্পে নয়ন পরিপূর্ণ হইল, মৃদু স্বরে বলিলেন;—আর বাঁচিতে সাধ নাই, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর চক্ষে জল দেখিলে আমার প্রাণ অস্থির হয়, মনের মধ্যে কত প্রকার অমঙ্গলের ভাব উপস্থিত হয়। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর মুখ যতদিন প্রফুল্ল ছিল, ততদিন এ বাড়ীতে লক্ষ্মী ছিল, আর সে দিন নাই; এখানকার দুরবস্থার বিষয় ভাব্‌লে হৃদয় অস্থির হয়।

"এ গ্রামের মধ্যে তোদের বাড়ীতে যেমন আমোদ প্রমোদ, এমনত আর

কোথাও না ; তোদের বাড়ীর লক্ষ্মী আবার কোথায় যাবে ?” যুবতী বলিল, “যাক সে সকল কথায় আর কাজ নাই, যে দুঃখে আমি দিন কাটাই, মনের মানুষ ভিন্ন সে দুঃখের যাতনা আর কে বুঝিবে ? আপনি আর কথা তুলিবেন না।”

‘সে কি বউ ? বল্‌না তোর কি কষ্ট ? তোর স্বামী কি আবার বিয়ে কর্‌বে ? কেন, তোর সন্তানাদি হলো না বলে বুঝি ? এমন সোণার পদ্ম-তেও কাঁটা রয়ে গেল ; তাইত এম্‌নি করে আর তোর কদিন যাবে ?’

“স্বামী যদি বিয়ে করিতেন, তাতে আমার কষ্ট কি ? বরং স্বামী যদি বিয়ে করে সুখী হন, সে ত আমার পরম সুখের কথা। স্বামীর সুখেই আমার সুখ, তাতে আমার কষ্ট কি ? স্বামীর চরণ পূজা ভিন্ন আর স্বামীর নিকটে অধিক কিছুই আশা করি না ; আপনি ওপ্রকার কথা বল্‌বেন না, ওপ্রকার কথা শুন্‌লে আমার মনে আঘাত লাগে।”

‘তুই তা বুঝ্‌বি কি ? সতীনের জ্বালা ত কখনই স’য়ে দেখিস্‌ নি, তুই তা কি বুঝ্‌বি ?

“সতীন আবার কি ? স্বামীর প্রিয়পাত্রী আমার হৃদয়ের সামগ্রী ; স্বামীর ভালবাসার জন আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু, তা হতে আবার কষ্ট পাব কেন ?

‘তবে তুই কি ভেবে মর্‌তে চাচ্ছিস্‌ ? ধন, জন, মান, সম্ভ্রম এর ত কিছু-রই তোদের অভাব দেখিনা।’

“যার ঘরে মা লক্ষ্মী থাকেন, তার ঘরে কিছু না থাকিলেও সুখ থাকে ; আমাদের ঘর থেকে মা লক্ষ্মী চলে গিয়াছেন।”

“সে কোন কাজের কথাই না ; তোর স্বামী বুঝি আর তোর কথা শুনে না ?”

“স্বামী আমার কথা শুনুন আর না শুনুন, তাতে কি ? আমার ন্যায় স্ত্রীর কথা না শুন্‌লে স্বামীর কি ক্ষতি ; তাতে আমারই বা কষ্টের বিষয় কি ?”

‘তবে তোর মনের কথা কি বল্‌না ?’

সুরবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যদি সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে বুক চিরিয়া মন দেখাইতাম। এই বলিয়া আলুলায়িত-কেশা, মলিন-বসনা সুরবালা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্বশ্রূ ঘরে।

সুরবালা, শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে গৃহে শোক-শয্যায় শায়িতা ছিলেন, মৃদু মৃদু পদ সঞ্চারণ করিয়া সেই ঘরে গেলেন; যাইয়া মৃদুস্বরে—শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'দেখুন, আপনি ত আমাকে চিরকালই বালিকার ন্যায় মনে করেন, সেই জন্য কখনও আমি আপনাকে কোন কথা বলি না; কিন্তু এখন আর না বলিয়া থাকিতে পারি না; আপনি এই চারিমাস শোক শয্যায় শুইয়াছেন, ইহার মধ্যেই ধার কর্জ্জ আরম্ভ হইয়াছে; শ্বশুরঠাকুরের মৃত্যু সময়ে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, '৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ রহিল, আর বিষয়ে ১৬০০০৲ কি ১৭০০০৲ আয় আছে, ইহাতেই তোমরা সুখে কাটাইয়া যাইতে পারিবে।' এই চারিমাসের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল, এ ত সহজ কথা নহে; আপনি আর চুপ করিয়া থাকিবেন না; এক বার ডাকিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন। গুরুঠাকুর মহাশয় আপনাকে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাহা ত একেবারেই ভুলে গেলেন। কি উপায় হবে, আমি ত ভাবিয়া কিছুই ঠিক পাই না। নায়েব মহাশয় কাল বলিতেছিলেন, খাজনা দাখিলের আর পনের দিন মাত্র বাকী আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত টাকার কোন প্রকার চেষ্টা হইতেছে না; কর্ত্তা বাবুত সখের যাত্রার দল লইয়াই উন্মত্ত হয়েছেন, দুই তিন দিনের মধ্যে কলিকাতায় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইবেন; কাল যাত্রাদলের সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য ৩০০০ তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করেছেন। বুড় ঠাকুরুণ শোকে অন্ধ ও অস্থির, আমরা আর কি করিব? যার টাকা খাব, তার দুর্দ্দশা দেখিলে, আমরা আর থাকতে পারি না।" বুড় শিকদার, সকল কথা আমার নিকটে বলে দেয় বলে, তাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। আপনি আর এই প্রকার অবস্থায় থাকিবেন না, থাকিলে নিশ্চয় কিছুদিন পরে দুমুঠা ভাতের জন্য ভিক্ষা করিতে হইবে।

পুত্রবধূর নিকট এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হরনাথের মাতা ঠাকুরাণী শোক-শয্যা পরিত্যাগ করিলেন; অনাহারে অনিদ্রায় শরীর

জীর্ণ হইয়াছে, উঠিবার শক্তি রহিত, তবুও অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, তারপর বধূকে বলিলেন,—"হরনাথকে ডাকিতে বল, আমার চলিয়া যাইবার শক্তি নাই।"

সুরবালা গৃহান্তরে যাইয়া এক জন চাকরাণীকে বলিলেন,—তোর দাদা বাবুকে মা ডাক্‌তেছেন, তুই ডেকে নিয়ে আয়।

চাকরাণী হরনাথ বাবুকে ডাকিতে গেল, এদিকে সুরবালা আস্তে আস্তে শাশুড়ীর গৃহের পার্শ্বে স্বামীর কথা শ্রবণ করিবার আশায় গোপনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরনাথ বাবু ভাল পোষাক পরিধান করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন, এমন সময়ে চাকরাণী তাহার মাতার নিবেদন বলিল। হরনাথ বাবু সঙ্গীদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিরক্তির সহিত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মা, তুমি আমাকে ডেকেছ কেন? তোমার কি আজ অসুখ বেড়েছে? আমি এখন বেড়াতে যাচ্ছিলাম, তুমি আমাকে এখন ডাকিলে কেন?

মাতা। হরনাথ, আমার আর মরিবার অধিক দিন বাকী নাই। এই সময়ে আর কেন আমার কাটা ঘায়ের উপর আঘাত করিস্? আমার মৃত্যুর পর তোর যা ইচ্ছা তাই করিস্, এখন ক্ষান্ত হ।

হরনাথ। কি মা, ওরকম কথা বল কেন? আমি তোমার কি করেছি?

মাতা। কর্‌বি আমার মাথা! কত টাকা কর্জ্জ করেছিস্?

হরনাথের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল, মাতার কর্ণে এ সকল কথা কি প্রকারে প্রবেশ করিল, এই চিন্তায় মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল; বলিলেন,— বাবার মৃত্যু সময় নগদ যা কিছু রেখে গিয়াছিলেন, সে সকল ত বাবার শ্রাদ্ধের সময়েই ব্যয় হ'য়ে গেছে, তার পর এই তিন মাসে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করেছি মাত্র।

মাতা। আমি সকল কথাই শুনেছি, কাল হতে বিষয়ের ভার আমার হাতে রাখ্‌ব; আমি বেঁচে থাক্‌তেই তোর এত বেয়াদবি?

হরনাথের শরীর বিকম্পিত হইল; মাকে হরনাথ যমের ন্যায় ভয় করিতেন; বলিলেন, মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ক্ষমা কর। এই

বার হতে তুমি যা বলিবে, আমি তাই কর্‌ব, তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌তেছি, আমি আর তোমার কথার অন্যথা কর্‌ব না।

মাতা। আমি যা বল্‌ব, তাই কর্‌বি? আজ হতে আর কাহার সঙ্গে ঘরের বাহির হতে পার্‌বিনে; আজ হতে এ বাড়ীতে কোন মাতাল স্থান পাবে না; আজই তোর মদ্‌ খাওয়া ছাড়্‌তে হবে, আজ হতে সুরবালার কথানুসারে কার্য্য কর্‌তে হবে।

হরনাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, মা, আমি সকলি পার্‌ব, কিন্তু মদ্‌ ছাড়্‌তে পার্‌ব না; মা তোমার পায়ে পড়ি, আমি তোমার কথা ভিন্ন অন্য কাহারও কথা শুনে কাজ কর্‌তে পার্‌ব না।

মাতা। তবে দূর হ, তুই আমার বিষয়ের কোন অংশের অধিকারী হতে পার্‌বি নে। এই বলিয়া মাতা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ হতে হরনাথকে একটী পয়সা দিবে না, তুমি আমার নায়েব, হরনাথের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, আজ হতে আমার কথার অন্যথা করিয়া কখনও চলিবে না। সর্দ্দারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার বাড়ীর ভিতরে কিম্বা বাহির মহলে হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যদি কোন লোক প্রবেশ করে, তবে আমি প্রত্যেকের পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা করিব।

তারপর সুরবালাকে ডাকিয়া বলিলেন, বউ, আমার হরনাথকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি যদি আজ হতে ইহাকে ভাল করিতে না পার, তবে আর কখনও তোমার কথা শুনিব না। আমি পেয়াদাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব, হরনাথ আর বাড়ীর বাহির হইতে পারিবে না।

হরনাথের মাতার নির্জ্জীব বাক্যেও সমস্ত বাড়ী কম্পিত হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। হরনাথ নির্ব্বাক হইয়া সুরবালার সহিত অন্য গৃহে গমন করিলেন। এক মুহূর্ত্ত পর হইতেই হরনাথের মাতার কথানুসারে কার্য্য চলিতে লাগিল।

বাহিরে যে সকল সঙ্গী হরনাথের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা ক্ষুণ্ণ চিত্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। সহসা সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাখী শিকলি কাটিয়া পলাইল।

স্বামীকে লইয়া সুরবালা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরনাথের আর যত দোষ থাকুক; একটী গুণ অত্যন্ত প্রবল ছিল,তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন, তাঁহার হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। সুরবালাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। পঙ্কিল সংস্কারের কুসংসর্গ তাঁহার স্বচ্ছ সলিলবৎ জীবনকে কর্দ্দমময় না করিলে, তাঁহার জীবন অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত; কিন্তু অর্থ ও পিতা মাতার আদর প্রভৃতি প্রথমে, এবং প্রলোভনযুক্ত কুপরামর্শ শেষে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অসারত্বে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে; তবুও পরীক্ষা করিয়া লইলে, হরনাথের মনে অনেক সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃভক্তি তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। হরনাথের দেবপ্রকৃতির অংশ কেবল মাতৃভক্তিতে নিবদ্ধ ছিল।

সুরবালা স্বামীকে গৃহে লইয়া বিছানার উপরে বসাইলেন, তারপর বলিলেন,—দেখ্‌লে ত, আমার কথা তুমি তখন শুন নাই, এখন বলত তোমার কোন্ সঙ্গী তোমাকে রক্ষা কর্‌বে? এখন আমার হাতে পড়েছ, আজ তোমাকে বেশ করে শিখায়ে দিব।

হরনাথ। তুমি আমাকে কি শিখাবে? তুমি ত আর মদের পাত্র হাতে করে আমার মুখে ধর্‌তে পার্‌বে না, যে তাতে আমি ভুলে যাব? তুমি আর আমাকে কি শিখাবে?

সুরবালা। তা বটেই ত, আমি বিষ পাত্র তোমার মুখে ধর্‌তে পার্‌ব না বলে তোমার মনে বিশ্বাস আছে যে, আমি আর কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না।

হরনাথ। কি কর্‌বে?

সুরবালা। যা'ক, ঠাট্টা তামাসায় আর প্রয়োজন নাই, আমি একটী সুন্দর গান শিখেছি, শুন্‌বে? সুরবালা গাইলেন;—

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

সুন্দর বনের পাখী, ইচ্ছা দেখি নয়ন ভরে,
শিখাই সুবোল তারে, বেঁধে রাখি প্রেম-শৃঙ্খলে॥
দিতে পারি দেহ প্রাণ, এ ছার যৌবন মান,
যদি ছেড়ে বনের আশা, বসে পাখী হৃদ্ পিঞ্জরে॥

শুনিয়া পাখীর গীত, হবে মন হরষিত ;
জুড়াবে তাপিত প্রাণ, আলিঙ্গন করে তারে ॥
যদি পাখী না কয় কথা, পাইব মরমে ব্যথা,
অনায়াসে ছেড়ে যাব, এ সংসার কারাগারে ॥

হরনাথ। বা, বেশ গানটী ত, কোথায় শিখ্‌লে, আবার গাও না ?

সুরবালা। কেন গাব ? তুমি কি আমার কথা শুন্‌বে ? কথা না শুন্‌লে কেন গাব ?

হরনাথ। আচ্ছা তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌ব।

সুরবালা। তবে গাই,—

পাখী তোরে ভালবাসি, মন ভরে দিবানিশি ;
ইচ্ছা করে পুষি তোরে, ধরিয়া প্রাণ-পিঞ্জরে ॥
কত করে বুঝাই তোরে, যাস্‌নে পাখী দূরে উড়ে,
না দেখিলে তোরে পাখী, একাকিনী মরি জ্বলে ॥

সুরবালা। বল, জীবন ! আর আমাকে ছেড়ে যাবে না, বল, আর মদ খাবে না ; বল, আর অসৎ সংসর্গে যাবে না।

হরনাথ। আবার গান গাও, তবে তোমার কথা শুন্‌ব।

সুরবালা। শুন্‌বে ? তবে গাই—

পাখীর প্রাণ নিষ্ঠুর, করে সদা উড়ু উড়ু,
বাঁধ্‌তে নারি ভালকরে, প্রেম-শৃঙ্খল দিয়ে তারে ॥
উড়ে গেলে আরবার, আস্‌বে না ত ফিরে আর,
কি করিব কি হইবে, তাই ভেবে মরি প্রাণে ॥
কাটিয়ে প্রেমের জাল, কোথা যাবি চলে আর,
মারিস্‌নে আর পাখী মোরে, বলি তোর পায় ধরে ॥

হরনাথ। তুমি ত বেশ গান গাইতে শিখেছ ; আমার সঙ্গীদের নিকটে তোমার এই গানটী একবার গাইতে হবে।

সুরবালা। তোমার সঙ্গীদিগের নিকটে কি আর যেতে পারবে ? তোমার মাতাঠাকুরাণী সে পথে কণ্টক পুঁতেছেন।

হরনাথ। আমার সঙ্গীদিগকে না দেখে আমি কি থাক্‌তে পারি ? তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দেও।

সুরবালা। আমার কথা শুন্‌বে ত ?

হরনাথ। শুন্‌ব।

সুরবালা। আমার গান শুনেছ ত? আচ্ছা বল ত গান্‌টী কেমন?

হরনাথ। গান্‌টী বেশ, শুনে প্রাণ সঙ্গীদের জন্য অস্থির হচ্ছে; এই সময়ে একটু মদ্ পেলে কত সুখী হতাম।

সুরবালা। অমন কথা মুখে এন না।

হরনাথ। কেন মুখে আন্‌ব না? তুমি কি আমার গুরুঠাকুরাণী?

সুরবালা। এই মাত্র না বলিলে আমার কথা শুন্‌বে?

হরনাথ। বলেছি বা, তাতে কি হয়েছে? তুমি মেজেষ্টার সাহেব নাকি যে, একটী কথা বলেছি বলেই ফাঁসি হবে।

সুরবালা। ছি ওকি, প্রতিজ্ঞা করে কি তা ভাঙ্গ্‌তে আছে?

হরনাথ। বা রে মেয়ে; আমরা ত ঐরূপ কত করি; দিনের মধ্যে পাঁচ শত গোণ্ডা মিথ্যা কথা বলি; তুমি কি আমাকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঠিক করেছ নাকি? বা রে, এতদিন পরে আমাকে ধার্ম্মিক ঠিক করেছ, বা রে আমি যেন একজন ধার্ম্মিক আর কি?

সুরবালা। এক জনকে ধার্ম্মিক বলা কি গালাগালি নাকি? পৃথিবীর মধ্যে ধার্ম্মিক হওয়ার চেয়ে আর ভাল কি?

হরনাথ। ওমা! আমি কি স্বর্গে এসেছি? ও মা রে মা, উপদেশের চোটে যে অস্থির হলেম!

সুরবালা। আমি আজ তোমাকে কি উপদেশ দিলেম? স্ত্রী কি স্বামীকে কখনও উপদেশ দেয় না? আমার উপদেশ যদি তুমি শুন্‌তে, তবে আর তোমার এ দশা হত না।

হরনাথ। তুমি কি আমার গুরু, তাইতে তুমি উপদেশ দেবে? ওমা, এ গুরুঠাকুরুণ আমার ঘরে কোথা থেকে এলো? এ বিল্পির হাত এড়াতে পার্‌লে বাঁচি যে। গুরুঠাকুরুণ! তুমি আমার কি দশা দেখ্‌লে?

সুরবালা। তোমার বিষয় যে নিলাম হবে, তা কি শুনেছ?

হরনাথ। তা সদর খাজানা না দিতে পারি, সরকার বাহাদুর আমার বাবার বিষয় বিক্রয় কর্‌বে; তাতে তোর কি? তোর ত বাবার বিষয় নয়।

সুরবালার নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত হইল, অঞ্চল দ্বারা জল মুছিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার কথা আজও শুন, আমাকে প্রহার কর, কি বা ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু আমার কথাকে আর তুচ্ছ ক'র না।"

বলিতে বলিতে সুরবালার চক্ষু মুদিত হইল, মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ঈশ্বর, স্বামীর মন পরিবর্ত্তন ক'রে তোমার পতিতপাবন নামের মহিমা দেখাও।'

হরনাথ সুরবালার এই অবস্থা দেখিয়া নিমেষ মধ্যে ছাদের উপরে পলায়ন করিলেন। ছাদের সহিত একখানি গুপ্ত মই সংলগ্ন ছিল, তদ্বারা অনায়াসে ভূমিতে অবতরণ করিয়া স্বীয় অভিলষিত স্থানে চলিলেন। সুরবালার এত যত্নের পোষাপাখী নিমেষ মধ্যে জাল ছিন্ন করিয়া উড়িয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের মন গরলপূর্ণ।

পাখী উড়িয়া কোথায় চলিল? যেখানে অরণ্য, যেখানে পাপের প্রলোভনে বৃক্ষ পরিপূর্ণ, পাখী উড়িয়া যাইয়া সেইখানে পড়িল। পাখী কি আর সঙ্গী পাইল? মুক্তপাখী, মুক্তস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া, অনেক পাখীকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিল; তারপর মুক্তস্বরে ঘরের কথা তাহাদিগের নিকট প্রাণ ভরিয়া বলিয়া কৃতার্থ হইল।

অন্য পাখীর মধ্যে দুইটী ভাল পাখী ছিল, তাহারা বলিল—হরনাথ, বাস্তবিকই তোমার মাতা বিরক্ত হইতে পারেন, আমি আজ শুনিলাম, তোমার সদর খাজনারও যোগাড় হয় নাই, তুমি ত আবার তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করে, যাত্রার দল করিতে যাইতেছ। তোমার টাকা তুমি ব্যয় করিবে, আমাদের কি? আমরা আমোদ করিব, আমাদের তাতে আপত্তি কি? কিন্তু তোমার জননী তিরস্কার করিতে পারেন। তুমি তাতে বিরক্ত হইও না, তিনি তোমার মঙ্গলের কথাই বলেছেন।

আর একটি পাখী বলিল—তোমার সরলা স্ত্রীর কষ্ট মনে হলে বড়ই দুঃখ হয়। আমি গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিকট তোমার স্ত্রীর প্রশংসা শুনেছি, সকলেই বলে তোমার স্ত্রীর অত্যন্ত কষ্ট। বাস্তবিক ঘরের টাকা বাহির করে এই প্রকার উড়াইয়া দেওয়া নিতান্তই গর্হিত কার্য্য।

হরনাথ অধোবদনে রহিলেন।

দলের অন্য পাখী সকল বিরক্তি সহকারে কিচ্‌মিচ্‌ করিয়া উঠিল, সকলেই বলিতে লাগিল—কিরে ভাই, এখন বুঝি মদের পাত্র হাতে নাই,

এখন বুঝি তারে নারে, তারে নারে। এই বলিয়াই হরনাথের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, হরনাথ বাবু, তোমাকে কত দিন বলেছি, এই দুটো নেমকহারামকে সঙ্গে রেখ না, তা তুমি ত শুনেও শুন্‌বে না। সে দিন ইহারা দুইজনে একত্রিত হয়ে তোমার মায়ের নিকট, আমরা যাহা যাহা করি, সে সকল বলে দিয়াছে। ইহাদের মিষ্ট কথা শুনে তুমি ভুলে যাও, ভাব ইহারা তোমার প্রকৃত বন্ধু; বাস্তবিক তাহা নহে, আজ যে তোমার জননী সর্ব্বনাশ করেছেন, এ সকল ইহাদের কুপরামর্শে। তুমি চলে এস, আমরা তোমাকে সৎপরামর্শ দিচ্ছি; ভয় কি তোমার? আমাদের দল বজায় থাকৃতে আর চিন্তা কি? এক গ্লাস, না হয় দুগ্লাস, না হয় এক বোতল; আর সকল চিন্তা দূর হইয়া যাইবে; ভয় কি হরনাথ বাবু? আর একটী কথা তুমি এত দিন শুন নাই; ইহারা দুজনে সে দিন ময়দানে বসিয়া উপাসনা করিতেছিল। তোমার সঙ্গে ইহারা বেড়ায় কেন, তাহা ত তুমি জান না; তোমাকে কেমন করে ধার্ম্মিক করবে, ইহারা সর্ব্বদা সেই চেষ্টায়ই ফেরে। ছি, চল আমাদের সঙ্গে।

হরনাথের মুখ প্রফুল্ল হইল, কথা বলিতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় প্রথম হিতৈষী বলিলেন,—হরনাথ, আমাদের কথা তুচ্ছ করিও না, জননীর কথা অমান্য করিলে কখনও মঙ্গল হইবে না। আমাদের কি? এই আমরা চলিলাম। এই বলিয়া দ্বিতীয় হিতৈষীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। আর হরনাথ বলিতে লাগিলেন,—তাই ত আমি এত দিন পরে ইহা-দিগের চক্রান্ত উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি; ইহারা চক্রান্ত করিয়া আমাকে কোন রকমে ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টায় ছিল, তা আমি কি আর ভুলি! যতদিন এ সংসারে মদ আছে, ততদিন আর ভুলিবার ছেলে আমি নই, কেমন্ ভাই সকল? অমনিই চতুর্দ্দিকে তাইত, তাইত, হবে না কেন, যে বাপের ছেলে, হবে না কেন, এই প্রকার আনন্দের ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সকলে মদের বোতল খুলিয়া আনন্দে মদ পান করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম গ্লাসের পর হর্ষের প্রবাহ চলিল, দ্বিতীয় গ্লাসে অল্পে অল্পে জ্ঞান বিলুপ্তের সঙ্গে উল্লাস বৃদ্ধি পাইল; তৃতীয় গ্লাসের পর অধিকাংশেরই উন্মত্তভাব উপস্থিত হইল, কয়েক জন পরিপক্ক মাতালের এক বোতলেও কিছুই করিতে পারিল না। ইহাদিগের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা চতুর,

সে বলিল,—প্রাণ হরনাথ, এস বাবা তোমার মুখচুম্বন করি; বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক তুমি। এই প্রকার সম্বোধন শুনিয়া হরনাথ উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় এয়ার বলিল,—হরনাথ, তোমার স্ত্রীকে লয়ে এলে আজ বড়ই আমোদ হত।

হরনাথ বলিতে লাগিলেন, ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ, তা ধিং তা ধিংতা, হরি বল সকলে, আমি নৃত্য করি। হরনাথ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় এয়ার বলিল, হরনাথ তোমার মাতা তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, তার দণ্ড বিধানের কি ঠিক করেছ?

হরনাথ বলিলেন,—মদের নদী বহিতেছে, পান কর আর ডুবে যাও, সে ভাবনায় কাজ কি?

তৃতীয় এয়ার। কাজ নাই, তবে কাল আর মদের নদী কোথায় পাইবে?

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং তা, কর্জ্জ কর্‌ব তার ভাব্‌না কি?

চতুর্থ এয়ার। তোমাকে ত আর কেহ কর্জ্জ দেবে না; এখন যে তোমার বিষয় তিনিই গ্রহণ করেছেন। সে উইল খানা চুরি করে লয়ে এলেই ত বুড়ীর মাথায় বজ্র পড়্‌বে।

তৃতীয় এয়ার। তার ভাবনা কি? আমিই উইল চুরি করে আন্‌ব।

দ্বিতীয় এয়ার। তা চুরি কল্লেও হবে না, তা রেজেষ্টারি করা হয়েছে।

প্রথম এয়ার। আমি সব জাল কত্তে পারি, পঞ্চাশ টাকা খরচ কল্লেই সকল ঠিক করে দেব।

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং তা; দাদা তুমিই আমার সকল, তোমাকেই আমার বিষয় ছেড়ে দিব।

প্রথম এয়ার। তোমার বিষয় সে ত পরের কথা; এখনই কি তোমার নিকট অল্প উপকার পাইতেছি।

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং তা, মায়ের সর্দ্দারি ভেঙ্গে দেব, তা ধিং তা ধিং।

প্রথম এয়ার। আচ্ছা হরনাথ, আর একটী কাজ কেমন?

হরনাথ কাণ লইয়া তাহার মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন, কি কথা?

প্রথম এয়ার। তোমার জননীর এ রোগের ভাল ঔষধ আছে।

হরনাথ। ভাল ঔষধ আছে? তা ধিং তা ধিং; যত টাকা লাগে তা

দিতে প্রস্তুত আছি ; লাগে টাকা দেব, ভাব্‌না কি, মায়ের ঔষধ আনিয়া দাও ?

প্রথম এয়ার। তবে আমার সহিত আইস, আজ রাত্রেই ঔষধ দিয়া রাখি ; কল্য দুই প্রহরের সময় খাওইয়া দিও।

হরনাথ আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিলেন ; আর আর এয়ারগণ বলিয়া উঠিল, বা বেশ ঠিক করেছ, বেশ ঠিক করেছ ; তোমার নিকট যে ঔষধ আছে, তা দিলে একেবারেই রোগের দফা নিকাশ হয়ে যাবে।

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং, আমি এতদিন তোমাদের কাছে রয়েছি বাবা, আমি কি সে ঔষধের বিষয় জানি না ?

প্রথম এয়ার বলিবার জন্য মুখ খুলিবে, এমন সময়ে, অন্য সকলে বলিয়া উঠিল, তা কল্যই জানিবে, ভাব্‌না কি ?

হরনাথ তা ধিং তা ধিং করিতে করিতে প্রথম এয়ারের সহিত ঔষধ আনিতে চলিলেন।

অন্যান্য এয়ারগণ আমোদ প্রমোদ শেষ করিয়া যথা সময়ে গৃহে চলিয়া গেল।

হরনাথ ঔষধ লইয়া তৃতীয় প্রহর রজনীতে স্বীয় বাড়ীর বহির্দ্দেশে শয়ন করিয়া রহিলেন ; মাতার মহৌষধ আপন পরিধেয় বস্ত্রের এক কোণে বাধা ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমৃতে বিষ ! !

বিষম গরলপূর্ণ চির-বৈষম্যময় মানবের মন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ক্ষমতা মানবের থাকিলে, এ সংসারে অনেক বিপদের ভার হ্রাস হইয়া যাইত। ভৌতিক নিয়মে পৃথিবীতে যে সকল অদ্ভুত বিপদরাশি সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া মানবকে অস্থির করিয়া তুলে, সে সকলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে ঔষধের প্রয়োজন, তাহা কাল সহকারে অনেক মানবের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন হইয়া আসিতেছে; বিশেষ অশিক্ষিত কিম্বা অসতর্ক লোকভিন্ন আর ভৌতিক বিপদরাশি কাহাকেও বিলোড়িত করিতে সমর্থ

হয় না। কিন্তু মানবের মন যত দিন গরলপূর্ণ রহিবে, ততদিন গৃহজাত বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় কি? যাঁহারা বিশেষরূপে নানা জীবন অধ্যয়ন করিয়া কৃতী পুরুষমধ্যে গণ্য হইয়াছেন; তাঁহারাও মানবের মনের গতি নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে পরাভব স্বীকার করেন। বাস্তবিক বাহিরের কোন প্রকার ব্যবহার, রীতি, আকৃতি বা স্বভাব পরীক্ষা করিয়াই মানবের কুটিল মনের গতি নির্দ্ধারণ করা যায় না। মানব, যখন মনে গরল পোষণ করিয়া, বাহিরে চাতুরীবলে অন্য প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই অজ্ঞান বিষের জ্বালায়, কতজন প্রতারিত হইয়া, সংসার হইতে অবসর লইতে বাধ্য হয়! যদি পৃথিবীতে এমন কোন যন্ত্র থাকিত, যদ্দারা মানবের কুটিল মনের পরীক্ষা হইতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীর বিপদরাশি অনেকাংশে অবসর লইত। আমাদিগের এ কথার প্রমাণ তাঁহারাই উৎকৃষ্টতররূপে পাইবেন, কখনও যাঁহারা হৃদয়ে গরল পোষণ করিয়াছেন। আমরা ত এপ্রকার চিত্রের প্রমাণ সর্ব্বদা পাইয়া, কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক, কি সরল, কি কপটী, কি সৎস্বভাবসম্পন্ন লোক, কি প্রবঞ্চক, সংসারী লোকের প্রতি বিরক্ত হইয়া গিয়াছি; দিন রাত্রি হৃদয়ে গরল পোষণ করিতে বাধ্য হইয়া সংসারকে বিষময় বলিয়া জানিয়াছি। তাঁহারাই সংসারে ধন্য, যাঁহারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণ করিয়া, যশ মানের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ও রিপুদিগের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও কখনও মনে গরল পোষণ করিয়া পৃথিবীকে প্রতারণা করিতে অগ্রসর হন না; কিম্বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছাকেও হৃদয়ে স্থান দেন না। ধন্য তাঁহাদিগের জীবন, যাঁহারা ভিতরের ভাবের সহিত বাহিরের স্বভাবকে অনুরঞ্জিত করিতে পারিয়াছেন। আমরা সংসারের জীব, বিষম গরল হৃদয়ে পোষণ করিয়াও তাঁহাদিগের পদধূলি মস্তকে বহন করিয়া কৃতার্থ হইতে সর্ব্বদাই লালায়িত।

রজনী প্রভাত হইল, হরনাথের মাতা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে শয্যা পরিহার পূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্তা হইলেন, হরনাথের মনের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, তিনি এখনও বৈঠকখানায় নিদ্রা যাইতেছেন।

অতি প্রত্যূষে রজনীর সেই ঔষধ-প্রদাতা আসিয়া বাড়ীতে প্রবে[illegible]র লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; প্রহরীগণ যখন কোন মতেই হরনাথ[illegible]

দ্বার মুক্ত করিয়া দিল না, তখন তিনি বলিলেন, হরনাথ বাবুকে একবার ডাকিয়া দেও, আমি তাহার নিকট কয়েকটা বিশেষ আবশ্যকীয় কথা বলিয়া যাই।

প্রহরী বলিল,—বাবু এখন ঘুম যাচ্চেন, এখন তাঁকে ডাকিতে পার্‌ব না। বাবুর সহিত তোমাদের আজ হতে সকল রকম আলাপ পরিচয় বন্ধ হয়ে যাবে।

ঔষধ-প্রদাতা বলিল,—আমি আর কিছু বলিব না, আমি কবিরাজ, বাবুর কাল কি অসুখ হইয়াছিল, আজ তিনি কেমন আছেন, দেখিয়া যাইব। আমাকে ছাড়িয়া দেও, বাবু তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন।

প্রহরী। তবে মা ঠাকুরাণীর নিকট অনুমতি লইয়া আসি, তারপর তিনি বলেন ত দ্বার ছাড়িয়া দিব্‌।

এই কথা শুনিয়া ঔষধ-প্রদাতা মনে মনে হাসিল, বাহিরে আর কিছুই না বলিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া চলিল।

গুরুদেবের চরণ পূজা না করিয়া হরনাথের মাতা কোন কার্য্যই করিতেন না; আজ বৈষয়িক ব্যাপারে মন নিযুক্ত, তিনি প্রাতঃস্মরণীয় প্রধান কার্য্য ভুলিয়াই অন্য কার্য্যে তৎপরা হইলেন।

যথাসময়ে হরনাথ মাতাকে মহৌষধ সেবন করাইলেন।

সুরবালা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর গুরুপূজায় অমনোযোগ দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কান্বিতা হইলেন; তিনি গুরুদেবের চরণ ধরিয়া রজনীর সকল বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন।

গুরুদেব স্তম্ভিত ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—সরলে সুরবালা, তুমি তোমার স্বামীকে সংশোধন করিতে পারিবে না; এ গ্রামের মধ্যে আমাকে মান্য করে না; এমন লোক দেখি না, আমার কথা না শুনে এমন লোক নাই, কিন্তু হরনাথকে এক দিনও একটী কথা বলে সদুত্তর পাই নাই। আমি এতদিন এ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম। যখন কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তখনই মনে করিয়াছি, চিরদিন একস্থানে থাকিব না। এতদিন কেবল তোমার স্নেহ ও ভক্তি এবং তোমার শাশুড়ীর শ্রদ্ধা স্মরণ করিয়া এখানে ছিলাম; এখন আমি দেখিতেছি, এবাড়ীর সকলই ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে; কি করিব? সময়ের স্রোতকে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে?

সুরবালার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন, স্বামীর চরিত্র সংশোধনের কি আর কোন উপায় নাই ? শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যে উপায় বিধান করিয়াছেন, ইহাতে কি কিছুই হইবে না ?

গুরুদেব আবার বলিলেন, তোমরা অবলা, যতই বুদ্ধির অধিকারিণী হও না কেন, সংসারের কুটিল মনুষ্যের মন কি প্রকারে জানিবে ? তোমার স্বামী এখন পাপের কীট হইয়াছেন, তিনি যাহাদিগের পরামর্শ লইয়া এক্ষণ কার্য্য করেন, তাহারা প্রসিদ্ধ বদ্‌মানুষ। তোমাদিগের চেষ্টায় কি হইবে, জানি না। তবে ঈশ্বর কাহাকে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া সৎপথে আনয়ন করেন, তাহা মানবের বুদ্ধির অতীত। সরলে, তোমার জীবনে অনেক কষ্ট আছে। তুমি কখনও বিভীষিকা দেখিয়া ভীতা হইও না।

সুরবালা গুরুদেবের চরণে ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিলেন, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যে প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার চরণ পূজা করিতেন, তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক ভক্তি সহকারে বিনীত ভাবে অঞ্জলি অর্পণ করিলেন। গুরুদেব নিমীলিত নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবের দেব, ভক্তবৎসল, সরলা কামিনীর পূজা গ্রহণ কর, সংসারে পূজা পাইবার অধিকার মানবের নাই, দেব, তাত জানি। কিন্তু একথা জগতে প্রচার করিলে মানবের মন সংসারকে অন্ধকারময় দেখিয়া অভক্ত হইয়া যায় ; তাই ত আমি পূজা গ্রহণ করি, কিন্তু এ সকলই তোমার। পাপীর প্রার্থনা, হে ভক্তবৎসল দেব, তুমিত পূর্ণ কর ; আমি পাপী, আজ কর-যোড়ে বিনীতভাবে, একান্ত বিশ্বাসের সহিত এই প্রার্থনা করি, তুমি সতী সাধ্বী সরলা সুরবালার মনকে তোমার পানে টানিয়া লও। হৃদয়বিহারি ! হৃদয়ের সকলি জান, তোমার নিকট আর অধিক কি বলিব।"

গুরুদেবের চক্ষু উন্মীলিত হইল, দেখিলেন, সুরবালার মস্তক তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত, দেখিলেন, সুরবালার নয়নজলে তাহার পদ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন, সরলে সুরবালা, তুমি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হও।

সুরবালা মস্তক তুলিয়া বলিলেন, দেব, আপনি আমাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া যাইবেন না ; আপনাকে পাইলে সকল কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিতে পারিব। দেব, আপনি চলিয়া গেলে, কি লইয়া থাকিব ? আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না।

সুরবালার গৃহে এই প্রকার দেবার্চ্চনা হইতেছে, এমন সময়ে বাড়ীর অন্য দিকে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল। গুরুদেব এবং সুরবালা উভয়েই ত্রস্ত হইয়া যাইয়া দেখিলেন, হরনাথের মাতা মৃত্তিকায় পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন!! দাসীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইয়া অন্য লোক সকলকে ডাকিতে চলিল; দ্বারবান সকল ব্যস্ত হইয়া লাঠি কাঁদে ফেলিয়া বৈদ্যের বাড়ীতে চলিল। সর্দ্দারগণ ওজা ডাকিতে চলিল। গোমস্তা প্রভৃতি সকলেই দিক্‌দিগন্তরে চলিল। হরনাথ চকিত হইয়া সকলই দেখিতে লাগিলেন। তাহার মনে তখনও কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, কারণ ঔষধ-প্রদাতা বলিয়াছিল, এই ঔষধ সেবনের পর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগী অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করিবে; তারপর যখন নিস্তব্ধ হইবে, তখনই রোগ আরোগ্য হইবে। হরনাথ এখনও রোগীর সুলক্ষণ ভাবিতেছেন; কিন্তু চতুর্দ্দিকের লোক সকল কেন অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, তাহা তিনি না বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন।

ক্রমে কবিরাজ, বৈদ্য, ওজা, ডাক্তার আসিয়া বাড়ী পূর্ণ করিল; সকলেই রোগীর লক্ষণ দেখিয়া নিরাশ মনে ভ্রুকুঞ্চিত করিল, ডাক্তার অঙ্গুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল, এখন বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ওজাগণ তখনও বলিল, আমাদের চেষ্টা করিবার সময় যায় নাই; এই বলিয়া তাহারা ঔষধ প্রয়োগ ও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল।

সুরবালা বাস্পপূর্ণ লোচনে চকিত ভাবে গুরুদেবের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। গুরুদেবকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া, হরনাথের মাতা বিষের যাতনায় অস্থির হইয়াও, গুরুদেবের নিকটে গড়াইতে গড়াইতে আসিলেন, গুরুদেবের পদ চুম্বন করিয়া অতিকষ্টে বলিতে লাগিলেন,—দেব!—আমার—আমি নারকী—আমি ঘোরতর অপরাধে অপরাধিনী, আমি আজ আপনার—চরণে—অঞ্জলি দেই নাই,—উঃ প্রাণ যায়—হরনাথ আমার কালসর্প—মরিলাম—রক্ষা পাইলাম, কিন্তু—দেব—আমি অপরাধিনী—আপনার—চরণে—রহিলাম;—ক্ষমা করুন—আর বিলম্ব নাই, যাই—প্রাণ যায়—হরনাথ আমার জীবনের সকল,—দেব ক্ষমা করুন—কিছুই জানে না—আমি—বুঝিতে পারিতেছি হরনাথ কিছুই জানে না—লোকের—কথায়—ভুলে—উঃ প্রাণ

যায়—আমাকে ঔষধ বলে বিষ দিয়েছে, দেব—হরনাথকে ক্ষমা করুন। উঃ প্রাণ যায়—আর আমাকে চরণে—স্থান দিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করুন।

এই সময়ে বাড়ীর গোমস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বিষয়ের কি করিবেন?

উঃ বিষয়—যদি থাকে—টাকা নাই—খাজনার টাকা নাই—উঃ প্রাণ যায়—যদি টাকা মিলে—যদি বিষয় থাকে, তবে আমার—প্রাণের সুরবালা—সতীকে সকল দিলাম—গুরুদেব আপনি সাক্ষী, ডাক্তার কবিরাজ সকলে সাক্ষী রহিলে—আমার বিষয় সুরবালাকে দিলাম। গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা করুন; উঃ প্রাণ যায়।

গুরুদেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মনুষ্য তোমাকে কি ক্ষমা করিবে? মনুষ্য দোষ গুণ কি জানিবে? ঐ দেখ অনন্তদেবের মঙ্গল হস্ত তোমাকে ডাকিতেছেন, যাও সাধ্বি, পতিপরায়ণা সতি, যাও অনন্তধামে; যেখানে পতি-সহবাসে আর বাধা বিঘ্ন নাই, যেখানে সুখে আর কণ্টক নাই। আমরা নরকের কীট, লোকের দোষ গুণ বিচারে অক্ষম, কি ক্ষমা করিব? তোমার অপরাধ জানি না,—তোমার দোষ জানি না—তোমার স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছুই জানি না, কি ক্ষমা করিব? তোমাকে যাহা জানি,তাহাতে এই বলিতে পারি,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, ঈশ্বর তোমার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিবেন।" এই কথা শুনিতে শুনিতে হরনাথের মাতার প্রাণবায়ু নিমেষ মধ্যে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে পলায়ন করিল। সংসারের শরা ঘট,প্রতিমা বিসর্জ্জনের পরে শূন্যগৃহে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

মাতার প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে পরে, হরনাথের হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল; তাহার মন ভাবনায় চিন্তায়, শোকে দুঃখে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার সঙ্গীগণের একটীও সেখানে নাই; সংসারের কুহকমন্ত্রে প্রতারিত হইলাম, এই আক্ষেপ সহসা মনে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনধ্বনি গগন ভেদ করিয়া হরনাথের মাতার প্রাণবায়ুকে ধরিতে উপরে উঠিল, সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। সেই গোলমালের মধ্য হইতে অদৃশ্য ভাবে গুরুদেব হরনাথকে লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন।

ঘটনাপূর্ণ জীবন-স্রোত বহমান হইল; একটী ঘটনায় অন্য একটী ঘটনার সহায়তা করিল, অন্য ঘটনাও নীরবে সংসারে বিলীন হইয়া গেল না, তাহারও আবার উত্তরাধিকারী রহিয়া গেল। এই প্রকার করিয়া জীবন-স্রোতের সহিত দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কত ঘটনা ভাসিয়া চলিল। চলিল ভাসিয়া,—যেখানে রাজপ্রাসাদ ছিল, সে স্থান অরণ্যময় হইল, যে স্থানে সুস্নিগ্ধ সলিলপূর্ণ সরসী ছিল, সে-স্থান মরুভূমি হইল, রাজা ভিখারী হইল, সংসারী সন্ন্যাসী হইল, গৃহী বনবাসী হইল; ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন কয়েক বৎসরের মধ্যে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়া চলিল। মরুভূমিতে জলের সৃষ্টি হইল, পথের ভিখারী রাজসিংহাসনে বসিল, সকল অসম্ভব সম্ভাবিত হইল; কারণ, ঘটনার হাতে চিরকাল এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া আসিতেছে। কে ঘটনাচক্রকে আবদ্ধ করিয়া মানব জীবনের পরিবর্ত্তন রুদ্ধ করিতে সক্ষম? হরনাথকে লইয়া গুরু-দেব অনেক স্থান ভ্রমণ করিলেন, গবর্ণমেণ্ট মাতৃহন্তা হরনাথের কোন সংবাদ পাইল না। সহরে, প্রত্যেক থানায় তাহার নামধাম ও আকৃতির বর্ণনা লেখা রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন, কিন্তু এমন সতর্কভাবে থাকিতেন যে, কোন প্রকারেই তাহাকে ধরিবার যো থাকিত না; এই প্রকারে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইল; তখন সকলই বিস্মৃতিতে ডুবিল, তারপর আর থানার ইস্তাহারে হরনাথের নাম নয়ন সমক্ষে পতিত হইত না। সশঙ্কিত অবস্থায় গুরুদেবের সহিত এক বৎসর বাস করাতে হরনাথের জীবনে আশ্চর্য্য পরি-বর্ত্তন লক্ষিত হইল। হরনাথ মদ মাংস সকল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার উত্তেজিত রিপু সকল দমন হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ সমূহের কথা স্মরণ করিয়া তাহার অন্তরে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। প্রকৃত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে অনু-তাপে, আত্মগ্লানিতে দগ্ধীভূত হইয়া হরনাথ জীবনের উচ্চ আশা, সংসারের খ্যাতি প্রতিপত্তি সকলই বিস্মৃত হইলেন; মনে করিলেন, গুরুদেবের

পদ সেবা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিব; মনে করিলেন, দেব সদৃশ গুরুদেবের চরণে অঞ্জলি দিলে আমি সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। এই প্রকার ভাবিয়া তিনি দিন দিন গুরুদেবের পূজার উপযোগী হইতে লাগিলেন।

এ দিকে গুরুদেব মনুষ্য চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন, কোন্ স্থানে মনুষ্যের পতন হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। যখন হরনাথের দুর্দ্দমনীয় রিপু সকল ক্রমে ক্রমে সংযত হইয়া আসিল, যখন হরনাথের পূর্ব্ব পাপের জন্য তাহার মনে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন, তখন বুঝিলেন, হরনাথ এক দিন নিশ্চয় ধর্ম্মের জন্য তৃষিত হইবে; আরো বুঝিলেন, হরনাথ অশিক্ষিত, জ্ঞান ভিন্ন ভক্ত হইলে হরনাথ নিশ্চয় অশিক্ষিত লোকদিগের ন্যায় পৌত্তলিক উপধর্ম্মে যোগ দান করিবে; ভাবিলেন, হয় ত হরনাথ এক দিন আমার চরণ পূজা করিয়াই কৃতকৃতার্থ হইবে। যাহার জীবনকে এতদূর লইয়া আসিয়াছেন, তাহাকে আবার উপধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট, সমস্ত জীবনে একটীকেও যদি সার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে না পারেন, তবে আর কি হইল? এই রূপ ভাবিয়া, হরনাথকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার হৃদয়ে দারুণ ইচ্ছার উত্তেজনা হইল; তিনি হরনাথকে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন। সেখানে আপনি যত্ন করিয়া এবং অন্যান্য আত্মীয় সকলের যত্নে ৬।৭ বৎসরের মধ্যে হরনাথকে সংস্কৃত ভাষা উত্তম রূপে অভ্যাস করাইলেন; ন্যায়, অলঙ্কার, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন এ সকলে হরনাথের বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইল। বেদ পুরাণ তাহার কণ্ঠস্থ হইল। শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত ধর্ম্মে তিনি দীক্ষিত হইলেন। গুরুদেবের উপদেশ বাক্যে তাঁহার পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা জন্মিল; ভক্তি ও জ্ঞান সহকারে সেই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় জীবন যাপনের ইচ্ছা হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইল, তিনি শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

অধ্যয়নের পর এক বৎসর হরনাথকে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিলেন। যোগ সাধনার অলৌকিক রাজ্যে হরনাথকে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন; হরনাথ যোগ সাধনায় বিশেষ রূপে যখন কৃতী হইলেন, তখন গুরুদেব বলিলেন,—হরনাথ, এখন তুমি আবার সংসারে যাও, প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে আত্মজয়ী না হইলে তুমি ধ্যানের রাজ্যে

যাইতে পারিবে না। তুমি ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ মাত্র, এখনও ধর্ম্ম-সাধনের উপযুক্ত হও নাই, কারণ সংসারের আসক্তির হাত না এড়াইতে পারিলে মানব কখনই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না; যাও সংসারে, সেখানে তোমার জিতেন্দ্রিয়ত্বের পরীক্ষা হইবে; সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আবার আমার নিকটে আসিও।

হরনাথ চমকিত হইয়া বলিলেন,—গুরুদেব, আমি আর সংসারে যাইব না, আমি সংসার ছাড়িয়া বেশ আছি, আমি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারে যাইব না, আমি এখানে থাকিয়াই পরীক্ষা দিব।

গুরুদেব। হরনাথ, ভীত হইও না। যাও সংসারে, প্রলোভন হইতে দূরে থাকিলে ত তোমার মন ভাল থাকিবেই, পাপের মোহিনী মায়ার হাত এড়াইয়া সকলেই ভাল থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা পাপের মধ্যে থাকিয়াও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন, যাঁহারা সংসারে থাকিয়াও আসক্তি-শূন্য হইতে পারেন, তাঁহারাই সাধনার যোগ্য পুরুষ। তুমি হয় ত সংসার ছাড়িয়া ভাল আছ, কিন্তু যতদিন সংসারে থাকিয়াও তদ্রূপ থাকিতে না পারিবে, ততদিন ঈশ্বর-ধ্যানের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারিবে না। এই কথার মধ্যে অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব রহিয়াছে। যেখানে সংসার-প্রলোভন নাই, পাপের মনোহারিণী মূর্ত্তি নাই, সেখানে সকলেই জিতেন্দ্রিয়; হরনাথ, তাঁহারা কখনই ধর্ম্মের উপযুক্ত নহেন। যাও সংসারে, ভীত হইও না, আর চারি বৎসর পরে ফিরিয়া আসিও।

হরনাথ। দেব, আপনিও আমার সহিত চলুন, নচেৎ আমার পরীক্ষা কে লইবে?

গুরুদেব। তোমার পরীক্ষা তোমার বিবেক গ্রহণ করিবে, আমি যাইয়া কি করিব? আমি তিন বৎসর সংসারে ভ্রমণ করিয়াছি, আর এক বৎসর আপনাকে আসক্তি শূন্য রাখিতে পারিলেই আমি পর্ব্বতে যাইব; তুমি আমাকে সেই হিমালয়ের শিখরে অন্বেষণ করিলে পাইবে।

হরনাথ। দেব, আপনি ত আমার সহিত অনেক দিন পর্য্যন্ত আছেন, আজও কি আপনার পরীক্ষার সময় শেষ হইল না?

গুরুদেব। আমি তোমার সহিত যত দিন ছিলাম, ততদিন প্রলোভন হইতে দূরে ছিলাম, পূর্ব্বে তিন বৎসর সংসারের প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াছিলাম, উহার মধ্যে আমার এক বৎসরও নষ্ট হয় নাই, আর এক বৎসর থাকিলেই আমার পরীক্ষা শেষ হইবে।

হরনাথ। উহার মধ্যে আপনার একবৎসরও নষ্ট হয় নাই, ইহার অর্থ কি ?

গুরুদেব। আমার গুরু যিনি, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া আমাকে চারি বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন, এ সময় অতি অল্প, তিনি বলিয়াছেন, "এই চারি বৎসরের কোন বৎসর যদি এক দিনও তোমার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে তোমার সে বৎসর বৃথা হইল, মনে করিতে হইবে।"

হরনাথ। আমার প্রতিও কি সেই আদেশ ?

গুরুদেব। তুমিও তাহাই করিবে ; ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি যে তিন বৎসর প্রলোভনের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছি, উহার একদিনও আমার মন বিচলিত হয় নাই ; ভয় কি হরনাথ ? অগ্রসর হও।

হরনাথ। আমি কোন্ পথে যাইব ?

গুরুদেব। যেখানে পাপের প্রলোভন অত্যন্ত ভীষণতর, সেই খানে যাইবে। প্রথমতঃ তোমাকে বাড়ীতে যাইতে হইবে, কারণ ঐ আসক্তিই তোমার সকল অনিষ্টের মূল, সংসারের অন্য ভাবনা অপেক্ষা স্বীয় পরিবারের আসক্তি বিসর্জ্জন দেওয়াই কঠিন, তুমি সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীতে যাও।

হরনাথ। আমি ত বাড়ী ছাড়িয়াই রহিয়াছি, আমার ভয় কি ?

গুরুদেব। বাড়ী ছাড়িয়া থাকিলে হইবে না, বাড়ীতে যাইয়া আসক্তি শূন্য হইয়া আইস।

হরনাথ। কোন্ পথে যাইব, আমি জানি না।

গুরুদেব বলিলেন, আমি তোমার সহিত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইয়া, তোমার বাড়ীর পথ প্রদর্শন করিয়া দিব। যেখানে তোমাকে ছাড়িয়া দিলে, তুমি নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌছিতে পারিবে বুঝিব, সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া আমি অন্যত্র যাইব।

হরনাথ। আমি যে হত্যাপরাধে অপরাধী আছি, এই সময়ে যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে ?

গুরুদেব। সে চিন্তা করিও না। মানব ভাবী বিপদ চিন্তা করিয়া কখনই কার্য্য করিতে পারে না ; যদি তোমাকে গ্রেপ্তার করে, তবে জেলই তোমার পরীক্ষার স্থান হইবে। যদি তোমার অসাময়িক মৃত্যু ঘটে, সেই মৃত্যুই তোমার পরীক্ষার শেষ হইবে, কেন ভীত হও ? নির্ভয়ে যাও, ধার্ম্মিকের শরীর স্পর্শ করিতে পারে, এমন জীব সংসারে নাই।

এই কথা বলিয়া, হরনাথকে সঙ্গে করিয়া গুরুদেব বসন্তপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুরুদেবের মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

মানব জীবন অধ্যয়নের বস্তু, অধ্যয়ন করিয়া ইহার সার অসার গ্রহণ করিতে হয়। হংস যেমন সরসী হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া আপন আহারীয় দ্রব্য উদরসাৎ করে, মানব জীবন-সরসী হইতে অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, বাঞ্ছিত সার গ্রহণে যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারাই সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে উঠিবার অধিকারী; নচেৎ গর্দ্দভের ন্যায় পরিষ্কৃত জলরাশি অসার পদার্থদ্বারা মিশ্রিত করিয়া যাঁহারা আত্ম-শরীর পোষণ করেন, এ সংসারের সার বস্তু তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কোন উপকারজনক বলিয়া বোধ হয় না, নরকেই তাঁহাদের জন্ম, নরকই তাঁহাদের পরিণতি। কিম্বা যাঁহারা অমৃতে ভিন্ন সার বস্তু আর কোন স্থানে অন্বেষণ করেন না, তাঁহাদের নিকট অনেক উৎকৃষ্ট সার পদার্থ অপরিচিত রহিয়া যায়। মধুসংগ্রহকারী মৌমাছি যেমন পুষ্পের তারতম্য গণনায় না আনিয়া, সকল পুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, যে সকল মানব সেই প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক মানবের জীবন তন্ন তন্ন করিয়া, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া,কেবল অমৃত ও সার বস্তু অন্বেষণ করেন, তাঁহারাই সংসারে ধন্য। নচেৎ সার বস্তু অন্বেষণ করিতে যাইয়া যাঁহারা অসার পদার্থে আপনাদিগকে ডুবাইয়া দেন, তাঁহাদিগের জন্য এ সংসারের চিরস্থায়ী সুখের পরিবর্ত্তে, ক্ষণিকসুখপ্রদ চিরস্থায়ী দুঃখই অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হয়। তাঁহাদিগের জীবন, ইতর প্রাণীগণের ন্যায় জঘন্য ও মনুষ্য নামের অনুপযোগী পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মর্ত্ত্যলোকে পাপের কীটের ন্যায় বিচরণ করে। সংসারে একপ্রকার ধার্ম্মিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কেবল সাধুগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। ধার্ম্মিক যখন অসাধুকে পরিত্যাগ করিলেন, তখনই তিনি স্বার্থপর হইয়া, ঘৃণাকে সঙ্গে লইয়া, স্বর্গ-রাজ্যে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। আবার অন্য একপ্রকার ধার্ম্মিক

আছেন, তাঁহারা কেবল পাপীগণের সহিত বাস করিতে ইচ্ছুক, সাধু-সহবাসের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। এই দুই শ্রেণীর লোকই বিষম রোগগ্রস্ত। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, প্রত্যেক মানবজীবনই অধ্যয়নের উপযুক্ত; এমন ঘৃণিত কোন জীবনই নহে, যে জীবনে অন্য মানবের শিক্ষার উপযুক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা যে সকল জীবনকে অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া সচরাচর উপেক্ষা করি, সে সকল জীবনেও এমন রত্নপূর্ণ অধ্যায় আছে, যাহা উৎকৃষ্ট জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই কাহাকেও ঘৃণা করিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে; সকলের জীবনেই পরস্পরের শিক্ষোপযোগী বিষয় নিহিত রহিয়াছে, এই বিশ্বাস প্রত্যেকের মনে দৃঢ় হইলে অনায়াসে অহঙ্কারের ভয়ানক রাজ্যের আধিপত্য হইতে মানব আপনাকে রক্ষা করিয়া যাইতে পারে। এক বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া গিয়াছেন, "পাপকে ঘৃণা করিও, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না।" এই কথাটী অত্যন্ত সারপূর্ণ। আমরা অনেক সময়ে পাপকে ঘৃণা করিবার ছলনায় পাপীর প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইয়া যাই যে, তাহার জীবনে নিহিত সার বস্তু আর বহু চেষ্টা করিয়াও উপার্জ্জন করিতে পারি না। পাপকে ঘৃণা করিয়াও যদি ভালবাসার আকর্ষণে আমরা পাপী, তাপী, পুণ্যাত্মা সকলেই, ইন্দ্রিয়ের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর মিলিত হই, তবে আমাদিগের পরম লাভ। মাতা যে প্রকার পুত্রের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজ স্নেহ গুণে স্তন্য পান করাইয়া সন্তানকে পালন করেন, সেই প্রকার স্নেহ ও ভালবাসা আমাদিগের হৃদয়কে পরিশোভিত করলে, পাপের দণ্ডবিধান করিয়াও ভ্রাতাকে রক্ষাকরা ও আপন ভাবা যায়। প্রত্যেকের জীবনেই অনুকরণীয় সত্য আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া যে দিন ভারতবাসী, জাতি ধর্ম্ম, দেশ কাল, পাপ পুণ্য সকল ভুলিয়া যাইবেন এবং এক হস্তে ন্যায়, অপর হস্তে প্রেমের বিশ্ববিস্তৃত শৃঙ্খল লইয়া পরস্পরের জীবন অধ্যয়নে নিযুক্ত হইবেন, সেইদিন পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির সুন্দর প্রকৃতি দেদীপ্যমান হইবে, এবং সেইদিন প্রেমের আকর্ষণে ভারতকে অতল জলধি হইতে তুলিতে সকলে ধাবিত হইবে। তখন কেহ এ প্রেম-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ফেলিতে পারিবে না। বিধাতার নিকট সেই দিনের সুপ্রভাতের জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

আমরা যে গুরুদেবের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায় সমূহে বারম্বার বলিয়া আসি-

য়াছি, তিনি অত্যন্ত প্রাচীন বৃদ্ধ হইলেও, জ্ঞানবলে মানব হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় রিপু সকল বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আরো বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরস্পরের জীবন অধ্যয়ন ভিন্ন মানব কখনই উন্নত হইতে পারে না এবং ভারতবর্ষের লোক সকলেরও উন্নতির আশা নাই। তিনি জানিতেন, কোন্ বস্তুর অভাবে ভারতবাসীর মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয় না। জানিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কখন আপনাকে ঠিক করিতে পারি, তবে একদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন, যদি কখনও সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে তখন ভারতবর্ষে এই সকল কথা প্রচার করিব। গুরুদেবের হৃদয় কি প্রকার ভালবাসার ভাণ্ডার ছিল, তাহা পাঠকগণ দেখিবেন; আমরা তাঁহারই মন্ত্রের একাংশের ব্যাখ্যা এ অধ্যায়ে অতিরঞ্জিত করিলাম মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জন।

সুরবালা কত যত্ন করিয়াও যে স্বামীকে এক দিনের তরেও মদ ও অসৎ সংসর্গের মোহিনী মায়ার হাতছাড়া করিতে পারেন নাই, আজ গুরুদেবের সাধনার কৌশলে, সেই সুরবালার জীবন-ধন, সকল প্রকার আসক্তির হাত হইতে মুক্তির পরীক্ষা দিবার জন্য সংসারে যাইতেছেন, কত আহ্লাদের কথা। গুরুদেবের সহিত বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিবার পর হইতেই, সুরবালার কথা, হরনাথের মনে পড়িতে লাগিল। সুরবালার প্রতি তিনি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সকল স্বপ্নবৎ স্বীয় স্বভাবের এক কোণে কালিমা রেখার ন্যায় অঙ্কিত রহিয়াছে। যে বসন্তপুরে কত পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কত লীলা খেলিয়াছিলেন, পথিমধ্যে সে সকলই স্মরণপথে পড়িতে লাগিল। সুরবালার সরল চিত্র খানি আজ হৃদয়ে কত আনন্দ ঢালিয়া দিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলেন, আমি সরলা কামিনীর হৃদয়ে কত আঘাত করিয়াছি, এখন যদি একবার সাক্ষাৎ পাই, তবে তাহাকে আমার এই হৃদয় দেখাইয়া কত সন্তোষ লাভে অধিকারী হই! আর সুরবালাই বা আমাকে দেখিয়া কত পুলকিতা হইবে!

গুরুদেব এই অবসরে হরনাথকে বলিলেন, হরনাথ, তুমি তোমার ভার্য্যার প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলে, সে সকল মনে আছে কি? বাড়ীতে যাইয়া তোমার ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তুমি কি বলিবে?

হরনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে বলিলেন, কি বলিব? সুরবালার নিকট সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

গুরুদেব এই সরল উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, মনুষ্য জীবন অধ্যয়ন কর, তাহাতে যে আনন্দ পাইবে, শত সহস্র গ্রন্থরাশি তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইবে। তোমার সাধ্বী সুরবালা একটী রত্ন বিশেষ; চিরদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করে। তুমি এই রত্নকে চরণে মর্দ্দন করিয়া কি জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিলে। আমার কথা তখন তোমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইত। তোমার সেই জীবন আর এখনকার জীবন তুলনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হও।

হরনাথ। আমাকে আর বলিবেন না, আমি মৃতবৎ হইয়াছি; সুরবালার যত্ন ও ভালবাসা যখন মনে পড়ে, তখন নিমেষমধ্যে তাঁহার নিকটে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়। আপনি আর আমাকে কষ্ট দিবেন না; সুরবালার কথা মনে হইলে অত্যন্ত কষ্ট পাই।

এই প্রকারে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা বলিয়া দুই জনে সময় অতিবাহিত করিতেন। যথা সময়ে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিলেন; গুরুদেব কলিকাতা আসিয়া স্থানান্তরে যাইবেন, এই প্রকার কথা ছিল; দৈব ঘটনায় কোন এক পরিচিত লোকের সহিত এই সময়ে সাক্ষাৎ হইল। হরনাথ তাঁহাকে চিনিলেন,—তিনি তাঁহার বিষয়ের একজন গোমস্তা। গোমস্তার নিকট বাড়ীর সকল সংবাদ লইবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এখন কোথায় থাকেন?"

গোমস্তা। আমি সংপ্রতি গঙ্গা-যাত্রী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি, দেশের অনেক লোক আসিয়াছে। আপনি কোথা হইতে আসিলেন?

হরনাথ। আমার সকল কথা পরে বলিব, আপনাকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, অগ্রে তাহার উত্তর দিন্। আপনি এখন কি কার্য্য করেন?

গোমস্তা। হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ীর পাঠশালার গুরুর কার্য্য করি।

হরনাথ। আমাদের বাড়ীর সংবাদ জানেন ?

গোমস্তা। সকলই জানি, কি শুনিতে চান বলুন ?

হরনাথ। আমার বিষয়ের অবস্থা কি প্রকার ?

গোমস্তা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আপনি কি বিষয়ের কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন ? বিষয় নিলাম হইয়া গিয়াছে।

হরনাথ। কেন, নিলাম হইল কেন ?

গোমস্তা। গত জীবনের সকল কথা মনে করুন। আপনি যখন বাড়ী হইতে দেশান্তরিত হন, তখন আপনি বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন! আপনার মাতার মৃত্যুর মকর্দ্দমায় আরো তিন হাজার টাকা কর্জ্জ হয়েছিল। চাকর প্রভৃতির প্রায় দুই বৎসরের বেতন বাকী ছিল। আপনার দেশান্তরিত হইবার সময়ে সদর খাজনার কোন সংস্থান ছিল না; নায়েব প্রভৃতি সকলেই মকর্দ্দমায় বিব্রত ছিলেন, আপনার স্ত্রী টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায়ও কর্জ্জ পাইলেন না।

এই কথা বলা হইতে না হইতে হরনাথ বলিলেন, কেন অমরেন্দ্র বাবু কি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিলেন ? তাহাকে আমি বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলাম।

গোমস্তা। কর্জ্জ দিয়াছিলেন ? কোন প্রকার খৎ পাওয়া যায় নাই, তবুও আপনার স্ত্রী তাহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি টাকার কথা একেবারেই অস্বীকার করিলেন; আপনার স্ত্রী তাহার নিকট কর্জ্জ স্বরূপ কিছু টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কর্ণপাতও করিলেন না।

হরনাথ। অমরেন্দ্র নর-পিশাচ! তাহার জন্য আমি কি না করেছি ? তা যাক, বিজয়কৃষ্ণ বাবুও কি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন ?

গোমস্তা। সে সকল কথা আর বলিবেন না, আপনার আত্মীয় বান্ধব সকলের পরিচয় পাইয়াছি; বিজয়কৃষ্ণ বাবু এক দিন মদ খাইয়া আপনার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে গিয়াছিল!

হরনাথের শরীর ক্রমেই উষ্ণ হইতে লাগিল, হস্ত পদাদি কম্পিত হইতে লাগিল; বলিলেন, শশীকেশর ?

গোমস্তা। শশীকেশর চক্রান্ত করে আপনার বিষয় ক্রয় করিয়াছে,

তাহার কথা আর আমার নিকট বলিবেন না; তাহার ন্যায় ধর্ম্মচেষ্টাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেও নাই। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া আর আপনি কি করিবেন? আপনার নায়েব বন্দোবস্ত করিয়া খাজনার যোগাড় করিয়াছিল; কিন্তু শশীকেশর বাবু রজনীযোগে তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন!

হরনাথ বাবু এ সকলও কম্পিত কলেবরে, উষ্ণ রক্তে সহ্য করিলেন, বলিলেন, যা'ক আর কাহারও কথা বলিব না; সংসারের সকল আত্মীয় বান্ধবকেই চিনিয়াছি; বিষয় গিয়াছে যাক, বিষয় দিয়া কি করিব? বল, আমার সুরবালা কোথায় আছে?

গোমস্তার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন,—তাহার কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যখন বিষয় আশয় সকলি নিলাম হয়ে গেল, তখন তিনি গ্রামের প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া বলিলেন,—'আমাকে একটু স্থান দেও, আমার প্রতি সকলেই অত্যাচার করে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না, আমার উপায় নাই।' এই সকল কথা শুনিয়াও গ্রামের কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিল না, সকলে বলিল,—পোড়া পাপের প্রলোভনকে কে গৃহে স্থান দিবে? এই সকল কথা শুনিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, জানি না; গ্রামের লোকেরা প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার স্বভাবের কালিমা রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করে, সকলে বলে তাঁহাকে কোন সাহেব খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়াছে।

হরনাথ। সুরবালা বাড়ীতে নাই? কি বলিলেন, সুরবালাকে আপনারা আশ্রয় দিতে পারিলেন না?

গোমস্তা। তিনি যখন পলায়ন করেন, তখন আমি হাটে গিয়াছিলাম।

হরনাথ আর কথা বলিলেন না; তাঁহার হৃদয় কি প্রকার অস্থির হইল, তাহা তিনিই জানিলেন। সমস্ত দিবস তাঁহার কি প্রকার যাতনায় অতিবাহিত হইল, তাহা আর কেহই জানিল না। সমস্ত রাত্রি চক্ষের ধারা পতিত হইয়া অজানিত রূপে বক্ষে শুকাইয়া গেল; সে অশ্রু পতন কত বিষাদের ফল, তাহা পৃথিবীতে আর কেহই জানিল না। পরদিন প্রত্যূষে গুরুদেবের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন; গুরুদেব কেবল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—মানবের সকলই সহ্য করা উচিত, কারণ মানব একহস্তে দণ্ড, অপর হস্তে তরবারি লইয়া কাহাকেও শাসন করিতে পারে না; ঈশ্বরের

পক্ষে এ সকলি সম্ভব। তিনি পাপের দণ্ড বিধান করেন, তাঁহার বিচারে কেহই নিস্তার পায় না, কিন্তু অপর দিকে তিনি পাপীকেও প্রেমেতে আবদ্ধ করিয়া অলৌকিক মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেন, এ সকল গুণ তাঁহাতেই কেবল শোভা পায়। আমরা সংসারের কীট, দণ্ড বিধান করিবার সময় ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ভালবাসা ভুলিয়া যাই; সুতরাং আমাদিগের উহা পরিত্যাগ করিয়া সকলই সহ্য করা উচিত। সহ্য কর,—কিন্তু তোমার সুরবালাকে ভুলিও না; সুরবালার জীবন তোমাপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নত।

হরনাথ বলিলেন,—আমি অতি কষ্টে সকলই সহ্য করিয়াছি,—চক্ষের জলও অতি কষ্টে মুছিয়া ফেলিয়াছি। আমি আজ আপনার নিকট বিদায় লইব; এ কলঙ্কমুখ আর এ অবস্থায় দেখাইতে ইচ্ছা করে না। আপনার সহিত সেই পর্ব্বতে সাক্ষাৎ করিব।

গুরুদেব। যাও তবে বাছা, নির্ভয়ে সংসারকে আলিঙ্গন করিও, প্রলোভনকে হৃদয় পাতিয়া বসাইও, এই প্রকার করিয়া যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে পার, তবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

হরনাথের হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল, বলিলেন,—নচেৎ? যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারি, তবে কি আর আপনার দর্শন পাইব না? আমি আপনার উপদেশ ভিন্ন কি থাকিতে পারিব?

গুরুদেব। যদি কখনও সংসারতরঙ্গ কিম্বা বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হও, তবে নিঃসন্দেহ চিত্তে আমার নিকটে আসিও,আমি সাধ্যানুসারে উপযুক্ত উপদেশ দিব।

হরনাথ। আপনি এক বৎসর পরেই পর্ব্বতে উঠিবেন?

গুরুদেব। এক বৎসরের পরে উঠিব, কিন্তু ঠিক করিয়া কিছু বলিতে পারি না; তবে এক বৎসরের মধ্যে পর্ব্বতে যাইব না, তাহা ঠিক।

এই কথা বলিয়া, হরনাথ গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া ইচ্ছানুসারে এক দিকে চলিলেন।

গুরুদেব হরনাথের যাত্রা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, সুরবালার অদর্শন, হরনাথের মনকে সংসারের আকর্ষণ হইতে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; বুঝিলেন, এতদিন পরে হরনাথ বাস্তবিক জীবনকে ধর্ম্মের স্রোতে ভাসাইল। এই সকল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার মন কি প্রকার উৎকণ্ঠিত হইল, তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে অক্ষম। তিনি পরদিন আপনাকে আবার প্রলোভনের স্রোতে ভাসাইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্রোতাভিমুখে।

পাঠক, প্রথম খণ্ডে, প্রথম পরিচ্ছেদে যে ছবি দেখিয়াছ, তাহা মনে আছে ত? অতি কষ্টে, মনের দুঃখে সুরবালা আপন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, কেহ তাঁহার মনের দুঃখ বুঝিল না, কেহ তাঁহার মনের দুঃখ বুঝিয়া একটু আশ্রয় দিল না। দ্বিপ্রহর রজনীযোগে তিনি অতি কষ্টে অঙ্গের আভরণ সকল এক এক করিয়া খুলিয়া রাখিলেন। মস্তকের কেশ গুচ্ছ, যাহা সুদীর্ঘ বেণীতে নিবদ্ধ থাকিত, মুক্ত করিলেন; নিমেষ মধ্যে আজানু-লম্বিত কেশরাশি তাঁহার শরীরের পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া ফেলিল। কপালের সিন্দূরবিন্দু বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন; পূর্ব্বে একখানি পট্টবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ ধীরে ধীরে পরিধেয় ধূতি পরিত্যাগ করিয়া, সেই পট্ট-বস্ত্র পরিলেন। এই সকল কার্য্য করিবার সময়ে, সুরবালার বাল্য সহচরী কুন্দবালা যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুরবালা বসন্তপুরের সকল আত্মীয় বান্ধবের মনই বুঝিয়াছিলেন; জানিতেন, আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই; তিনি ত চলিলেন, কিন্তু কুন্দবালা শূন্যপুরীতে থাকিয়া কি করিবে?

কুন্দবালা কোন দরিদ্র কায়স্থের বিধবা কন্যা, সুরবালার পিতা মাতার আশ্রয়ে প্রতিপালিতা। সুরবালা আর কুন্দবালা শৈশব সময়ে সহোদরা ভগ্নীর মত এক সঙ্গে খেলা করিত; সেই সময় হইতেই দুইজনের প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে। কাল সহকারে যখন সুরবালার বিবাহ হইল, তখন কুন্দবালার মুখ মলিন হইল, কুন্দবালা মাতার নিকট মনের দুঃখের কথা জানাইল। সে সুরবালার মাকেই মা বলিয়া ডাকিত। মাতা বলিলেন, "সুরকে ত আর

জলে ফেলে দেই নাই,—তোর ইচ্ছা হয় সুরোর সহিত যা, সেখানে সুর তোকে যত্ন করবে।" কুন্দবালা আহ্লাদে ভাসিয়া সুরবালার সহিত সুরবালার স্বামীর গৃহে চলিল। সেই সময় হইতে কুন্দবালা সুরবালার সহিতই থাকিত। যখন সুরবালা পিতৃগৃহে যাইতেন, তখন কুন্দবালাও দেশে যাইত, আবার সুরবালার সহিত ফিরিয়া আসিত। কুন্দবালার এ সংসারে আর কেহই নাই; আত্মীয়, বান্ধব, সুহৃৎ ও ভগ্নী, সকলই সুরবালা। সুরবালার অকৃত্রিম প্রাণ কুন্দ। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সুরবালা ও কুন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। কোথায় চলিলেন? সুরবালা জানেন, এজন্মে আর ফিরিবেন না, কুন্দ বিশেষ কিছুই জানে না, মনে করিতেছে, সুরবালার পা বেদনা হইলেই ফিরিয়া আসিবে। অনেক দূরে চলিয়া গেলেন, অনেক গ্রাম, অনেক ময়দান অতিক্রম করিলেন। সুরবালার হাতে লোহার ত্রিশূল। অনেক দূরে যাইয়া একটী পুকুরের ধারে সুরবালা দাঁড়াইলেন, তারপর কুন্দকে বলিলেন, দেখ্‌ত এ কেমন স্থান, তোর এ পুকুরের কথা মনে পড়ে?

কুন্দ। চিনেছি, সেই একবার বাড়ী হ'তে বসন্তপুর আস্‌বার সময় আমাদের পাল্কী এই স্থানে দাঁড়ায়েছিল, তুমি আমি এই পুকুরে স্নান করেছিলাম।

সুরবালা। আর কিছু মনে পড়ে?

কুন্দ। আরো মনে পড়ে, এ পথ দিয়া আর একদিন যাইবার সময় এখানে একটী মেয়ে কাঁদিতেছিল, তুমি তার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলে। তুমি তাহাকে স্বামি-গৃহের কত সুখের কথা বলেছিলে।

সুরবালা। আজ তাহাকে পাইলে বলিতাম, এস বোন, তোমার সঙ্গে কাঁদি, বাল্য খেলা ছাড়িয়া কেন স্বামি-গৃহে যাইতেছ? পৃথিবীতে বাল্য খেলার ন্যায় সুখকর বস্তু আর নাই। কুন্দ, আর কিছু মনে পড়ে?

কুন্দবালা। আরো মনে পড়ে,—একদিন একটী স্বামী-পরিত্যক্তা যুবতী এখানে বসে কাঁদ্‌তেছিল, আর স্বামীকে কত প্রকার তিরস্কার ও গালাগালি দিচ্ছিল, তুমি তাহাকে কত বুঝায়েছিলে যে, আমাদের দোষেই আমরা স্বামীর মন বিরক্ত করিয়া দি, নচেৎ স্বামীর ন্যায় পদার্থ এ সংসারে আর নাই। সে সকলই মনে আছে।

সুরবালা। আজ তাহাকে দেখিলে বলিতাম,—ভগ্নি, তোমার সহিত আইস আজ একটু কাঁদি।

কুন্দবালা। তুমি কোথায় চলিয়াছ? বল না, বাড়ীতে যাবে নাকি?

সুরবালা। বাড়ী গেলে আর এবেশ পরিতাম না।

কুন্দবালা। তবে ও প্রকার কথা বলিতেছ কেম?

সুরবালা। কেন? তাহা জানি না, আমার হৃদয় মন্ন অস্থির হয়েছে, চল, আমরা এই পাষাণের উপরে বসি গিয়া।

কুন্দবালা বড় একটা হাঁটিতে পারিত না, এতদূর ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহারই অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইয়াছিল, সুরবালা যখন বলিলেন, চল বসি গিয়া, তখন কুন্দ দ্রুত যাইয়া পাষাণের উপরে বসিল। সুরবালা ধীরে ধীরে পাষাণের এক ধারে বসিলেন, বসিয়া মস্তক বাম হাতে নির্ভর করিলেন। ক্ষণকাল পরে অন্যমনস্কভাবে সুরবালা গান ধরিলেন,———

আকাশে চাঁদ হাসে, মোর হৃদ্ কাঁদে,
এ কেমন যাতনা সই।
মনে করি ভুলে যাই, ভুলিতে পারিনে তাই;
এ কেমন যাতনা সই।
বহিলে মলয়, জ্বলে এ হৃদয়,
এ কেমন যাতনা সই।
কেমনে বাঁচিব, যাতনা ভুলিব;
ভুলিতে ত পারিনে সই!

সুরবালা আর গাইলেন না, মনে কি ভাবিয়া বলিলেন, চল কুন্দ,—তোকে আমাদিগের বাড়ীর দিকে রেখে যাই।

সুরবালার গান শুনিয়া কুন্দবালার নয়ন হইতে জল পড়িতেছিল, সহসা সখীর ভাবান্তর দেখিয়া বলিল, সখি, আমাকে রেখে তুমি কোথায় যাবে?

সুরবালা। আমি অনেক দূরে যাব, উত্তরের পর্ব্বতের কথা শুনেছিস্, তা হতেও দূরে; তুই বাড়ীতে যা, আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বি না।

কুন্দ। কেন সখি? তুমিও বাড়ীতে চলনা কেন? বাড়ীতে গেলে মা কত সুখী হবেন!

সুরবালা। তুই কি পাগল হয়েছিস্? আমি যদি বাড়ীতেই যাব, তবে আর এবেশে এলেম কেন?

কুন্দবালা। আচ্ছা, এ বেশ ছাড়না কেন?

সুরবালা। সংসারের কোন্ বস্তুর কামনায় ইহা পরিত্যাগ করিব? সংসারকে কি চিনিতে আজও পারি নাই?

কুন্দবালা। কি ছাই চিনিয়াছ? কেবল কষ্টের বোঝা মাথায় বহন করেছ বইত না, সুখের ধার তুমি কি ধার? সংসারের কোন্ পদার্থ তুমি দেখেছ?

সুরবালা। যা দেখেছি, তারই কথা বল্‌তেছি, যা দেখি নাই, তার কথা কি বল্‌ব?

কুন্দবালা। যা দেখেছ, তার মধ্যেও কি এমন কোন বস্তু নাই, যার নাম তুমিও এ বেশ ছাড়্‌তে পার?

সুরবালা। কই, মনেত পড়ে না।

কুন্দবালা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর সুরবালার হাত ধরিয়া বলিল, চল সখি, মায়ের নিকট সকল কথা বল্লে পর তিনি জামাই বাবুর জন্য লোক পাঠাইবেন।

সুরবালা। তুই যা, তুই মার কাছে বলে, তোর জামাই বাবুকে নিয়ে থাকিস্; আমি তোর জামাই বাবুকে চাই না। আমি যাহা অন্বেষণ করিতে ঘরের বাহির হয়েছি, তোর শত শত জামাই বাবুও আমাকে তাহা দিতে পারে না। তুই বাড়ীতে যা।

কুন্দবালা। তাই যদি হয়, তবে তোমার মনে এত কষ্ট কেন?

সুরবালা। তা তুই কি করে বুঝিবি? সংসারের গরল ত কখনও ইচ্ছাকরে মুখে ভূলে দিস্ নাই, তুই কি বুঝিবি, সে গরলের জ্বালার হাত এড়ান কত কষ্ট! আমি কি গৃহ ছাড়িয়াছি বলিয়া কষ্ট পাইতেছি?

কুন্দবালা। তবে কি?

সুরবালা। আমি জীবনের সকল চিত্র মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এতদিন পর্য্যন্ত আদর করে যেখানে যে চিত্রটীকে রাখিয়াছিলাম, এতদিন মনকে যাহা ভাল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, আজ তাহা সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতেছি, আজ মনকে অন্যপথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছি; এতদিন যাহাতে হৃদয় তৃপ্তি পাইত, এতদিন যাহাদিগকে ভালবাসিতাম, সে সকলকে মুছিয়া ফেলিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুই ত কখনও সংসারের গরল দ্বারা হৃদয়কে রোগগ্রস্ত করিস্ নাই; তুই রোগ হইতে মুক্ত হইবার সময়ের যাতনা কি প্রকারে বুঝিবি?

কুন্দবালা। যাহা এতদিন ভালবাসিয়া হৃদয়ে পুষিয়াছ, তাহা সহসা আজ ছাড়িয়া দিতেছ কেন?

সুরবালা। এতদিন পরে সার, অসার বুঝিয়াছি, এতদিন যাহা ভাল লাগিত, তাহা অসার বস্তু; অমৃত বলিয়া বিষকে এতদিন হৃদয়ে পুষিয়াছি, এখন সকলই বুঝিতে পারিয়াছি; তাই অসার বস্তু এখন হৃদয় হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সুরবালা তারপর অনেক ভয় দেখাইয়া কুন্দবালাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তার পর আপন মনে আপন পথে স্বাধীনভাবে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ চিত্র আরো বেশ।

সুরবালা সংসারের সঙ্কীর্ণ প্রেম-শৃঙ্খল গুটাইয়া লইলেন, অন্যদিকে, তাঁহার সুন্দর পাখী বিচ্ছেদে দগ্ধ হইতে লাগিল। হরনাথ গুরুদেবের নিকট শান্ত মনে বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে যে দুর্দ্দমনীয় হিংসা রিপু বাস করে, সে মনুষ্যকে অল্পে ছাড়িয়া দেয় না; হরনাথ এক দিন যাহা-দিগকে আত্মীয় বলিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং সুরবালার প্রতি অত্যাচার তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রতিহিংসা ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য সত্য, কিন্তু তিনি বিবেক দ্বারা চালিত হইয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তিকে একেবারে হৃদয় হইতে নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না, তিনি গোপনে এই রিপুকে পোষণ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন।

বাড়ীতে যাইয়া বুঝিলেন, তাঁহার পূর্ব্বের বন্ধু, অমরেন্দ্র প্রভৃতি বাস্তবিকই তাঁহার শত্রু হইয়াছেন। তিনি বাড়ীতে কাহারও নিকট আদর পাইলেন না; এক দিন কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন, তাহার বন্ধুগণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে। পূর্ব্বে অন্যের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে সকলই নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। কি করিবেন, সংসারী লোকদিগের সহিত তাঁহার আর কোন প্রকার অভদ্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইল না; বিশেষতঃ চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, বৈষয়িক বুদ্ধির চাতুরী জাল ছিন্ন করা সহজ ব্যাপার নহে। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। সংসারের প্রতি

প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিতৃষ্ণা জন্মিল; তিনি সকল প্রকার প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বত শেখরে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না; তিনি নিরাশ মনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাড়ী পরিত্যাগের পর হইতে তিনি 'সন্ন্যাসী' বলিয়া পরিচয় দিতেন; মন্ত্র গ্রহণের সময়ে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে হরিনারায়ণ নাম দিয়াছিলেন, তিনি 'হরিনারায়ণ' নামে পরিচয় দিতেন। সন্ন্যাসীর জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পূর্ব্বেই প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংক্ষেপে পুস্তকের শেষ ভাগে বিবৃত হইবে।

গুরুদেবের নাম গুণরাম স্বামী, নিবাস পশ্চিমাঞ্চলে। হরনাথের পিতা একবার কাশীতে যাইয়া অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে গুণরাম স্বামী তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। বাড়ী প্রত্যাগমন কালীন তিনি স্বামী জীউকে সঙ্গে করিয়া বসন্তপুরে লইয়া যান; ইহাঁকে তিনি গুরুদেব বলিয়া ডাকিতেন, এবং বাস্তবিকই গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হরনাথের পিতা মৃত্যু সময়ে গুরুদেবের হাতে হরনাথকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। হরনাথ স্বামীর অত্যন্ত ভালবাসার বস্তু। হরনাথের নিকট শেষ বিদায় হইয়া স্বামী অনেক স্থান পরিভ্রমণ করেন। জীবনের উৎকর্ষ সাধনার্থ তিনি প্রত্যেক পল্লী, প্রত্যেক বাড়ীতে কিছু সময় অবস্থিতি করিতেন। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গপ্রদেশ তিনি অনেক পূর্ব্বে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এই সংক্ষিপ্ত সময় তিনি উত্তর বাঙ্গালা পরিভ্রমণ করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই সকলে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিত; তাঁহার হৃদয় প্রেমে গঠিত, ভালবাসার মোহিনী শক্তিতে তিনি সকলের মনকেই আকর্ষণ করিতেন। এই প্রকার ভ্রমণে তাঁহার এক বৎসর অতীত হইল; প্রলোভনে তিনি জয়ী হইলেন, তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, ঠিক করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, তিনি সে স্থানটীও দেখিয়া যাইতে অভিলাষী হইলেন; সে গ্রামে অবস্থিতি করিয়া, তিনি অন্যান্য স্থানের ন্যায় অনেক উপকার লাভ করিলেন; আরও একটী বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকটেই একটী স্ত্রীলোকের প্রশংসার কথা শুনিলেন। সকলে বলিল,—এই গ্রামে তিন বৎসর যাবত একটি সন্ন্যাসিনী আসিয়াছে। সন্ন্যাসিনী রজনীযোগে একটী বিস্তীর্ণ বট বৃক্ষের মূলে বসিয়া যোগ ধ্যান করে, এবং দিবসে গ্রামের আপামর সাধারণ লোকের উপকার করিয়া বেড়ান। তিনি আরও শুনিয়া বিস্মিত হইলেন,—সন্ন্যাসিনীর টাকা কড়ি কিছুই নাই, অথচ গ্রামের সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী; সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে। রোগীর শুশ্রূষা, বৃদ্ধের পদসেবা, শোক-দগ্ধ আত্মাকে সান্ত্বনা প্রদান, সতীকে পতিভক্তি শিক্ষা; পতিকে স্ত্রীলোকের কোমল প্রকৃতির ভাব বলিয়া পত্নীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করা বিধেয়, এই প্রকার উপদেশ; পথশ্রান্ত পথিককে শীতল জল প্রদান, বালিকাদিগকে নীতি শিক্ষা, বালকগণের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যে তাঁহার দিবস অতিবাহিত হইত। কি কৃষক, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি জ্ঞানী, কি মুসলমান, কি চণ্ডাল, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকলের বাড়ীতে সমান যত্ন সহকারে, আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেন; শুনিলেন, সন্ন্যাসিনী এ গ্রামের মাতৃহীনের মাতা; পিতৃহীনের পিতা, ভগ্নীহীনের ভগ্নী, পত্নী-হীনের ভার্য্যা, স্বামী হীনার স্বামী, মূর্খের শিক্ষক, রোগীর বৈদ্য, বন্ধুহীনের বন্ধু, বালক বালিকার উপদেষ্টা। গ্রামের সকলেই সন্ন্যাসিনীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে; কেহ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কখনও কোন কার্য্য করে না। সন্ন্যাসিনী গ্রামের সকলের বাড়ীতেই দিনের মধ্যে একবার করিয়া বেড়াইতেন; কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। সন্ন্যাসিনীর এই সকল উৎকৃষ্ট গুণের কথা শ্রবণ করিয়া গুণরামস্বামী তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসিনীর বিশেষ কোন কথা কেহই বলিতে পারিল না। সকলেই বলিল,—"তিনি আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"ভাই, আমাকে ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে না; কেন আমাকে তোমাদিগের চরণে অপরাধিনী করিবে? আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।"

সন্ন্যাসিনীর সম্বন্ধে কোন বিষয় জ্ঞাত না হইয়া তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু সাক্ষাৎ করিবেন কোথায়? তিনি যখন এক বাড়ীতে গমন করেন,

সন্ন্যাসিনী হয় ত তখন অন্য স্থানে কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, রজনীযোগে যেখানে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন, সেখানে প্রাণান্তেও গ্রামবাসীরা কাহাকে যাইতে দিত না, কারণ, সন্ন্যাসিনী বলিয়াছিলেন,—"যে দিন আমার ধ্যানের সময় আমার নিকট মনুষ্য আগমন করিবে, সেই দিন আমি এ গ্রাম পরিত্যাগ করিব।" গুণরামস্বামী বুঝিলেন, কোন প্রকার প্রলোভন দ্বারাও লোকদিগকে বশ করা সহজ নয়, কেহই সে স্থানের কথা বলে না; আরো জানিতে পারিলেন, রজনীযোগে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রহরী স্বরূপ পথের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকে, প্রাণান্তেও কাহাকে রাত্রে সে স্থানে যাইতে দেয় না। অবশেষে এক প্রকার নিরাশ হইয়া অনেকের নিকট বলিলেন যে,—"তোমাদের সহিত সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিও যে, আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিবার আশায় অনেক দিন এখানে রহিয়াছি, তিনি অবসরক্রমে একবার দর্শন দিলে কৃতার্থ হইব।"

গুণরামস্বামীর এ কথার উত্তর দুই দিনের মধ্যেই সন্ন্যাসিনীর নিকট হইতে আসিল, সন্ন্যাসিনী বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ পাই না, আপনাকে দেখিবার জন্য আমিও তৃষিতা; কিন্তু আমার কার্য্য রাখিয়া যাইতে পারি না, দিনের মধ্যে এমন সময় পাই না, যে সময়ে কোন ব্যক্তির নিকট আমার কোন কর্ত্তব্য কার্য্য না থাকে; আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি অসহায়, কি করিব?"

গুণরামস্বামী এই কথা কয়েকটী শুনিয়া আরো চমকিত হইলেন, ভাবিলেন, বাস্তবিকই যাঁহার জীবন অন্যের সেবার জন্য, তাঁহার অবকাশ পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ না পাইলেও তিনি সুস্থ হইতে পারেন না; কি উপায়ে সাক্ষাৎ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সন্ন্যাসিনীর সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন,—তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়া, তাঁহার স্বর অতি মিষ্ট। দূরস্থান হইতে দুই এক দিন তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতেও পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিনী একবেলা আহার করেন, আহারের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সকলের বাড়ীতেই আহার করেন। মৎস্য কিম্বা মাংস আহার করেন না। তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, পতিহীনা অবলাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া, কারণ শুনিতে পাইলেন, বিধবা কিম্বা স্বামী-পরিত্যক্তা রমণীগণের নিকটেই তিনি অধিকক্ষণ থাকেন।

এ সকল পরিচয় পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানের ইচ্ছা আরো প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিবার বাসনা কিছুদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া সেই গ্রামে রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনীই উদাসিনী।

পার্থিব জগতে প্রাপ্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্প লোকেই অন্যকে কোন পদার্থ দান করিতে পারে। সংসারের এমনি দৃঢ় বন্ধনী যে, যেখানে প্রাপ্তির আশা মাত্রও নাই, সেখানে দানের দ্বার সততই রুদ্ধ থাকে। এই প্রকার প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সংসারের মানব অন্যকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। বন্ধু ভালবাসে বন্ধুকে, ভালবাসা পাইবার জন্য; স্ত্রী ভালবাসে স্বামীকে, স্বীয় মনোরথ চরিতার্থ করিবার জন্য; ধনী সাহায্য করেন নির্ধনকে, পদসেবার সহচর করিয়া রাখিবার জন্য; ধার্ম্মিক পাপীদিগকে ধর্ম্মের কথা বলেন, শিষ্য পাইবার জন্য; সম্পদারূঢ় লোক সাহায্য করে বিপদাপন্নদিগকে, গোলাম করিয়া রাখিবার জন্য; আত্মীয় আত্মীয়কে পরিতুষ্ট করেন ভাল দ্রব্য দ্বারা, কেবল ভাল দ্রব্য পাইবার আশায়। এই প্রকারে সংসারের প্রত্যেক বিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, সংসারে প্রাপ্তির আশা,—সাধারণ স্বার্থের আশা পরিত্যাগ করিয়া, কেহই অন্যকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। এই কারণেই সময়ে সময়ে, রিপুর আয়ত্তাধীন মানবকে কখন কখন ক্রন্দন করিতে দেখা যায়। বন্ধুর হৃদয় বন্ধুর ভালবাসা না পাইলে অস্থির হয়, স্ত্রীর মন স্বামীর অদর্শনে চঞ্চল হয়, বিচ্ছেদে ক্রন্দন করে; ধনী ক্রোধান্ধ হইয়া সাহায্যগ্রহণকারীর সাহায্য না পাইয়া অস্থির হয় এবং অযথা তাহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া কত গালিবর্ষণ করে; ধার্ম্মিক শিষ্যের হৃদয়কে স্বাধীন পথাবলম্বী দেখিলে, ইতর মানবের ন্যায় গালিবর্ষণ করিতে থাকেন। এই প্রকার সংসারের প্রত্যেক বিভাগের মানবকেই রূপান্তর ধারণ করিয়া আপন ইষ্ট সাধনে রত দেখা যায়। সকলেই কোন না কোন স্বার্থ সাধনের বাসনায় পরের উপকারে রত। এ সকল

সাংসারিক মানবের স্বভাব, ভাল কি মন্দ, সে কথার বিচার আমরা করিব না। যদি এ প্রকার স্বার্থের আশায় মানব আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশে প্রবৃত্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার জীবন সহস্র গুণে উন্নত হইত কি না, নিরাশা তাহাকে আক্রমণ করিয়া কখনও মলিন করিতে পারিত কি না, সে সকল বিষয়ের আলোচনার কোন আবশ্যক দেখি না। আমরা যাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার বিষয়ই আলোচনা করিব। সন্ন্যাসিনী সমস্ত দিবস পরের সেবায় অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্বার্থ কি, তাঁহার প্রাপ্তির আশা কি, কেহই বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসিনী সংসারের লোক হইয়াও, কেন আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করেন, তাহা গ্রামের অনেকেই বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসিনীর নাম যখন দিকদিগন্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন চতুর্দ্দিক হইতে আহারের জন্য কত উপহার আসিত, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না, অম্লান বদনে সকলই পরিত্যাগ করিতেন। ভালবাসিত জনকে তাহার ভালবাসার বস্তু যোগাইতে এ সংসারে সকলেই ব্যস্ত। সন্ন্যাসিনী যখন অল্পে অল্পে সকলের অকৃত্রিম ভালবাসার অধিকারিণী হইলেন, অজ্ঞাতসারে যখন সকলের মন কাড়িয়া লইলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে উপযুক্ত ভালবাসার বস্তু উপহার পাঠাইত। কিন্তু তিনি কি করিতেন? তিনি হাস্যমুখে বলিতেন, 'ভাই! আমি এ সকল উপহার লইয়া কি করিব, এ সকল বস্তুতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, যাহাদের অভাব আছে, তাহাদিগকে এ সকল দান করিলে তাহারা কত উপকৃত হইবে!' এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া দুই একজন যদি বলিত, 'আপনি আমাদিগের কত উপকার করেন, আর আমরা কি আপনার জন্য কিছুই করিব না?' এ কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিতেন,—"ভাই! আমি কোন দ্রব্যের অভাব লইয়া তোমাদিগের নিকটে আগমন করি নাই, ঈশ্বরপ্রসাদে আমার কোন পদার্থের অভাব নাই। দেখ ভাই, তোমাদিগের অভাব আছে, তাই আমি তোমাদের অভাব দূর করিতে যত্ন করি। যখন তোমাদের অভাব থাকিবে না, তখন আর আমি তোমাদিগের জন্য কিছুই করিব না। আমি তোমাদিগের নিকটে কোন পদার্থ প্রাপ্তির আশায় তোমাদিগের উপকার করিতে আসি নাই। আমার কর্ত্তব্য পালনের সময়ে, ভাই, তোমরা কেন বাধা দাও?" এই কথার উত্তরে দুই একজন বলিত,—"আপনি ত আমাদের নিকটে কিছুই প্রত্যাশা করেন না, আপনার ত কিছুরই

অভাব নাই, কিন্তু আমরা আপনাকে কিছু না দিতে পারিলে, আমাদিগে মন সুস্থ হয় না; কেন আমাদিগকে ঋণগ্রস্ত করিয়া রাখেন?”

এ কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিতেন,—‘ভাই! এ সংসারে কেহই কোন বিষয়ে কাহারও নিকট ঋণী নহে; যাহার দিবার বস্তু আছে, সেই দেয়, আর যাহার অভাব আছে, সেই গ্রহণ করে; ইহাই বিশ্বরচয়িতার চিরপ্রচলিত নিয়ম; মনুষ্য কখনও মনুষ্যের নিকট ঋণী নহে। ঈশ্বর কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাহাকে দাতা করেন এবং কাহাকে গৃহীতা করেন, তাহা মানব কি প্রকারে বুঝিবে? ভাই! আমি তোমাদিগকে ঋণী করিতে আসি নাই, আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেই আসিয়াছি।’ এ কথার উত্তরে যদি কেহ বলিত, ‘আমাদের বস্তু আছে, তাই আপনাকে দিতে চাই, আপনি গ্রহণ করিবেন না কেন?’ তবে তিনি বলিতেন, ‘আমার ত অভাব নাই, ভাই, কেন গ্রহণ করিব?’

সন্ন্যাসিনীর এই অলৌকিক ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। পূর্ব্বে গ্রামবাসীরা আরো অনেক সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে দানগ্রহণ করিত, কিন্তু এ সন্ন্যাসিনী কেবল আহারের যৎকিঞ্চিৎ বস্তু ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না, অথচ অনবরত, অবিশ্রাম সাধারণের কল্যাণের জন্য যত্নশীলা। এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে অনেকেই অক্ষম হইল; গ্রামবাসীরা নবাগত স্বামীর নিকটে এ সকল ব্যক্ত করিল। স্বামী মনে মনে বুঝিলেন, সন্ন্যাসিনী প্রকৃত ধর্ম্মের মহত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষমা হইয়াছেন।

যে সময়ের কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সেই সময়ের পরে গুরুদেব পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে সন্ন্যাসিনীর সহিত কেবল এক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবনের যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, তাহা পুস্তকের শেষ বিভাগে বিবৃত হইবে। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার ছয় মাস পরে, তাঁহার সহিত হরিনারায়ণের সাক্ষাৎ হয়। হরিনারায়ণ এই ছয় মাসের মধ্যে আর গুরুদেবের আশ্রমে গমন করিবার অবকাশ পান নাই। প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের পর, যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমরা এক্ষণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মরীচির দুইখানি পত্র।

সন্ন্যাসীর চিত্ত সুস্থির হইলে, গুণরাম স্বামী বলিলেন, "বৎস হরি-নারায়ণ, মরীচির হৃদয় পবিত্র প্রেমে গঠিত, সংসারে সচরাচর যে প্রেমের চিত্র আমরা দেখিয়া জ্বালাতন হইয়াছি, মরীচি সে প্রেমের অধি-কারিণী নহেন; তিনি তোমার পত্র পাইয়া আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পরিচয়ে যারপর নাই সুখী হইয়াছি; তুমি তাঁহাকে যেরূপ ভাবিয়াছিলে, বাস্তবিক তিনি সেরূপ নহেন, তোমার রিপুদিগকে তুমি আজও দমন করিতে পার নাই, তোমার পরীক্ষার উপযোগী তুমি অদ্যা-বধিও হও নাই। চিত্তসংযমব্রত সাধন-সাপেক্ষ, চিরকাল কেহই প্রলো-ভনে জয়ী হইতে পারে না, তজ্জন্যই আমরা কিছুকাল প্রলোভনে থাকিয়া, চিত্তকে সংযম ও রিপুদিগকে নিস্তেজ করিতে অভ্যাস করি। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েও যিনি আত্মজয়ী হইতে না পারেন, তিনি কখনই ধর্ম্ম সাধনার উপযুক্ত নহেন। অনেক কঠোর সাধনা ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। এই সকল কারণেই আমরা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সংসারের প্রলোভনে পরীক্ষা দিয়া জয়ী হইয়া, তার পর প্রলোভনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করি। সংসারকে একেবারে পরিত্যাগ করিবার কারণ এই; সংসারের প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া চিরকাল এক ভাবে থাকা যায় না; মানবেব মন চঞ্চল, বিবেক চঞ্চল, বুদ্ধি চঞ্চল, সকলই চঞ্চল। তুমি একটী নির্দ্দিষ্ট সময়েও প্রলোভনে জয়ী হইতে পারিলে না; বৎস! তুমি যে কি করিবে, আমি বুঝিতে পারি না। মরীচি আমাকে যে সকল সারগর্ভ সন্নীতির কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি, তোমার শিক্ষার প্রভাবে মরুভূমিতে সুগন্ধযুক্ত ফুল ফুটিয়াছে; বুঝিয়াছি, তোমার শিক্ষার প্রভাবে অরণ্যে মরীচি রত্ন হইয়াছেন। মরীচি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না; তিনি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিলে আমার মন যেন স্বর্গে অবস্থিতি করিতে থাকে; তিনি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিলে আমার হৃদয় সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্য তৃষিত থাকে;

কিন্তু তিনি কি ভাবিয়া যেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? বাস্তবিক মরীচির উন্নতির মূলেই তুমি, তোমার নিকটে শিক্ষা না পাইলে কখনও মরীচি মরুভূমিতে কুসুমসদৃশ শোভা পাইত না; কিন্তু এমনি ধর্ম্মের রোগ, তুমি পরম শুদ্ধাচারী, পবিত্র প্রেমের আস্পদকেও সংসারের প্রলোভন জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, প্রলোভনেই তোমার পরীক্ষা হইবে; তুমি মরীচিকে প্রলোভন বলিয়া বুঝিলে যদি, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে কেন? আত্মজয়ী হইতে পারিলে না কেন? তোমাকে উপদেশ দিতে আমি ত্রুটি করি নাই। কিন্তু বুঝিলাম, সকলই বৃথা হইল! তোমাকে আর বলিলে কি হইবে? তুমি জীবনের উদ্দেশ্য আজও বুঝিতে পার নাই। তুমি মন্ত্র গ্রহণেই অনধিকারী হইয়াছ; বৎস, তোমাকে আর কিছুই বলিতে আমার অভিলাষ নাই।"

গুণরাম স্বামীর নয়ন হইতে বারিধারা পড়িতে লাগিল; হরিনারায়ণ তাঁহার পদ চুম্বন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গুণরাম স্বামী আবার বলিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য এখন তুমিই ঠিক করিবে, মরীচি আমার নিকট দুই দিন আসিয়াছিলেন; প্রথম দিন তিনি তোমার সকল পূর্ব্ব বিবরণ শুনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিন তোমাকে এই পত্রখানি দিয়াছিলেন। আর এক দিন লোকদ্বারা এই পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। বৎস, স্থানান্তরে যাইয়া এই পত্র দুখানি পাঠ কর, তার পর আবার আমার নিকটে আসিও। তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহা এই সময়ের মধ্যে ঠিক করিও।"

হরিনারায়ণ স্বামীজীর হস্ত হইতে পত্র দুইখানি লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া পাঠ করিলেন।

প্রথম পত্র।

পণ্ডিত মহাশয়!

যে দিন আপনার পত্র পাইয়াছিলাম, সে দিন আমার কি ভাবে গত হইয়াছিল, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারি না। যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি সেই দিবসই আপনার গুরুদেবের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কেবল দুই চারি দিন মাত্র তখন পর্ব্বতে উঠিয়াছেন; আমার নিকট আপনার সকল কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। আমি তাঁহার হৃদয়ে অনেক

আঘাত করিলাম। তিনি আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন।

আপনার কথা বলিয়া তাঁহাকে ত অত্যন্ত কাতর করিলাম, তার পর তাঁহার নিকট আপনার পূর্ব্ব বিবরণ জানিবার জন্য আমার বাসনা বলবতী হইল। আমি এই জন্যই তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। কারণ, আপনার পত্র পাঠ করিয়া আপনার পূর্ব্ববিবরণ জানিবার কৌতুহল শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। আপনার গুরুদেব সকলি বলিতে স্বীকৃত হইলেন; তিনি আপনার পূর্ব্ব জীবনের কোন কথাই আমার নিকট গোপন করিলেন না। আমি যেমন তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিলাম, তিনিও তাহার প্রতিশোধ তুলিয়া লইলেন, তিনি আমার হৃদয় বিষদ্বারা দংশন করিলেন। এখন আপনার জীবনের সকলি জানিয়াছি, জানিয়া বিষের জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছি। বিষের যাতনায় অস্থির হইয়া, তিন দিবস পরে মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম, সেখানে আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার। শুনিলাম, ইংরাজের সৈন্য বাবার বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আরও শুনিলাম, মন্দিরবাসিনী সকল কুমারীগণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছে! আমি তখন থাকিতে পারিলাম না, আমিও গেলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় যুদ্ধে আমরা জয়ী হইলাম। বাবা পূর্ব্বে সকলকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইংরাজেরা আসিয়াই ভয়ানক বিপদে পড়িল। সম্মুখে আমাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাইল না, অথচ সকলেই অজ্ঞাত তীর দংশনে অস্থির। এই প্রকার কিছুকাল সহ্য করিয়া তাহারা পলায়ন করিল, আমরা তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলাম। যা'ক, সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমরা প্রতিশোধ তুলিয়াছি; আমরা অপমান সহ্য করিতে পারি না। যদি সে দিন যুদ্ধে আমার মৃত্যু হইত, তবে আর আজ মরীচি আপনার নিকটে পত্র লিখিত না; মরীচি তাহা হইলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইত।

যুদ্ধের পর দিন আপনার নিকট পত্র লিখিতে বসিলাম, কিন্তু লিখিতে পারিলাম না, চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তার পর দিন লিখিতে বসিলাম, সে দিনও লিখিতে পারিলাম না; এ পোড়া নয়ন যদি অন্ধ হইয়া যাইত, তাহা হইলে কোন দুঃখ ছিল না, তাহা হইলে আর আপনাকে দেখি না বলিয়া এ পোড়া নয়ন জল ফেলিত না। তার পর

দিন একটু লিখিলাম; তার পর দিন আবার একটু, এই প্রকার প্রায় ১০ দিনে এই পত্রখানি শেষ করিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়, আমার যত্নের বস্তু তুচ্ছ করিবেন না, দয়া করিয়া পড়িয়া দেখিবেন।

আমি আপনার পত্র পাইয়া বাবার নিকট আমার মনের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন,—'তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই।' এ কথা কেন লিখিতেছি? আপনি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী বলিয়াছিলেন, তাই বুঝাইয়াদিলাম, আমি বাবার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া গুরুদেবের আশ্রমে যাই নাই।

আপনার পত্র পড়িয়াছি,—অনেক বার পড়িয়াছি। আপনার পূর্ব্ব জীবন-বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছি। আপনি যাহা প্রাণান্তেও আমার নিকট বলিতেন না, আমি সে সকলি আজ জানি, আজ আর আমার নিকট কিছুই গোপন করিতে পারিবেন না; আমি আজ পবিত্র কুসুমে কীটের আধিপত্য দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তবুও কুসুমকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; আপনাকে হৃদয়ে একবার স্থান দিয়াছি ত আর আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না; এ নয়নদ্বয় জল ফেলিতে ফেলিতে অন্ধ হয়, হউক, তবুও এ জল নিবারণ করিব না, আপনাকে কখনই ভুলিব না।

আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না; আমি ত আপনার নিকট আর কিছুই চাই না, কেবল আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম। কেন অকারণ আমার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন।

আপনার সুরবালা আর আমি এক নহি। সুরবালা পতিপরায়ণা সতী, সীতা ও সাবিত্রীর তুল্যা, আমি বীর-দুহিতা, নীরস জীবন ধারণ করিতেছি; আমি কাহাকেও ভালবাসিতে শিখি নাই; বনের ফুল বনে ফুটিয়া রহিয়াছি। তবে আপনাকে দেখিলে কেন সুখী হই? তাহা কি আমি বলিতে পারি? এ হৃদয় যে জানে, সেই বলিতে পারে। আপনি আমার বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিলেন কেন?

আপনি ধার্ম্মিক, আপনার সঞ্চিত ধন অনেক, তাই আপনি সতর্ক হইলেন, আমার সঞ্চিত ধন কিছুই নাই, আমি আর সতর্ক হইব কেন? যাঁহার জীবন থাকে, জীবনে সুখের বস্তু থাকে, তাঁহারই গরলের ভয়;

আমার কি? আমি জীবন-শূন্য, ভালবাসা-শূন্য, সুখ-স্পৃহা-শূন্য, আমি কাহার ভয়ে সতর্ক হইব? আমি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি না।

আপনি ত চলিলেন; আমি ত রহিলাম, কিন্তু নিশ্চয় আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিব না। আপনার স্নেহের—মরীচি।

দ্বিতীয় পত্র।

পণ্ডিত মহাশয়,

এই পত্র আপনি কখন পাইবেন, জানি না, পূর্ব্ব পত্র পাইয়াছেন কি না, তাহাও জানি না; আমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, বাবাকে ইংরাজেরা রাজার সহিত চক্রান্ত করিয়া ধরিয়াছে; আর ১৫ দিন পরে বাবার বিচার হইবে; আপনি যদি এই ১৫ দিনের মধ্যে পত্র পান, তবে অবশ্য আমার সহিত ঐ দিবস সাক্ষাৎ করিবেন। আমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত—আজ আর কিছুই লিখিতে পারিলাম না, অনুগ্রহ করিয়া অবশ্য অবশ্য একবার আসিবেন। আপনার স্নেহের—মরীচি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রিপুদমনের উপায়।

পত্র পাঠান্তর, সন্ন্যাসী ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় ভাবিলেন, মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইল; অথচ রিপুদিগকে আয়ত্বাধীন না করিতে পারিলে আর যাইতে অভিলাষ নাই; এ সকল বিষয় বিশেষ করিয়া চিন্তা করিলেন। হিসাব করিয়া দেখিলেন, মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করিবার আরো আট দিন বাকী আছে; তিনি অন্যমনস্কভাবে মৃদু মৃদু পদসঞ্চারণ করিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মরীচির পত্রের মর্ম্ম গুরুদেবের নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন, মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার একান্ত আবশ্যক।

সন্ন্যাসী। দেখা করা উচিত, তা জানি, কিন্তু আমার রিপু সকলকে দমন করিতে না পারিলে আর যাইতে পারি না। আপনি রিপুদমনের উপায় কি, বলুন; আমার আর সহ্য হয় না।

গুরুদেব। রিপু দমনের উপায়? বৎস, কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া কে আত্ম সংযমে সমর্থ হইবে, তাহা আমার পক্ষে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। অনেক সাধককে দেখিয়াছি, তাঁহারা কঠোর শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া রিপুদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন; যখন যে রিপুকে প্রবল দেখেন, তখন তাহার মূল পর্যান্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। এক দিকে দেখিতে গেলে, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য তৃষিত বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু দুর্বৃত্ত মনকে দমন ও আসক্তি নির্ব্বাণ করিতে না পারিলে, কখনই ধর্ম্ম সাধন হয় না; কারণ যন্ত্র বিনষ্ট হইলেও, কল চালাইবার শক্তি অন্তরে অন্তরে প্রবলবেগে ক্রীড়া করিতে থাকে; এই প্রকারে মানবকে অত্যন্ত অসার করিয়া ফেলে। আর এক প্রকার সাধক দৃষ্ট হন, তাঁহারা সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎসংসর্গ এবং সৎকার্য্যে অনবরত রত থাকেন; রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য অবসর রাখেন না; ইহাঁদিগের উপায় অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল; কারণ মনের বেগ, এ সকল কার্য্যতৎপরতায় একেবারে নির্ব্বাণ হয় না। আর এক প্রকার সাধক প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করেন; তাঁহাদিগের মনের দুর্জ্জয় বল প্রযুক্ত, তাঁহারা যখন অনুভব করিতে পারেন যে প্রলোভন আকর্ষণ করিতেছে, তখনই তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। যখন সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা আর না থাকে, তখন প্রলোভনকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করেন; ইহাঁদিগের উপায় নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু বিঘ্ন অনেক; কারণ যদি কখনও বিবেক পরাস্ত হইয়া যায়, যদি কখনও দুর্বৃত্ত রিপুগণ প্রবলতর বেগে উত্তেজিত হইয়া বিবেককে অতিক্রম করিতে পারে, তখন আর কে তাহাকে রক্ষা করিবে? নিমেষ মধ্যে প্রলোভনে তাঁহার জীবন কলঙ্কিত হইয়া যাইতে পারে।

আমার উপায় স্বতন্ত্র। আমি এই সকল প্রণালীর কোনটীই অবলম্বন করি না। আমি জানি, দাবানল প্রজ্বলিত করিতে না পারিলে, কখনও অসংখ্য অসংখ্য বন্যহিংস্র পশুদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই; আমি জানি, প্রত্যেক রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া মানব কখনও জয়ী হইতে পারেন না, যদি তাঁহার হৃদয়ে কোন অলৌকিক মহাবল গোপনে সঞ্চিত না হয়। আমি জানি, এ সংসারের প্রত্যেক বিভাগে, জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়ে, ঘটনার প্রত্যেক পংক্তিতে পাপের কীট অলক্ষিত ভাবে বাস করে, এ সকলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় তাঁহারই আছে, যাঁহার মনে দেবভাব আছে। পশুভাব পরিহার

পূর্ব্বক মানব যখন দেবভাব লাভে সমর্থ হন, তখন সংসারের সকল প্রকার গরল তাহার নিকট গরল বলিয়া বোধ হয়। আমরা গরলকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ না করিলে ত কখনই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। বৎস, আমার জীবনের কাহিনী শুন। আমি যখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম, যখন আমার যৌবন আমার প্রতি দুর্নিবার্য্য ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন আমি অনেকবার প্রতারিত হইয়াছি, অনেক সময়ে অমৃতকে গরল বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, অনেক সময়ে গরলকে অমৃত বলিয়া সাহ্লাদে চুম্বন করিয়াছি। মন তখন চঞ্চল ছিল, বিবেক তখন অস্থির ছিল, সকল সময়ে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম না। তার পর সাধনায় রত হইলাম। একেবারে আসক্তির হাত এড়াইতে চেষ্টা করিলাম, মনে ভাবিলাম, আসক্তি না থাকিলে, গরলেও আমার মন আকৃষ্ট হইবে না, অমৃতগ্রহণেও আমার বাসনা হইবে না। সংসারে যাহা আছে, তাহাই থাকুক, সংসারের সুখ সংসারের, সংসারের দুঃখ সংসারের, সংসারের সৌন্দর্য্য সংসারের, সংসারের প্রলোভন সংসারের, আমি যদি আকৃষ্ট না হই, তবে কে আমাকে আকর্ষণ করিবে? এই সকল মনে মনে ঠিক করিয়া আমি ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। যথা সময়ে সে বল পাইলাম। বৎস, নিরাশ হও কেন? সরল মনে আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে; সরল বিশ্বাসী হও, ঈশ্বর অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। এখন আমার নিকট সংসারের কোন পদার্থই প্রলোভনযুক্ত বোধ হয় না; সংসারের কোন বস্তুই আমাকে আর আকর্ষণ করিতে পারে না! সংসারের প্রলোভন এখন আর প্রলোভন বলিয়া বোধ হয় না; এ সকল, বৎস, ঈশ্বরের করুণা, মানব আপন বলে কখনও এ সংসারে আপনাকে অটল রাখিতে সমর্থ হয় না; বিশেষ সাধনা ব্যতীত কখনও কেহ এ সংসারে আপনাকে জয়ী করিতে পারে না। কেবল প্রার্থনাই আমাদিগের সম্বল, কেবল আত্মসমর্পণই আমাদিগের একমাত্র উপায়। আমাদের সর্ব্বস্ব সেই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ছার সংসারের জন্য কি রাখিব? আমরা অপরিপক্ক মানব, অপরিপক্ক অবস্থায় সংসারের কি উপকার করিতে পারি? কেবল আপনাদিগকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়া ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া যাই। অপরিপক্ক অবস্থায় সংসারের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, কারণ আপনাকে কে

অটল রাখিবে? যখন ঈশ্বরই সকল অধিকার করিয়া ফেলেন—যখন জীবনের সকল অধ্যায় ঈশ্বরের ভাবে পরিপূর্ণ হয়, তখনই মানুষ অটলভাবে সংসারের উপকার করিতে পারে। পরীক্ষায় জয়ী হইয়া সাধনায় রত হইতে হয়; সাধনায় কৃতকার্য্য হইলে তবে মানবের দ্বারা সংসারের উপকার সাধিত হইতে পারে। বৎস হরিনারায়ণ! এ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব বিশেষরূপ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখ।

সন্ন্যাসী অবিচলিত চিত্তে গুরুদেবের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তারপর বলিলেন,—আমি আপনার সংসর্গ ছাড়িয়া আর যাইব না, আমি আপনার নিকটে থাকিলে নিশ্চয় আত্মজয়ী হইব।

গুরুদেব বলিলেন,—বৎস, আমার সহিত চল, তোমাকে একটী দৃশ্য দেখাইব। এই বলিয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া গুরুদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গের চিত্র।

দুই দিবস পরে গুরুদেব সন্ন্যাসীকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলেন। আর দুই দিবস পরে একটী মূর্ত্তি আনিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, সে মূর্ত্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

কি অপরূপ দৃশ্য! সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, যাহা আর কখনও জীবনে দেখিতে সক্ষম হন নাই, যে চিত্রের সৌন্দর্য্য একদিন তাচ্ছল্য পূর্ব্বক পদদলিত করিয়াছিলেন, আজ সেই মূর্ত্তি কত শোভার ভাণ্ডার; আজ কত সুখের আধার! সন্ন্যাসী দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, তাঁহার দু নয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল, মস্তক লজ্জায় নত হইয়া আসিল; মনে কত প্রকার লীলা-তরঙ্গ আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে মূর্ত্তি কাহার? এ এমন একটী সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তি, যাহা দেখিয়া গুরুদেব এক দিন মোহিত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব, প্রকৃত স্বামিগত হৃদয়ের মনোহর চিত্র, দেখিলেও কত ভাব প্রাণে উদয় হয়। কি অপরূপ দৃশ্য!

গুরুদেব বলিলেন, বৎস, রত্নকে অবহেলা করিও না; তোমার অপেক্ষা রমণীর হৃদয়ে কত অমূল্য সার পদার্থ নিহিত রহিয়াছে, বৎস, ইহাকে তুচ্ছ করিও না। এই বলিয়া গুরুদেব সন্ন্যাসিনীর জীবনের সকল কথা বলিলেন। তারপর সন্ন্যাসিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবি! আপনার জীবন অত্যন্ত উন্নত, সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘৃণিত জীবনকে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইলে আপনার কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, আপনি আপনার হৃদয়ের ধনকে গ্রহণ করুন; আমি অনেক চেষ্টার পর আপনার আদরের ধনকে এই প্রকার রূপান্তরিত করিয়া আনিয়াছি, ইহা আপনার আদরের কি অনাদরের, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই, তবে এই মাত্র অনুরোধ, আপনার ইচ্ছা হইলে ইহাকে গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসিনী আহ্লাদ সহকারে বিনীতভাবে হস্ত প্রসারণ করিয়া সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ করিলেন। সে হস্ত স্পর্শে সন্ন্যাসীর জীবনে যেন এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল; তারপর বলিলেন, "স্বামি, যাঁহার কৃপায় আবার আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাকে বিশেষরূপে চিন্তা কর, তাঁহাকে ভুলিলে আমাদের কষ্ট, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই আমাদের সুখ। আমরা যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, আমাদিগের আর সুখ ও শান্তির বস্তু নাই, সংসারের কোন অসার চিন্তাই আমাদিগের মনকে তুষ্ট করিতে পারে না; চিন্তা কর দিন রাত্রি সেই হৃদয়ের ধনকে, যিনি চিরকাল তোমার এবং আমার ভালবাসাকে অভিন্ন করিয়া রাখিবেন; তুমিও তাঁহাকে ভালবাস, আমিও তাঁহাকে ভালবাসিতে অভ্যাস করি; দুই জনের মন এক জনকে অর্পণ করি, চিরকালের জন্য আমরা অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ হই। তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানেও আমার ঈশ্বর তোমার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবেন; আমি যেখানে থাকিব, সেখানেও তোমার ঈশ্বর আমার মনকে আকর্ষণ করিবেন, এমন সম্বন্ধ আর কোথায় পাইব? স্বামি, ভুলিও না সেই সখাঁকে, যিনি জীবনে ও মরণে আমাদের একমাত্র সুহৃৎ, সম্পদ, আশ্রয় এবং অবলম্বন। বিশেষ রূপে ঈশ্বরকে স্মরণ কর যে, আমরা সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়াও, এক অভিনব অভিন্ন সম্বন্ধে আজ সম্বদ্ধ হইতেছি। তোমার ঈশ্বরই আমার, আমার ঈশ্বরই তোমার; কি মনোহর সম্বন্ধ। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী আস্তে আস্তে স্বামীর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদেব সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিতে

শুনিতে ধ্যানে অচেতন হইয়াছিলেন; সন্ন্যাসী নির্ব্বাক হইয়া দেখিলেন, মুখে কথা সরিল না, হস্ত যেন অবশ হইয়া আসিল; সন্ন্যাসিনী স্বামীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে চলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে ঘোর অরণ্যের মধ্যে সন্ন্যাসিনী লুক্কায়িতা হইলেন।

গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি সন্ন্যাসীর নিকট সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চারি পাঁচ দিন তাঁহারা সেই সেই স্থানেই রহিলেন। চারি পাঁচ দিন পর গ্রামে মহা কলরব উঠিল, সন্ন্যাসিনীর সংবাদ না পাইয়া সকলেই অস্থির হইল, গ্রামের লোকেরা অবশেষে গুরুদেবের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল; গুরুদেবের দুরভিসন্ধিতেই সন্ন্যা-সিনী গ্রাম-ত্যাগ করিলেন, এ কথা যখন গ্রামে রাষ্ট্র হইল, তখন সকলেই গুরুদেবের জীবন-সংহারের চেষ্টায় সকলে রত হইল। তিনি পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথের মধ্যে কোন লোকের নিকট এই পত্রখানি পাইয়াছিলেন; শিরোনামায় তাঁহার স্বীয় নাম ছিল।

"দেব! আমরা মানব, আপনি দেবতা, আপনাকে আমি যখন বসন্ত-পুরে দেখিয়াছিলাম, তখনি দেবতা বলিয়া জানিতাম; এখন ত সেই বিশ্বাস আরো শতগুণে বদ্ধমূল হইয়াছে। আপনি দেবভাবে পরিশোভিত, আমরা নরকের কীট, আপনার দান গ্রহণে আমি অসমর্থা হইলাম; আমি দেবতার দান পবিত্র রাখিতে পারিব, এ বিশ্বাস আমার আজও হয় নাই। আর আমি রত্ন দিয়া কি করিব? দীন দুঃখিনীর ভাণ্ডার, রত্নে অবলার প্রয়োজন কি? আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সুরবালা যেন চিরকাল দরিদ্রা থাকে; আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সংসারের ঐশ্বর্য্যহীনা সন্ন্যাসিনী যেন চিরকাল ঈশ্বর সহবাসে সুখ পায়। দীনার রত্নের প্রয়োজন কি?

দেব! আমি চিরকালের তরে এ গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম, কারণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, আপনার অনুরোধ প্রতিপালনে আমার ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক। আপনার অনুরোধ পালন করিতে যাইয়া সংসারের গরল পান করিতে আর আমার অভিলাষ নাই! সংসারের মান, সংসারের সম্ভ্রম, সংসারের বিদ্যা, সংসারের বুদ্ধি, সংসারের সুখ ও শান্তি, এ কিছুতেই আমার মন আর ধাবিত হয় না; এ সকল গ্রহণ করিয়া, আমি

জ্ঞানহীনা, কি করিব? যে অবলম্বন পাইয়াছি, ইহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা যে দিন হইবে, সেই দিনেই আমি মরিব। আপনার অনুরোধ পালন আমার মৃত্যুর কারণ, ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আমি সকল প্রকার পরিচয়ের স্থান পরিত্যাগ করিলাম। এজন্মে, শত সহস্র চেষ্টা করিলেও আর আমার দেখা পাইবেন না; বৃথা আমাকে অন্বেষণ করিয়া আর সময় নষ্ট করিবেন না।

আপনি আমার স্বামীকে যে অপরূপ শোভায় শোভিত করিয়াছেন, তজ্জন্য অনন্তকাল ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আপনারা সুখে ও শান্তিতে থাকুন; ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।"

আপনার পালিতা,
পূর্ব্বের সুরবালা, সন্ন্যাসিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অমরধামাভিমুখে।

পাঠক, আজ চল, তোমাদের চক্ষের জল ও আমাদের চক্ষের জল এক সঙ্গে মিশাইব। যশলালের জীবনের সুখের অংশ হাসিতে হাসিতে লিখিয়াছি, তোমরাও প্রসন্ন চিত্তে ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়াছ। যশলালের জীবনই স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াই যশলাল এক প্রকার মৃত হইয়াছেন। কৃতঘ্ন সিকিম রাজা ইংরাজ-রাজের মায়াময় চক্রান্তে ভুলিয়া আজ এই মৃত জীবের মৃত্যু সংঘটন ক্রিয়া দেখিতে উল্লসিত হইয়াছেন, এ চিত্র লিখিতে, এ কলঙ্ক ভারতভূমে রটাইতে কাহার সাধ ছিল? গবর্ণমেণ্ট যথাসময়ে আমাদিগের সহায় হইয়া এক প্রকার আমাদিগের লেখনীর সম্মান রাখিয়াছিলেন। ঐ যন্ত্রসম্বন্ধীয় আইনের ভয় না থাকিলে, এতদিন এ কলঙ্ক দেশময় ব্যাপ্ত হইত। অবশেষে কিছুতেই এ কলঙ্ক-রেখা বিধৌত হইল না;—যশলালের আত্মার সহিত সিকিমের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইয়াছে;—রাজার কলঙ্ক-কাহিনী ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে। আমরা দেখিতেছি—অবশেষে অনিচ্ছা সত্বেও এ কাহিনী আমাদের লেখনী হইতে

নির্গত হইতে চলিল। তাতে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদের পোড়া লেখনী হইতে যখন যশলালের স্বাধীনতা-হীনতা-রূপ মৃত্যুসংবাদই ঘোষিত হইতে পারিয়াছে, যখন কৃতঘ্ন রাজার কলঙ্ক রটাইতে দুঃখ বা ক্ষোভ কি? তবে পাঠক, ধীরে ধীরে চল, যশলালের বধ্যভূমিতে যাই। চক্ষের জল সম্বরণ কর, আমরাও করি। যে চক্ষের জল ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল ফেলিতে হইবে, সে জল ক্ষণকালের জন্য সম্বরণ কর। চক্ষের জলই আমাদের সম্বল,—আর কি আছে? আমাদের বীরত্ব চক্ষের জল, আমাদের সহানুভূতি ঐ চক্ষের জল, আমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র ঐ চক্ষের জল। বিধাতা আমাদিগকে ঐ একটী মাত্র সম্বল দিয়াছেন—তাহা আজন্ম ফেলিব। আমরা কাঁদিতে আসিয়াছি, কাঁদিয়াই যাইব। তবে আজ কেন ক্রন্দন সম্বরণ করিতে বলিতেছি? পুণ্যশ্লোক যশলাল আমাদিগকে কাপুরুষ বলিবে এইজন্য। যশলালকে রক্ষা করিতে যে জাতির ক্ষমতা নাই,—যশলালের মৃত্যু সময়ে সে জাতির ক্রন্দন করা বিড়ম্বনা। আমরাও কাঁদিব, তোমরাও কাঁদিবে,—কিন্তু ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, যশলালের পুণ্যাত্মা এই পাপ-লোক অগ্রে পরিত্যাগ করুক।

এইত যশলালের বধ্যভূমি। অদ্য প্রাতে বিচারকেরা দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন যে, অনধিক ১০ ঘণ্টার মধ্যে যশলালের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে হইবে। বিচারের অব্যবহিত পরেই তার-যোগে লাটসাহেবের অনুমতি আসিয়াছে। বিচারের পূর্ব্বেই সকল প্রস্তুত ছিল,—বিচারের পরেই সকলে বধ্যস্থানে সমবেত হইয়াছেন। এক ধারে ইংরাজ-প্রতিনিধি অশ্বে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন; তাহার পশ্চাতে ইংরাজ সৈন্যগণ সারি সারি সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। অপর ধারে সিকিম রাজা তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া রহিয়াছেন। একদিকে সিকিমের অধিবাসী দর্শকগণ মলিন বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; অপর দিকে যশলালের কতকগুলি প্রিয় সৈন্য দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহারা অস্ত্রশূন্য, কারণ সিকিম রাজা তাঁহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া সকল কাড়িয়া লইয়াছেন। উপত্যকা আজ মলিন,—অপরাহ্ণ হইয়াছে, সূর্য্যদেব ক্রমে ক্রমে বিষাদের চিত্র দ্বারা উপত্যকাকে মলিন করিয়া দিলেন;—বিহঙ্গমকুল নীরব—সকল নীরব। এমন সময়ে প্রহরীগণ যশলালকে বধ্যভূমিতে আনয়ন করিল। যশলালের গম্ভীর মূর্ত্তি,—বিস্ফারিত লোচনে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। প্রহরীগণ একটু

একটু দূরে রহিয়াছে—কারণ যশলাল যেন বলিয়া দিয়াছেন—'আমাকে স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই—আমি কাপুরুষ নহি—মরিবার জন্য আমি ভীত নহি।' পশ্চাতে পশ্চাতে ঐ যে একটী রমণী আসিতেছে, পাঠক, ইনি কে, জান? ইনি বীরদুহিতা মরীচি। আজ মরীচি উন্মত্তা—রুক্ষ-মুক্তকেশা পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন। যশলাল এতক্ষণ তনয়ার পানে অনিমেষ নয়নে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন,—ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে যেন বলিতেছিলেন—'মরীচি, বীরকুলের অবমাননা করিও না,—চক্ষের জল ফেলিও না।' মরীচির মূর্ত্তি আজ গম্ভীর, বালিকা মরীচির বালিকাত্ব আজ সময় বুঝিয়া যেন অবসর লইয়াছে। মরীচি পশ্চাতে পশ্চাতে পিতার সহিত বধ্যভূমিতে অগ্রসর হইলেন, কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না। দাবানল যখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন কে তাহাকে নিবারণ করিতে অগ্রসর হয়? বধ্যভূমিতে নীত হইতে না হইতে ইংরাজ সৈন্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, একদিকে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যশলাল এতক্ষণ যেন সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া তনয়ার পানে চাহিয়া ছিলেন। মরীচি বলিয়া উঠিল—"বাবা—বাবা!" যশলালের অমনি চেতনা হইল, চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন, সকল প্রস্তুত হইয়াছে। একদিক হইতে একজন লোক যশলালের নিকটে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া যশলাল অমনি বধ্য-কাষ্ঠে পদনিক্ষেপ করিলেন;—তাঁহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

"যদি কেহ আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—আমি অগ্রসর হইয়া কোথায় যাইতেছি? আমি বলিব, আমি সেই রাজ্যে যাইতেছি, যে রাজ্যে ন্যায়ের প্রতি অন্যায়ের আধিপত্য নাই,—সুখে কলঙ্ক নাই,—ভালবাসায় বিশ্বাসঘাতকতা নাই;—বীরত্বে কাপুরুষতা নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি বধ্যভূমিতে কেন নীত হইয়াছি,—স্বাধীনভাবে সমর ক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ না করিয়া কেন আজ এই ভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছি? ঐ প্রশ্নের উত্তর এই,—কৃতঘ্ন সিকিম রাজার বিশ্বাসঘাতকতায়। আমি রাজবিদ্রোহী বলিয়া আমাকে ঘোষণা করা হইয়াছে। আমার স্বদেশী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, আমি কি জন্য রাজবিদ্রোহী। স্বাধীনতা ভিন্ন মানুষের আর আদরের কি বস্তু আছে! হায়, সেই দেববাঞ্ছিত স্বাধীনতা সিকিমকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে! সিকিমরাজ এক্ষণে ইংরাজের গোলাম। কৃতঘ্ন রাজা টাকার মায়ায় ভুলিয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে

উদাস্ত যখন বুঝিলাম, তখন রাজার মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কর্ত্তব্যের একমাত্র পথ দেখিলাম। দেশের রাজা আজ আছে ত কাল নাই, জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় পৃথিবীতে রাজ-উত্থান ও রাজ-পতন। ক্ষণস্থায়ী রাজার মুখ চাহিয়া কি স্বদেশের মায়া, প্রিয় জন্মভূমির মুখচ্ছবি ভুলিব? জন্মভূমির স্কন্ধে কলঙ্ক লেপন করা আমার প্রাণের অসহ্য। জন্মভূমির স্বাধীনতা আমার পক্ষে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। সেই জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য আমি অবিশ্বাসী রাজার মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলাম। যাঁহারা বলিবেন, আমি সেই অবৈধ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছি, তাহাদিগকে আমি বলিব,—স্বদেশের উদ্ধার জন্য জীবন দান অপেক্ষা আমি উৎকৃষ্ট পুরস্কার জানি না। আমি আজ মরিতে আসিয়াছি,—কিন্তু এ সংসারে কে না মরিবে? কোন্ ব্যক্তি সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়া মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিয়াছেন! আমার মৃত্যুতে আমি যে প্রকার সুখী,—সিকিমের দুর্দ্দশা দেখিতে বাঁচিয়া থাকিয়া তত সুখী হইতাম না। অদ্য আমার প্রাণবায়ু এই দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নে বহির্গত হইবে, অনন্তকাল এই কথা প্রস্তরের ফলকে ফলকে খোদিত থাকিবে। সিকিম অধিবাসীর মধ্যে যাহার অন্তরে স্বদেশের দুর্দ্দশার চিত্র কালিমা আনয়ন করিয়াছে,—আমার মৃত্যু তাহাকে দ্বিগুণ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কি এমন কোন বীর নাই, যে আমার মৃত্যুর মধ্যে সিকিমের পুনঃ উদ্ধারের বিন্দু নিহিত দেখিতেছে? হায়, সকলি নীরব! স্বদেশবাসী বন্ধুগণ নীরবে তামাসা দেখিতে গৃহে ফিরিও না। দেশের দুর্দ্দশার চিত্র এই স্থান হইতে অন্তরে গ্রথিত কর। নীরবের আর সময় নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে যশলালের দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হই[illegible] অশ্রু পতিত হইতে লাগিল; আবার বলিতে লাগিলেন; "প্রিয়সমদুঃখী স্বদেশপ্রিয় সৈন্যগণ, আমার সময় শেষ হইয়া আসিতেছে,—আর অধিক কাল তোমাদিগের মুখশ্রী দেখিয়া সুখী হইতে পারিব না। এ জ[illegible]ত তোমাদিগের ভালবাসা, তোমাদিগের মুখশ্রী ভুলিতে চলিলাম;—মৃত্যু[illegible] পরে আমার কি হইবে, জানি না, নচেৎ তোমাদিগকে অন্তরে গাঁথিয়া [illegible]। আমি ত চলিলাম,—কিন্তু স্বদেশের যে দুর্দ্দশার চিত্র তোমাদের [illegible] রাখিয়া যাইতেছি, ইহার বিষয় জীবনে একদিনও ভুলিও না। [illegible] যখন বিশ্রাম লাভার্থ শয়নাগারে প্রবেশ করিবে, তখন তোমাদিগের [illegible]

স্মরণ থাকে,—সিকিমের বিশ্রামের সময় আর নাই। বিশ্রামের কথা স্মরণ হইবা মাত্র যেন তোমাদের অন্তরে দারুণ শেল বিদ্ধ হয়;—তখন ভাবিও, যাহার বক্ষে রক্তশোষক সর্প দংশন করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে,—তাহার কি বিশ্রামের সময় আছে? আমি এ জন্মের তরে চলিলাম, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার জন্য,—আমার স্মরণার্থ কি করিবে, এই বিষয় লইয়া কয়েক দিন চিন্তা করিতেছিলে,—আমি বলি,—আমার স্মরণার্থ তোমরা এক্ষণে কিছুই করিও না। এই পরাধীন দেশে আমার স্মরণার্থ কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। তোমাদের অন্তরে আমার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ,—জীবনের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও যাঁহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহার একটী অনুরোধ তোমরা পালন করিও। হায়—আমি ঘোরতর অপরাধী,—আমি আবার তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি! আমি কি স্বার্থপর! আমি জীবনে তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই, মৃত্যু-সময়েও কিছু পারিলাম না। তোমাদের ভালবাসার বিনিময়ে জীবনে কি দিয়াছি?" যশলালের চক্ষের জলে আবার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি কাপুরুষ—বন্ধুবান্ধবের জন্য মৃত্যু-সময়ে অস্থির হইতেছি!! সৈন্যগণ,আমার জন্য তোমরা কেহই অশ্রু বিসর্জ্জন করিও না। আমি এবার বুঝিতেছি, তোমাদের কোমল হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিতেছি;—কিন্তু আমার এই শেষ অনুরোধ—যশলাল আর কোন ভিক্ষা চায় [illegible] একটী মাত্র ভিক্ষা, আমার জন্য তোমরা কাঁদিও না,—যত দিন [illegible] ধ লইতে না পারিবে, যত দিন সিকিমের উদ্ধারের জ[illegible] না পারিবে, সে পর্য্যন্ত আমার জন্য তোমাদের [illegible] আমার জন্য আর কিছু করারই প্রয়োজন নাই, [illegible] করা। তোমাদের নিকট আমার এই মাত্র [illegible] সৈন্যগণের মধ্যে কোলাহল আরম্ভ হইল, সকলে [illegible] ঠিল,—"আমি আজ হইতে দেশের জন্য জীবন দিতে [illegible] আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—এ চিত্রের প্রতিশোধ না [illegible] না।"

[illegible] গোলযোগ দেখিয়া ইংরাজ-অধিনায়ক বলি- [illegible] প্রয়োজন নাই,—এই কথা বলিতে না বলিতে [illegible] হইল। যশলাল ধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"আর

কতক্ষণ থাকিব? ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তবেই আমার বক্তব্য শেষ হয়।”

সৈন্যগণের পানে তাকাইয়া যশলাল পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—“ইহাই তোমাদিগের পক্ষে সম্ভব। তোমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া আমি মৃত্যুতে জীবন পাইলাম। বন্ধুবান্ধব, তবে আজ বিদায় হই।”

পার্শ্বে মলিনা মরীচি দণ্ডায়মানা ছিলেন, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,— “মরীচি, জীবনসর্ব্বস্ব! ফিরিয়া যাও। আজ হইতে তামার পিতার মুখশ্রী ভুলিয়া যাও। বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যাহাতে বীরকুলের সম্মান বজায় থাকে, তাহা করিও। দেশের কথা ভুলিও না। তুমি উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছ, আমার বিশ্বাস আছে, আমার সকল কথারই তুমি অর্থ বুঝিতে পারিয়াছ। আজ জীবনে তোমার পিতাকে হারাইলে, কিন্তু বিশ্বপিতা তোমার মস্তকের উপরে সর্ব্বদা তোমার কল্যাণকামনা করিতেছেন, মনে রাখিও। আমাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ কর;—মাতৃভূমির দুর্দ্দশা স্মরণ কর। আমাকে যে প্রকার ভালবাসিতে, বিশ্বপিতাকে, তোমার জন্মভূমিকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা কর। অনন্তকাল তোমার জন্য সুখ ও শান্তি স্বর্গে রহিয়াছে;—মরীচি, সকল স্মরণ করিতে করিতে ফিরিয়া যাও।”

মরীচি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—বাবা আমি কোথায় যাইব?

যশলাল বলিলেন,—“অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী তোমার বিহার ক্ষেত্র হউক,—প্রত্যেক সিকিমবাসীর গৃহ তোমার আশ্রয় হউক—[illegible] অধিবাসীর তুমি ভালবাসার পাত্রী হও,—প্রত্যেকে তোমার [illegible] শিক্ষা করুক। প্রত্যেকের গৃহে যাইয়া প্রত্যেককে [illegible] করাইয়া দিলেই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইবে [illegible] বলিতে যশলালের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল,—[illegible] জহ্লাদকে আহ্বান করিলেন। তারপর চক্ষু নিমীলিত [illegible]

“প্রসন্নময়ী জননি, তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া স[illegible] যশলালকে ক্রোড়ে লও। তোমার পদই আমার একমাত্র [illegible] দায়িনি,—তোমার চরণ প্রান্তে আজ চিরকালের জন্য আশ্রয় [illegible] সকল ভুলিয়া অনন্ত সুখ ও শান্তির অধিকারী হউক।”

ইহার পর কি হইল, তাহা আর আমাদের লিখিতে ইচ্ছা [illegible]

তারপর মরীচি অন্তরে গরল ধারণ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, সে চিত্র দেখাইতে আর সাধ নাই। সুতরাং ইংরাজ-কলঙ্কের এই স্থানেই শেষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুঃখের কাহিনীতে সুখের চিহ্ন।

সন্ন্যাসিনীর পত্র পাঠ করিয়া গুণরাম স্বামী অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন, সন্ন্যাসীকে পত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন এবং সুরবালার জীবনকে শত শতবার প্রশংসা করিলেন, তারপর দ্রুত পদনিক্ষেপে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। মরীচির সহিত শেষ সাক্ষাতের কেবল মাত্র এক দিন বাকী ছিল, সন্ন্যাসী এবং গুণরাম স্বামী উভয়েই ত্রস্ত হইয়া চলিলেন!

অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে পৌঁছিতে পারিলেন না, গুণরাম স্বামী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং যত্নসহকারে সন্ন্যাসীকে মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী যে দিন উপত্যকায় পৌঁছিলেন, তাহার পূর্ব্ব দিবসই যশলাল সিংহের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছিল; উপত্যকার পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে দে[illegible]হার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের উদ্রেক হইল। পূর্ব্বে যেখানে ভুটিয়া [illegible]পিত ছিল, সেখানে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, [illegible] মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন; যেখানে পূর্ব্বে [illegible] প্রহরী থাকিত, সেখানে ইংরাজ-প্রহরী দেখিতে [illegible] দেখিয়া মনে ভাবিলেন, ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা [illegible] তাহাদিগের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছে। তিনি [illegible]রীচির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

[illegible] একি মনোহর চিত্র! একটী যুবতী নববেশ ধারণ [illegible]লে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন! কিসের চিন্তা? [illegible] তাহা বুঝিবার শক্তি নাই, বাঙ্গালী পাঠকের তাহা [illegible]র ক্ষমতা নাই। আমরা সংসারের চিত্র দেখিয়া দেখিয়া [illegible] পথে চালাইয়া দিয়াছি, মন এ প্রকার চিত্র দেখিতে

বলিয়া উঠে, যৌবনে প্রণয়ের চিন্তা ভিন্ন যুবতীর আর কিসের চিন্তা থাকিতে পারে? আমরা আরো মনে করি, এ প্রকার সৌন্দর্য্য, এ প্রকার সুকোমল প্রস্ফুটিত কুসুম কীট-দংশনের উপযুক্ত পদার্থ। অসার মন লইয়া, অপবিত্র হৃদয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে যত্ন করা, কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা আমরা উত্তম রূপে বুঝিয়াছি। আর অপবিত্র ভাব গ্রহণের ইচ্ছায় গ্রন্থের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন পাঠকের বিড়ম্বনার একশেষ, তাহার পরিচয় আর আমরা লিখিয়া কি দিব? বাঙ্গালী পাঠকের মন কোন্ শ্রেণীর পুস্তকের প্রতি দিন দিন আসক্ত হইয়া মনুষ্যত্বহীন হইতে বসিয়াছে, তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। যিনি গ্রন্থকার হইবেন, তাঁহাকেই অসার প্রণয়ের কর্দ্দমে তুলিকাকে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে, আর যিনি পাঠক হইবেন, তাঁহাকেই প্রণয়-বর্ণিত পৃষ্ঠার কীট হইয়া তাহাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে!! দেশের এ প্রকার হীনাবস্থা আমরা আর কত দিন নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষকে ভাসাইব, তাহা কে বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে?

ঐ যে গেরুয়া-বসনাবৃতা, মুক্তকেশা যুবতী, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, বদনের শোভা মলিন, কিন্তু তবুও প্রফুল্লতা-শূন্য নহে; নয়ন বাষ্পে পরিপূর্ণ, অথচ জ্যোতিবিহীন নহে; হস্তপদাদি স্থির, অথচ অবসন্ন নহে; উহার মনে কত প্রকার চিন্তা ক্রমশঃ উঠিয়া উঠিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে; উহার এ ভাব কেন? আমরা যদি বাঙ্গালী না হইতাম, তাহা হইলে উহার মনের শোভা আমরা [illegible]ত করিতাম, এ দেশের পাঠকগণ যদি বাঙ্গালী প্রকৃতির পরিচয় না [illegible] আহ্লাদ সহকারে তাহা পড়িয়া দেখিতেন। নির্জীব অর[illegible] কাহিনী লিখিতে যাইয়া আমরা স্বর্গীয় চিত্রের অব[illegible] করি না; কারণ সে কলঙ্ক রেখা, আমরা যখন এ সংসা[illegible] যাইব, তখনও অদৃশ্য জগতে আমাদিগের স্বভাবকে ম্লান [illegible], জগতের নিকট হাস্যাস্পদ করিবে। কে ইচ্ছা করিয়া জীবনে কলঙ্কের বোঝা [illegible] করিয়া, এ সংসারে কৃতার্থ মনে সময় কাটাইতে পারে?

সন্ন্যাসী মনোহর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, মরীচির [illegible] হইলেও তাঁহাকে দূর হইতেই চিনিতে পারিলেন, তিনি মৃদু মৃদু [illegible] করিয়া মরীচির সন্নিকটস্থ হইলেন, শরীর অজ্ঞাতসারে রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।

দূর হইতে পণ্ডিত মহাশয় যখন নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন মরীচি ব্যাকুল মনে তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন; তারপর বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কি? বলুন ত আমি এবেশে এখানে আসিয়াছি কেন?

সন্ন্যাসী। তা আমি কি প্রকারে জানিব? কল্য তোমার পিতার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে কি?

মরীচি। সে অনেক কথা, পরে বলিব, আমি আজ যে বেশ ধারণ করিয়াছি, ইহা দেখিয়া কি আপনি সুখী হন নাই?

সন্ন্যাসী। মরীচি, বালিকার স্বভাব তোমার আজও দূর হইল না, যে কথা শুনিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির, অগ্রে সে কথা বল।

মরীচি। আপনি আমার কি বালিকার স্বভাব দেখিলেন?

সন্ন্যাসী। তোমাদের মন্দির, পিতার বাড়ী প্রভৃতি সকলই লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের শ্রী একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, এ সকল দেখিলে কত কষ্ট হয়; তা স্মরণ করিয়া কি তোমার মনে একটুও কষ্ট হয় না?

মরীচি। কষ্ট হইবে কেন? এ সংসারে চিরস্থায়ী কোন্ পদার্থ? আপনিই ত বলিয়াছেন, পৃথিবীর সকলই চঞ্চল; আপনি কি মনে করেন [illegible], আপনার শিক্ষায় আমার কিছুই উপকার হয় নাই, আপনার শিক্ষাতে আমার হৃদয়ে কিছুই আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই?

স[illegible] মরীচি! ও সকল কথা এখন রেখে দেও, বল ত সত্য স[illegible] হইতেছে না?

[illegible] কি না, তাহা আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন [illegible]নি কি প্রকারে জানিবেন?

[illegible] কষ্ট হইলে তাহা অবশ্যই বাহিরে প্রকাশ পায়; [illegible] আকৃতি দেখিলে ত কিছুই অনুভব করা যায় না।

[illegible]তুমি কি প্রকারে উপার্জ্জন করিলে?

[illegible]ভাবিক?

[illegible]র মনে কষ্ট হইতেছে না, ইহাই অস্বাভাবিক।

[illegible]হাসিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! আমরা পর্ব্বতে [illegible]দের কষ্ট বাহিরের কোন চিহ্নেই প্রকাশ পায় না, [illegible] হইয়াছে কিনা, তা সকলি আজ আপনার নিকট খুলিয়া

বলিব; চলুন এখন আমরা আশ্রমে যাই। এই বলিয়া মরীচি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সন্ন্যাসী পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

আশ্রমে গমন করিয়া উভয়ে সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। মরীচি সহসা অধোমুখী হইলেন, সহসা তাঁহার সর্ব্ব শরীর মলিন হইয়া গেল; সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—“পণ্ডিত মহাশয়! আপনার চরণে আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, আপনার হৃদয়ে আমি অনেক আঘাত করিয়াছি, তাহা আমি সকলি বুঝিতে পারিতেছি। আজ বুঝিতে পারিতেছি,—আপনার হৃদয়ে আঘাত না করিলে আমার হৃদয় আজ অস্থির হইত না। পর্ব্বতবাসিনী রমণী আমরা,—চিরকাল পাষাণ দ্বারা হৃদয় বাঁধিয়া রাখি; ইহাতে কি কোন ঘটনার দুঃখ বা যন্ত্রণা দাগ বসাইতে পারে? কিন্তু আজ দেখিতেছি,—আমার হৃদয় মন অস্থির হইতেছে। কেন হইতেছে? কে জানিবে? আমরা পর্ব্বত-পালিতা, আমরা কখনও অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না। এই ছুরিকা আমার হাতে নীরবে রহিল, এ শিক্ষা কাহার? আজ অত্যাচারীরা আমার জীবনের সকল কাড়িয়া লইল, অথচ আমার হাত আজ অচল রহিল? পণ্ডিত মহাশয়! ক্ষমা করুন, আপনার শিক্ষার ফল প্রত্যর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন; তুচ্ছ করিবেন না। এই নিন,—আপনার সকল পুস্তক আজ বিসর্জ্জন দিব! এই নিন, আজ আপনার সকল উপদেশ এ হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব। কেন এ সকল আর হৃদয়ে পোষণ করিব? আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি,—কেননা [illegible] আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া হৃদয়ত্ব হারাইয়াছি। [illegible] বাক্য অযথা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি। আজ আর [illegible] আজ সকল প্রত্যর্পণ করিব।” মরীচির নয়ন হইতে জল [illegible] পড়িতে লাগিল। ক্ষণ কাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—সকল [illegible] করিব, কিছুই রাখিব না। সকল প্রত্যর্পণ করিয়া কি [illegible] করিব? আপনার ঐ সুন্দর মূর্ত্তি? না—তাহা নহে। আপনার [illegible] আর কি? অত্যাচারীর প্রতি ক্রোধ। আপনি যদি বলেন, [illegible] গেলে ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে হয়; তবে তাহা আমি পারি[illegible] হৃদয়ে পোষণ করিব, দুইয়ের সামঞ্জস্য রাখিব; নচেৎ আমি [illegible] পিতার সুন্দর মূর্ত্তি কি ভুলিয়া যাইব? পিতার প্রতি অত্যাচারে[illegible]

প্রকারে হৃদয় হইতে দূর করিব? তা কখনই পারিবনা। বাবার কথা—উঃ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আপনি বিজ্ঞ, আনি ধার্ম্মিক; কিন্তু আপমি পিতার প্রতি অত্যাচার ভুলিয়া কখনও কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারিব না। অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাকে বিদায় দিন।"

সন্ন্যাসীর হৃদয় অস্থির হইল, বলিলেন, "মরীচি! উন্মত্তার ন্যায় হও কেন? তোমার পিতার প্রতি কি প্রকার অত্যাচার হইয়াছে?"

মরীচি দন্তে দৃঢ়তর রূপে দন্তাঘাত করিয়া বলিলেন,—"দুরাচারী কৃতঘ্ন রাজা—বাবাকে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিয়াছে, কল্য অত্যাচারী ইংরাজ আমার বাবার বিচার শেষ করিয়াছে, কল্য এই গগনভেদী পর্ব্বতের সম্মুখে বাবাকে ফাঁসী দিয়া বধ করিয়াছে!! অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি কখনও ইহা সহ্য করিতে পারিব না; আমি নিশ্চয় অত্যাচারীর বক্ষে এই ছুরিকা বিদ্ধ করিব? আমাকে কে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে?"

সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তার পর বলিলেন,—"মরীচি, হৃদয়ের অমূল্য ধন, অস্থির হইওনা, ঈশ্বর অবশ্য তোমার হৃদয়ে শান্তি দিবেন; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

মরীচি বলিলেন,—"আমি শান্তি চাই না, পর্ব্বত-পালিতা বনবালা, শান্তি লইয়া কি করিব? আমার রক্ত এখনও উষ্ণ আছে, এ শরীরে এখনও রক্ত বহিতেছে। ঈশ্বরের নিকট শান্তির প্রার্থী হইয়া অত্যাচারীকে ছাড়িয়া দিতে পারি না, তা কখনই হইবে না। পণ্ডিত মহাশয়! আমার হৃদয় ছাড়িয়া দিন, আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করুন্। আমার বাবার অত্যাচার ভুলিয়া কখনও আপনার কথানুসারে চলিব না; অপরাধ ক্ষমা করুন।"

সন্ন্যাসী। "জীবন মরীচি! কি করিবে, তুমি ত অসহায়, কি করিবে একাকিনী তুমি?"

[illegible] সে জন্য কে চিন্তা করে? আমি অসহায়া হই[illegible] অবিশ্বাসিনী নহি, এই অস্ত্র অবিশ্বাসী নহে। [illegible] আমি অবিশ্বাসিনী নহি। আমাকে বিদায় দি[illegible]ড়িয়া দিন্।"

[illegible] বিদায় দিয়া আমি কি করিয়া থাকিব? [illegible] হইয়া আমি কি প্রকারে বাঁচিব?"

[illegible] না, তা বলিতে পারিনা। ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে [illegible] প্রতি মন সমর্পণ করা আপনার ন্যায় বিজ্ঞের পক্ষে [illegible]ধার্ম্মিক, মনুষ্যের প্রতি আপনার ভালবাসা নিবদ্ধ করা [illegible] মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে, তারপর ঈশ্বরসেবায় নিযুক্ত [illegible]বায় নিযুক্ত হইব, তখন সংসারের কোন পদার্থে [illegible] না। অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি আজ আপনার [illegible] আজ আমার ভালবাসাকে ছিন্ন করিব; আমি অপ- [illegible] প্রকার দোষের হাত হইতে রক্ষা পাইব।"

গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—"নৌকার বোঝা ভারী হইলে, মাঝীকে ডাকিয়া বলিও, তিনি তোমার বোঝা কমাইবেন ; আর সহায় নাই ; বৎস,—নির্ভর করিতে শিখিও ,—তরঙ্গ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া যাইও না, মাঝীকে অবিশ্বাস করিও না, মাঝী অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিবেন।" গুরুদেবের কথা কেবল কল্পনায়ই এ যাত্রা রহিয়া গেল ; আর বিলম্ব সহ্য হয় না, আর আশা ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না ; পাপের বোঝা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে চলিল, ইহা দেখিয়াও, কি প্রকারে আর নৌকাকে রাখিব ? জগৎ যাহা বলে, বলুক ; হস্ত ! আজ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিও না, নৌকা ডুবাইয়া দেও।"

সন্ন্যাসী অস্থির হইয়া উন্মত্তের ন্যায় এ দিক ওদিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন ,—

"যদি দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া এ অরণ্যের হিংস্র জন্তুদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি ? একটী একটী করিয়া আর কটাকে মারিব ? একটী মারিতে গেলে আর একটী উপস্থিত হয়, সেটাকে মারিলে আর একটা নয়ন সমক্ষে পতিত হয় ; এ প্রকার করিয়া আর কত কাল যুদ্ধে রত থাকিব ? যুদ্ধ করিয়াই বা কি করিতে পারিলাম ? একদিকে জয়ী হই, অন্য দিকে জন্তুগণ ভয়ানক রবে আমাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়া দেয় ; কত দিন কত মাস, কত বৎসর গেল, কিন্তু শত্রুকুল, হিংস্র জন্তুদিগের হস্ত হইতে এ অরণ্যকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। যদি দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সকলই ভস্মসাৎ হইত,-কিন্তু তাহা ত পারিলাম না ; তাহা ত আমার ক্ষমতায় ঘটিল না। তবে কি করিব ? এ অরণ্য পরিত্যাগ করাই শ্রেয় [illegible] নাই,—আর হিংস্র জন্তুদিগের আক্রমণ সহ্য হয় না ; ত[illegible] যাইব কোথা ?"

[illegible]র প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল ; আবার [illegible] রোগগ্রস্ত দেহে আর সার নাই, কতটার প্রতি-[illegible] আরোগ্য করিতে যাই, আর একটী রোগ প্রবল [illegible]োগ্য করিতে না করিতে আর দশটী দেখা যায়। [illegible] পারি না। গুরুদেবের আদিষ্ট মহা ঔষধ এত [illegible] পাইলাম না,—যাহা একবার উদরসাৎ করিলে [illegible]র হইয়া যায়, তাহা পাইলাম না ; তবে আর [illegible]ত রোগ যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না। ধৈর্য্য ধরিতে [illegible] পারি কই ?—যাতনায় শরীর অস্থির। এ রোগগ্রস্ত [illegible] ত আর উপায় দেখি না। কিন্তু পরিত্যাগ করিয়াই বা

[illegible]! কে বুঝিবে ? সংসার ছাড়িয়া আসিলাম, সকল [illegible]ড়াইবার জন্য, কিন্তু সংসার রোগগ্রস্ত দেহ ছাড়িয়া

ত দূরে থাকিতে পারিল না; যেখানে যাই, সেখানেই আ
করে! কোথায় যাইব? উঃ—আর সহ্য হয় না।”

সন্ন্যাসীর চক্ষু নিমীলিত হইল, উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগি
কোথায় যাইব? অপরাধীর আর স্থান নাই; যেখানে যাই, সে
যেখানে যাই সেই খানেই হিংস্র জন্তুর আক্রমণ; আর দাঁড়াই
অন্তর্যামি, তুমি ভিন্ন অন্তর ত আর কেহই দেখিতে পায় না,—
কি বাস করিতেছে, তা সকলই তুমি জান। আর সহ্য ক
প্রবঞ্চনা করিয়া ত আর তোমার জ্ঞান-নয়নকে আ
পারি না। হৃদয়বিহারি! এ গরলপূর্ণ হৃদয়ের সকলই তুমি জ
সন্তান,—শত অপরাধী,—তোমার চরণে, আর নিবেদন
মনকে আর কি প্রবোধ দিব? আর কি আশ্বাস বাক্য
গুরুদেবের সকল কথাই ত মনে রাখিয়াছি, কিন্তু তথাপি
এই দশা ঘটিল। কতদিন, কতবার, কত চেষ্টা করিলাম,—
জানিতেছ; কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। লক্ষ্য
বিহীন, জীবন-শূন্য,—পাপী, তাপী, নারকী, শত অপরাধী
দীনবন্ধু! আমার পানে একবার চাহিয়া দেখ। আজ ত এ
প্রভু! আজ ত এ হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ অরণ্য হইতে প
জগদীশ! আজ ত এ রোগগ্রস্ত দেহ পরিত্যাগ করিব। দয়া
কোথায় যাইব? উপায়হীনের উপায়, অন্ধের চক্ষু, পথ দেখা
লোকের নিকট আমি ধার্ম্মিক; কিন্তু অন্তরে আমি প্রবঞ্চক,
আমার সকলি ত তুমি জান। কাহার কথায় আর বিশ্বাস ক
ত আমি চিনিয়াছি। প্রভু! আর কার মুখের প্রশংসার প
থাকিব, আমাকে ত আমি চিনিয়াছি। আমার অ
করিয়াছি, তাহার জ্বালা ত আর সহ্য করিতে পা
না জানিতেছ? তবে প্রভু প্রতিমা বিসর্জ্জন দেই।
আর ত ধৈর্য্য ধরিতে পারি না; আমি ত
বোঝা গুরুতর, কিন্তু আর ত বোঝা ভারী করিতে
এ নৌকা তবে ডুবাই।”

“মন! গরল পান করিয়াছ? ঐ দেখ মরীচি
ঢালিয়া দিতেছে। মরীচির অমৃতকে
পান করিয়াছ? মরীচির ঐ হাসিকে
কি অসার প্রকৃতি তোমার! গরলকে
তুমি অমৃতকেও অমৃত জ্ঞান করি
করিয়া চুম্বন করিলে? উঃ কি অসা ”

“গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—‘সং এক
একটী গরলের। গরলের চিত্রে ধিক,
মোহিনী শক্তি অত্যন্ত অধিক; চিত্রকে

গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিকট গরল অমৃত বর্ষণ করে-; বিষও সুধা হইয়া যায়; এ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া মানবের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও, একেবারে অসাধ্য নহে।” কিন্তু আমি তাহা পারিলাম না, আমি প্রলোভনে জয়ী হইতে পারিলাম না, আমি গরলকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না, আমি নরাধম, আমি অমৃতকেও বিষে পরিণত করিলাম। উঃ প্রাণ যায়,—অমৃতনিকেতন মরীচি—প্রেমের পুত্তলি,—হৃদয়ের ধন,—তুমি আমাকে বুঝিলে না, আমি আজ অমৃত হইতে গরল সৃজন করিয়া পান করিয়াছি,—আমি আর বাঁচি না; আমাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে? পৃথিবী অন্ধকার হউক, জগৎ ডুবিয়া যা'ক, মরীচি কোথায়? উঃ, আমি কি উন্মত্ত হইলাম? আমার হস্ত? এই ত হস্ত। আমার মন? কোথায় মন? মরীচি! ছাড়িয়া দেও, আর ধরিয়া রাখিও না; আমার মনকে আর ধরিওনা। পিশাচী মরীচি, এই শাণিত অস্ত্র আমার হাতে রহিয়াছে, দেখ্‌ছিস্ না? তোকে এখনই সাংঘাতিক আঘাত করিয়া মারিব। মন! পিশাচীর মমতা ছাড়, কুহকিনীর মন্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া এস। উঃ, আমি কি উন্মত্ত হয়েছি? যা মুখে আস্‌তেছে, তাই বল্‌ছি, ঠিক ত আমি উন্মত্ত হয়েছি। প্রাণ যায়,—যাই!”

“এই অস্ত্রখানি কি প্রকার সুন্দর। মরীচি ইহার দ্বারা কত পশুকে ধ্বংস করিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। মরীচির হস্ত কি পবিত্র! আমিও ত হিংস্র পশু, আমিও এই অস্ত্রের উপযুক্ত। ঠিক কথা। তবে আজ কে আমাকে বধ করিবে? এই হস্ত? এ ত মরীচির হস্ত নহে। মরীচির হস্ত বিশ্বাসী; আমার হস্ত কলুষিত, আমার হস্ত কৃতঘ্ন; অবিশ্বাসী। কেন অবিশ্বাসী? মরীচির হস্ত শত্রুবিনাশে কখনও কাতর নহে। আর আমার হস্ত, শত্রুবিনা[illegible] কেন? আমিই ত আমার শত্রু, আমার রিপুই ত [illegible]ক কেন বিনাশ করিতে পারিতেছে না? মরীচির হস্ত [illegible]স্ত অবিশ্বাসী? কি এই হস্তকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরি-[illegible]”

[illegible] সন্ন্যাসীর হস্ত বিদ্যুৎ বেগে অস্ত্র সহিত প্রসারিত [illegible]জা তুলিল। হস্ত প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া [illegible] করিল। বিশ্বাসী হস্ত, নৌকা ডুবাইয়া দিল।

[illegible]শম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের পরিণাম।

[illegible]য়ের মৃত শরীর যখন দুঃখিনী মরীচির নয়ন সমক্ষে পড়িল, [illegible] করিলেন [illegible] মরীচির নয়নে জল আসিল না, হৃদয়ে বৈলক্ষণ্য

উঠে। দুরাচার কৌশলী ইংরাজ-চক্রান্তে একদিন সমস্ত দেশ বিদেশীর শাসনভুক্ত হইবে; ভারতবাসীরা বল বীর্য্য, সাহস বিক্রম সকল বিসর্জ্জন দিয়া, এক দিন ইহাদিগের গোলাম হইবে। অত্যাচারের উপর অত্যাচার, তাড়-নার উপর তাড়না, উৎপীড়নের উপর উৎপীড়ন, ভারতের অস্থি মজ্জা ভেদ করিবে; এমন সময় আগমন করিবে, যখন আর কাহারও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না; এমন সময় আগমন করিবে, যখন হৃদয়ের দুঃখ, যন্ত্রণা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা যাইবে না। যাহা আর ত্রিশ বৎসর পরে ঘটিবে, আজ তাহারই সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। এক দিন যে অত্যা-চারে এ দেশের জীব সকল মৃত-সাজ পরিধান করিবে, এক দিন যে অত্যাচারে এদেশ শ্মশান হইয়া যাইবে, আজ কেবল তাহারই সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। মরীচি, দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা কাহার নিকট ব্যক্ত করিব? সকল আশা ভরসা, দেশের গৌরব, সকল বিসর্জ্জন দিয়া এই বিচিত্র শোভারভাণ্ডার পর্ব্বতের আশ্রয় লইবার কারণ কি? জীবনের সকল পরিত্যাগ করিলাম, কেবল মনের শান্তির জন্য! যেখানে ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার, সেখানে আমার মন শান্তি পায় না। এই নির্জ্জন প্রদেশ, কে জানিত এখানেও আমি শান্তি পাইব না? উঃ কি কষ্ট! ঈশ্বর, চিরকাল কি এই ভাবেই গত হইবে? ভারতবর্ষে কি আর সূর্য্যোদয় হইবে না? এই পর্ব্বতশ্রেণীর সুখশান্তি কি চিরজীবনের মতন অন্তর্হিত হইল? হায়! জগদীশ, অন্ধকার অল্পে অল্পে সকল স্থান মলিন করিয়া ফেলিল! দীননাথ, ধর্ম্মের পুরস্কার কি ভারতবাসীর এই ছিল! উঃ হৃদয় অস্থির হয় কেন? প্রাণ কাঁদে কেন? দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয় কেন? নাথ! আর কোথায় যাইব? এমুখ আর কোথায় লুকা-ইব? কোথায় যাইলে যন্ত্রণা ভুলিতে পারিব? ঈশ্বর, দীন দুঃখীর আশা [illegible] কোথায় গেলে ইংরাজ অত্যাচার ভুলিতে পারিব! [illegible] ভারতের কলঙ্কীদিগের শাসনদণ্ড বিস্মৃত হইতে পারিব? [illegible]বে।”

[illegible] সকল কথা স্থির ভাবে শ্রবণ করিলেন, তাঁহার [illegible] উৎসাহের লহরী প্রবেশ করিল, সবিস্ময়ে বলি-[illegible] প্রতি আপনার এত ভালবাসা, তবে কেন আপনি [illegible] আপনার দ্বারা কত সুফল উৎপন্ন হইতে পারিত।”

[illegible]লেন,—“মরীচি তুমি এখনও বালিকা, আমার মনের [illegible] ? যদি একটুও আশার স্থান থাকিত, তাহা [illegible] না। মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের সকলি মুগ্ধ-[illegible] মনুষ্যত্ব শূন্য হইয়াছে। ভারতবাসী অর্থলোলুপ [illegible] করিতে ছুটিয়াছে! কতদিন, কত সময় প্রতীক্ষা করিয়া [illegible] বুঝিলাম, দৈববল ভিন্ন কখন ভারতবাসীর মৃত জীবনে [illegible] বহিবে না। কত চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু ঈশ্বর

বিশেষ করুণা ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিলাম না। তাই সকল ছাড়িয়া, সকল বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের অনুগত হইলাম।”

মরীচি বলিলেন,—“দেব! আমি ত আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না, আমি আজই স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইব।”

গুণরাম স্বামী। “তুমি অত্যাচারের প্রতিশোধ কি প্রকারে লইবে? তুমি বালিকা, শরীর কোমল, ইংরাজ চক্রান্ত কেমন করিয়া ভেদ করিবে?”

মরীচি বলিলেন, “আমি বালিকা সত্য, কিন্তু মনে রাখিবেন, আমি যশ-লাল সিংহের দুহিতা, বাবার অসীম ক্ষমতায় এই ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সিকিম রাজ্যের এক অংশও কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই, কোন যোদ্ধাই বাবার সমকক্ষ হইতে পারে নাই; মনে রাখিবেন, আমি বীর-দুহিতা, পর্ব্বতপালিতা, আমরা অত্যাচার সহ্য করিতে পারিনা। এই যে অস্ত্র দেখিতেছেন, ইহা দ্বারা প্রত্যেক অত্যাচারীর বক্ষ বিদীর্ণ করিব। সিকিমের রাজাকেও ছাড়িয়া দিব না! কৃতঘ্ন অবিশ্বাসীর মস্তক অগ্রে দ্বিখণ্ড করিব। আজ আপনাকে আর একটী সংবাদ দিতে আসিয়াছি।”

মরীচির সাহস, বল, বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া গুণরাম স্বামী পর্ব্বত-বাসীদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, তারপর বলিলেন, “কি কথা বলিবে, মরীচি?”

মরীচি বলিলেন, “আমার হৃদয় আজ অবসন্ন হইয়াছে, এ জগতে আমার দুঃখ আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই; আজ আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, আজ আমার ভালবাসার অবলম্বন, সুরবালার হৃদয়ের পুত্তলী, জীবন প্রাণ, আপনার অতি পবিত্র পদার্থ, সন্ন্যাসী আত্ম ঘাতী হইয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি চলুন, হৃদয়ের ধনকে আজ শেষবার দেখিয়া লউন।”

গুণরাম স্বামী উন্মত্তের ন্যায় মরীচির সহিত চলিলেন। হৃদয়ের দুঃখ, মনের যন্ত্রণা এ সংসারে কোন জীবই দেখিল না [illegible] না। তাঁহার নিগূঢ় প্রেম নীরবে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল.

কমল কুমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নূতন পুখুরের ঘাটে।

আজিকার কথা নহে। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক হইল, আষাঢ়ের [illegible] পূর্ব্বাহ্নে প্রহরেক বেলার সময়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোন পণ্ডগ্রামের মধ্য-

বিধবা ভগ্নী সৌদামিনী,দাসেদের বাড়ীর গিন্নীর গিন্নী মোহিনী, সকলেই নিজের নিজের রপ্ত পথে পুখুরের ঘাটে আসিয়া হাজির।

পুষ্করিণী খুব বড়, এপার ওপার অনেক দূর। উত্তরে ও পূর্ব্বদিকে দুটী বড় বড় ঘাট। উত্তরের ও পূর্ব্বের ঘাটে গ্রামান্তর প্রভেদ। উত্তরের ঘাটে যে গ্রামের স্ত্রী পুরুষ স্নান করে, পূর্ব্ব দিকের ঘাটে তাহারা ভ্রমক্রমেও কখন যায় না, যাওয়া সম্ভবও নহে। কারণ পুষ্করিণীর চারিদিকে বাগান। বাগান প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, কেবল ঘাট হইতে দুইটী প্রশস্ত পথ দুই দিকের গ্রামের সদর রাস্তার উপরে গিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের নিয়ম, এক ঘাটেই স্ত্রীপুরুষে স্নান করিয়া থাকে, তবে দীর্ঘকালের পদ্ধতি অনুসারে ঘাটের এক দিকে পুরুষ অপর দিকে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া থাকে। যে দিক্‌টা পুরুষেরা ব্যবহার করে, স্ত্রীলোক ভুলিয়াও সে দিকে যায় না, পুরুষদের কেহ অসাবধানতাবশতঃ স্ত্রীলোকদের দিকে স্নানার্থে অবতরণ করিলে, নিন্দার পাত্র হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঘাটের একধার রজকমহাশয়ের চিরঅধিকারভুক্ত, তিনি সেখানে প্রাতঃ-সন্ধ্যা নিষ্ঠার সহিত রাম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক গুরু কোমল আছাড়ে বস্ত্রের পাপ ক্ষয় করাইতেছেন। ঘাটের অন্য দিক আঘাটা নামে অভিহিত। অশৌচ স্না[illegible] প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ঐ স্থানটা নির্দ্দিষ্ট আছে। বৃহৎ গ্রামের একজন প্রভু [illegible] থাকিলেও, কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হয় না। আশ্চর্য্য এ[illegible] যে অশৌচ স্নান ও সেই সংসৃষ্ট বস্ত্রাদি ধৌতকরণ বিষয়ে কেহ কখনও এ[illegible] নির্দ্দিষ্ট বিধির বিপর্য্যয় করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

পুষ্করিণীটী নূতন পুখুর বলিয়া অভিহিত হইলেও, অনেক দিনের পুরা[illegible] পুখুর। পুষ্করিণী পুরাতন ও বৃহৎ বলিয়াই হউক, অথবা সত্য ঘটনা বলিয়া হউক, উহার সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম প্রবাদ এ[illegible] শুনা যায় যে, যখন ঐ পুখুর কাটান হয়, তখন নাকি উহার তলদেশে বড় বড় জাহাজের মাস্তুল ও বড় বড় পেরেক পাওয়া গিয়াছিল। একথা সত্য কি না বলা যায় না, তবে বৈদিক ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসারে ঐ স্থান কিঞ্চিৎ আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়, এবং ভূতত্ত্ববিৎদের মতে ঐরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে। তাহাতে আবার যে অঞ্চলের কথা বলা যাইতেছে, বহু পূর্ব্বকালে যে সেখানে বৃহৎ নদী ছিল, এরূপ মনে করিবার কিম্বা বিশ্বাস

করিবার কোন বাধা নাই। এমন কি যে হিসাবে সমুদ্রকূল দূর হইতে সুদূরে গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে ঐ অঞ্চল হয়ত এককালে সমুদ্রগর্ভই ছিল। অপর প্রবাদ এই যে, পুষ্করিণী খননকার্য্য শেষ হইলে পর প্রথম যখন তলদেশ হইতে জল উঠিয়াছিল তখন সেই নূতন জলে অনেকগুলি মুক্তা পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলে, অনেক ঝিনুক পাওয়া গিয়াছিল, তাহারই মধ্যে মুক্তা ছিল, আবার কেহ কেহ বলে, পুষ্করিণীর জলেই মুক্তা পাওয়া গিয়াছিল। যাহা হউক জাহাজের মাস্তল, পেরেক ও মুক্তা পাওয়ার প্রবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বও বৃদ্ধি পাইতেছে।

কতকাল হইল নূতন পুখুর কাটান হইয়াছে তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না। বহু পুরাতন হইলেও পুষ্করিণীর জল কাচের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। একটু উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া সুনীল গগনপট প্রতিবিম্বিত পুষ্করিণী বক্ষে সেই ঘন শ্যাম বর্ণ সলিল রাশির উপর দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়—হৃদয় শীতল হয়। এই নয়ন-মনোরঞ্জন পুষ্করিণী বক্ষে নানা স্থানে কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প সকল সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। সুনির্ম্মল সান্ধ্য আকাশে ইতস্ততঃ উদিত বৃহৎ নক্ষত্রগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর—প্রীতিকর, পুষ্করিণীর দৃশ্য সর্ব্বদাই সেইরূপ স্নিগ্ধ সুন্দর ও অতি মনোহর রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

সাধারণতঃ বেলা আটটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা ঘাটে স্নান পূজা করিয়া থাকেন। পুরুষেরা একটু বেলা হইলে, হাট বাজারের কার্য্য শেষ করিয়া বেলা দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায়স স্নান করিতে আসিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা দশকর্ম্মী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, যাঁহারা বার মাসে তের পার্ব্বণ উপলক্ষে, বার ব্রত উপলক্ষে নানা স্থানে পূজা প্রভৃতিতে ব্রতী থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের স্নানের সময়ে আসিয়া পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা পূর্ণ মাত্রায় নিষ্ঠাবান, তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্নান তর্পণ সমাপন পূর্ব্বক গৃহে পূজা আহ্নিকে প্রাতঃকাল অতিবাহিত করেন। গ্রামে এই শ্রেণীর নিষ্ঠাবান লোকের সংখ্যা দিন দিন লোপ পাইতেছে। উত্তরের বাড়ীর ন্যায়বাগীশ, মাঝের বাড়ীর তর্করত্ন, দক্ষিণের বাড়ীর বিদ্যানিধি

ও পূবের বাড়ীর বিদ্যালঙ্কার লোকান্তরিত। গ্রামের সম্ভ্রম ও গৌরব তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ সকল সুবিদ্বান ও নিষ্ঠাবান পণ্ডিত-গণের বংশধরেরা তসর ও গরদ পরিধান পূর্ব্বক দীর্ঘ ফোটা, শিখা ও রুদ্রাক্ষ-শোভিত হইয়া সভায় সমুপস্থিত হইলেও তাদৃশ ক্ষমবান নহেন এবং পিতা-পিতামহের ন্যায় সম্মানও পান না।

মাঝের বাড়ীর তর্করত্নের পুত্র তারকব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য গ্রামান্তরে কোথাও স্বস্ত্যয়নে যাইতে হইবে বলিয়া ঘাটে মেয়েদের পুরা ভিড়ের মধ্যে স্নান করিতে আসিলেন। বারোয়ারীতলায় ঢোলের শব্দ ও কবির লড়াইয়ের মত চিৎকার লইয়া ঘাটে যখন মেয়েমহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, কেহই কিছু ভাল করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেছে না, একটা বিষম কোলাহল ও গণ্ডগোল পুষ্ক-রিণীর ঘাট ও চতুঃপার্শ্বস্থ বন উপবন প্রতিধ্বনিত করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে গোবেচারা প্রৌঢ় যুবা তারকব্রহ্ম স্নান করিতে আসিলেন। অর্দ্ধদগ্ধ শব শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইতে না হইতে শৃগাল কুক্কুরের যেরূপ আনন্দ সমারোহ প্রকাশ পায়, তারকব্রহ্মকে দেখিয়া মেয়েমহলে সেই আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইল। ভাবিনীর মা ও তারিণীর পিসি অগ্রসর হইয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি বারোয়ারীতলার জমি নাকি নিলেমে উঠিতেছে?

তারক। কে বল্লে? নিলেমে উঠ্‌বে কেন? কই আমাদের ত কোন দেনা নাই, আমাদের নামে কেউত নালিসও করেনি, তবে নিলেমে উঠ্‌বে কেন? বলা বাহুল্য, যে বারোয়ারীতলার সুবিস্তৃত মাঠ তাঁহাদেরই। তাঁহারা গ্রামবাসিগণের নানাবিধ বৃহদনুষ্ঠানের সুবিধার জন্য ঐ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে বারোয়ারী পূজা হয়—বিজয়ার দিনে বিসর্জ্জনের প্রতিমা সকল গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঐ স্থানে আনিয়া রাখা হয়, এই জন্য কেহ বা উহাকে বারোয়ারীতলা বলে, আর কেহ কেহ বা উহাকে আড়ংঘাটা বলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত রামনামানুরাগী রজক জগন্নাথও ঐ মাঠে তাহার মলামুক্ত বস্ত্রগুলি আতপ তাপে শুষ্ক করিয়া থাকেন। বালকেরাও সুযোগ পাইলেই প্রাতঃসন্ধ্যা উক্ত মাঠকে ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করিয়া থাকে, কখন কখন কুরুক্ষেত্রও হইয়া থাকে।

ভা-মা। তবে মাঠে ঢোল বাজ্‌ছে কেন?

তা-পিসি। তারকের ২য় পক্ষের বিয়ের গায়ে হলুদের বাজ্‌না বাজ্‌ছে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাঝের বাড়ীর সেজ বউও স্নান করিতে আসিয়াছেন। তিনিই তারকব্রহ্মের হৃদয়বিহারিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী দুই জন প্রবীণা বিধবার কাণ্ড দেখিয়া অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে কোমল কঠোর স্বরে, মৃদুমন্দ ঝঙ্কারে ঠাকুরাণী নিজের অস্তিত্ব ও ভাবী সতিনী সমাগমের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বুড়ী হলেন এখনও রঙ্গ দেখ, ছি,এই সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মাঝখানেও কি এই রকম কর্‌তে হয়? তারক অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, তবে একবার জেনে আস্‌ছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন কাটা।

স্ত্রীলোকেরা মোটামুটী খবর জানিয়াছে, তবে কিসের জন্য কি হইতেছে সেটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, তাই এত উৎসুক। তারক প্রকৃত সংবাদ লইয়া আসিলেন। সকলেই চুপ। তিনি বলিলেন যে অনেক দিন হইল একবার বন কাটার হুকুম হইয়াছিল। এবার আবার সেইরূপ বন কাটিবার হুকুম বাহির হইয়াছে। যার যেখানে গাছপালা আছে, সব কাটিয়া ফেলিতে হইবে, বড় বড় গাছের ডালপালা সব কাটিয়া ফেলিতে হইবে, যেখানে বন জঙ্গল আছে, তাহাও সব পরিষ্কার করিতে হইবে। বিশ্বেস বাড়ীর বিধবা ভগ্নী সৌদামিনী বলিলেন,বলি, ঠাকুরদের এ নূতন পুখুরের চারিদিকের বাগানও পরিষ্কার করিতে হইবে ?

তারক। হ্যাঁ—তা হবে বই কি।

ভা-মা। তবেই হয়েছে, একেইত ভাগের মা গঙ্গা পায় না,পয়সার অভাবে বাগানের পাঁচিল পড়ে যাচ্চে।

ভা-মা। বলি, পুকুরের জলের ধারে ধারে যে শেওলা ও ঝাঁঝি হয়েছে, সেগুলাও কি উঠাবে ? না কেবল বনে বাগানে ডাল কাটিয়া বেড়াবে ? জলে নাব্‌বে না ?

তারক। তাত ঠিক কথা, পুকুরের জলটা যাতে ভাল থাকে সে চেষ্টা

আগে কর্‌তে হয়। এ পুকুরের জল নষ্ট হলে কি আর নিস্তার আছে। দশ বার খানা গ্রামের লোক নিরুপায় হইয়া পড়িবে।

তা-পি। বলি বন কাটার হুকুম্ বেরুল কেন? একবার ত হয়েছিল, সে অনেক দিনের কথা, এখন আবার নূতন করে বন কাটা কেন?

তারক। ইছাপুর, চন্দনপুখুর, আমডাঙ্গা, বড়জাগুলিয়া অঞ্চলে গত বৎসর জ্বরে অনেক লোক মরিয়াছে, এ অঞ্চলেও পাছে সেইরূপ হয়, তাই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতেছে।

ভা-মা। বলি যা আছে এর উপর আবার বাড়্‌বে কি? বলি জ্বরে কি বছরে বছরে কম লোক মরে? লোকের বাড়ী ঘর ত শূন্য হয়ে গেছে, আর মানুষ কোথায় যে মর্‌বে, এখন থাক্‌বার মধ্যে আছে কেবল ২। ৪ টী ছেলে পিলে, আর বাড়ীতে বাড়ীতে ২। ১ জোড়া বিধবা।

পূবের বাড়ীর রামেশ্বরের স্ত্রী রাঙ্গা বউ, বন কাটার কথা শুনিয়া একটু চিন্তিতা হইলেন, দক্ষিণের বাড়ীর ঠাকুরঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বোন্ একে এই পয়সা কড়ির টানাটানি, ছেলেটা ভুস্‌ছে, আবার এর উপর যদি ঘরের পয়সা খরচ করিয়া বাগানের গাছ পালাগুলা কেটে ফেল্‌তে হয়, তা হলেই ত সর্ব্বনাশ! গাছটা পালাটা আছে তাই এখনও চল্‌ছে, সেইগুলা কাট্‌তে হবে, তাও আবার ঘরের পয়সায়? এই বলিয়া দুঃখ করিতে করিতে জলপূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের বাড়ীর ঠাকুরঝিও উঠিলেন।

দ-ঠা। বলি রাঙ্গা বউ খোকা কেমন আছে? একবার যে একটু যাব ভাই সে অবসরও হয় না। দেখ্‌ছে কে?

রা-বউ। আর কেমন আছে, আমার মাথা আর মুণ্ডু। দেখ্‌ছে অপর্ণাথ ডাক্তার।

দ-ঠা। ভাল কথা, ছেলেটী ভাল, তোমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেও না। দোজ্‌বরে বটে, কিন্তু দেখ্‌তে শুন্‌তে ত মন্দ নয়, আর বয়সই বা কি বেশী হয়েছে, চল্লিশের নীচেয় ত এই ৩৫। ৩৬ বছর হবে বোধ হয়।

রা-বউ। লোক মন্দ না, তবে আমার ৭ বছরের মেয়ে, বড় বেমানান্ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রোগ শয্যাতে।

ও পুঁটী—ও সর্ব্বনাশী কোথায় গেলি? তোকে যে খোকার কাছে বস্‌তে বলে গিছি। আহা! বাছা আমার একা একা শুয়ে পড়ে রয়েছে। আহা! পাঁচ বছরের ছেলে, আজ বাদে কাল ছ বছরে পা দেবে, আজ কোথায় খেয়ে খেল্‌য়ে বেড়াবে, বাছা আমার বিছানার সঙ্গে মিশ্‌য়ে গিয়েছে, হাড় কখানি একখানি চাম্‌ড়া দিয়ে ঢাকা আছে মাত্র, শরীরে আর কিছু নেই! বাবা একটু উঠে বস্‌বে?

খো। না মা, বস্‌তে পারবো না। আমার বড় জলতেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও মা।

মা। সুধু জল খাবে বাবা? একটু মিছরি দেই? একটু মিছরি খেয়ে জল খাও, কেমন?

খোকা মাথা নাড়িয়া তাহাতেই সম্মতি জানাইল। মা ছেলেকে মিছরি আর জল দিতেছেন এমন সময়ে পুঁটী আসিয়া হেলেহুলে, হেসে আট খানা হয়ে বলিল, মা ঘোষেদের কালান্দীর বাছুর হয়েছে, সে তার মায়ের মত কাল হয়নি, বেশ ফরসা হয়েছে, কেবল কপালে একটী কাল টীপ। ভারি সুন্দর। মা তুমি আমায় ডাক্‌ছিলে?

মা। ও পোড়ারমুখী, তোকে না খোকার কাছে বস্‌তে বলে গিছ্‌লুম? ছোট ভাইটীর কাছে বুঝি একটু বস্‌তে পার না? তুমি থাক, তোমার

কালান্দীর বাছুর দেখা বুঝ্‌বোকোন ভাতের বেলা। রোগা ছেলেটা বিছা-নায় পড়ে চিঁ চিঁ কর্‌ছে,গায়ের কাপড়টা টেনে দেবার লোক নেই, এক ফোটা জল দেবার লোক নেই। তোকে বস্‌য়ে রেখে আমি নাইতে গেলুম, আর তুই কালান্দীর বাছুরের সঙ্গে কুটুম্বিতে কর্‌তে গেলি,আজ কালান্দীর গোয়াল ঘরেই ভাত খেগে যা, আমি আজ আর তোকে ভাত দেবো না।

পুঁটী। মা, বাছুরের কথা শুনে এই একটু আগে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম—যেমন গিছি অমনি একটীবার দেখেই ছুটে এসেছি, আমি সেখানে বসিনি, খেলাও করিনি। মা, তুমি রাগ করোনা, আমি আর যাবো না।

মা। যা, খোকার কাছে বস্‌গে যা। বড় ছেলেটাকে খাজনার টাকা আদায় কর্‌তে পাঠালুম, সেওত এখনও ফির্‌লো না। ঘরে চাল যা ছিল, আজ হলো, কাল আর চল্‌বে না। যদি কিছু আন্‌তে পারে, তা হলেই ভাল, তা না হলে, কাল যে কার দরজায় দাঁড়াব, ভেবে ভয় হচ্চে। আর কাঁহাতক্ই বা এর ওর দরজায় দাঁড়াইয়া দিন চলিবে। টাকাটা সিকেটা যা ছিল,ছেলেটার রোগের ওসুধ কর্‌তেই সব গেল, তবু ভাগ্যিগুণে অপর্ণাথ ডাক্তার ছিল, তাই রক্ষে, ভিজিটের টাকা দিতে হয় না। ওসুধের সিসি জড় করে হাঁসপাতাল হয়ে গেল, ভিজিটের টাকা দিতে হলে কি আর ছেলের ওসুধ হতো। আহা পরের বাছা বেঁচে থাক্। আমার মেয়ে অত ছোট না হলে, আমি বিয়ে দিতুম। দোজপক্ষের বর, বয়সও কম নয়, আমার সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে কিছুতেই মন উঠে না।

প্রতিবেশিনী সদুর মা মালা হাতে আগুন নিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাঙ্গা বউ, উনুন ধরেছে কি? আমাকে একটু আগুন দাও না ভাই। বলি নিজে নিজে বক্‌ছো কেন? কি হয়েছে?

গৃহিণী বলিলেন, দেখ দক্ষিণের বাড়ীর ঠাকুরঝি অপর্ণাথ ডাক্তারের সঙ্গে আমার মেয়েটীর বিয়ে দিতে বলেন, তা আমি ত ভাই কিছুতেই মত করিনি, তুমি কি বল, আমার কচি মেয়ে, অত বয়সের দোজপক্ষের বরে দেওয়া কি ভাল?

প্রতি। তোমার ত মত হবার কথা নয়। তুমি কি যেমন তেমন লোক। বলি দু বছরের কথা বইত নয়, তোমার এই দশা হয়েছে—আজ তাই লোক

তোমাকে যাকে তাকে যেমন তেমন বরে মেয়ের বিয়ে দিতে বলে। দুবছর আগে কি লোক এই কথা বল্‌তে সাহস কর্‌তো? তোমার লোক জন, কুটুম কুটুম্বিতা, অতিথ সজ্জন, জাঁক জমক্ যখন ছিল তখন কি আর কেউ ভেবেছিল যে তোমার আবার এমন দশা হবে বোন!

প্রবল ঝটিকার পুনঃ পুনঃ আঘাতে অগ্নিকুণ্ডের উপরিভাগের ভস্মরাশি উড়িয়া গেলে, আগুনের প্রবল শক্তি যেমন প্রকাশ পায়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, এমন কি, সুযোগ পাইলে সেই ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড মহা অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ প্রতিবেশিনীর প্রিয় বাক্যে গৃহিণীর প্রাণের মর্ম্মস্থানে লুক্কাইত বেদনায় দারুণ আঘাত পড়িল—তাঁহার বিশালায়তন নেত্রযুগলে তরল অনলধারা প্রবাহিত হইল—অনলপ্রবিষ্ট স্বর্ণ-বর্ণের ন্যায় তাঁহার মুখ-মাধুরী শতগুণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যতই তিনি হৃদয়ের সন্তাপানলে আত্মকাহিনীর আহুতি দিতে লাগিলেন, প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া চারিদিক হইতে সেই শোকাগ্নি ততই তাঁহাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে প্রতি-বেশিনীর নিকট দুঃখের গাথা গাহিতেছেন, এমন সময়ে ভাবী আশা ভরসার মধ্যবিন্দু ও সুখ সম্পদের ক্ষুদ্র রেণুটী নিদাঘ তাপে উত্তপ্ত হইয়া, শ্রান্ত ও অবসন্নদেহে গৃহপ্রাঙ্গণে দেখা দিল। নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নির পাত্র হস্তে প্রতিবেশিনীর সমক্ষে জননীর এতাদৃশ আকুলতা সন্দর্শনে বালক ভীতচিত্তে মন্দ পাদবিক্ষেপে জননীর দিকে অগ্রসর হইল। বালকের বয়স দশ বৎসর মাত্র। এখনও উপনয়ন হয় নাই। জননী পুত্রসমাগমে সংযতচিত্ত হইলেন। আজ দুই বৎসর বিধবা হইয়াছেন, সন্তানদের সম্মুখে কখনও এরূপ বিচলিত হন নাই। এই দুই বৎসর কাল প্রতিদিনই শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইয়া রজনীর অন্ধকারে শোকের আগুন জ্বালিয়া তাহাতে নিজে দগ্ধ হইয়াছেন, আর নিজ উপাধান সিক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আজ দুই বৎসরের পর দৈবক্রমে বহুযত্নে লুকাইত যাতনার ষোল আনা ছবিখানি পুত্রের সমক্ষে ধরিয়া ফেলিলেন। প্রতিবেশিনী দুটী মিষ্ট কথায় রাঙ্গা বউকে শান্ত করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূজার সময়ে।

সময় কাহারও হাত ধরা নহে। দেখিতে দেখিতে আষাঢ়ের পর শ্রাবণ, শ্রাবণের পর ভাদ্র মাস চলিয়া গেল। আশ্বিন মাস আসিয়া উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে আশ্বিন মাস সুখের মাস। বঙ্গের ঘরে ঘরে আনন্দের কোলাহল। দশভুজার পূজার আয়োজনে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা হৃষ্ট মনে চারিদিকে ছুটাছুটী করে। স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, বালক বৃদ্ধ, সমগ্র লোকমণ্ডলীর সমবেত উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র প্রাণ বৎসরের মধ্যে এমন ভাবে আর কখনও উচ্ছ্বসিত হয় না। এমন বিচিত্র দৃশ্য—বিরাট ব্যাপার, আর কোথাও আছে কি না, বলা যায় না। সমগ্র দেশব্যাপী এই জাতীয় উৎসবে আমাদের এই আখ্যায়িকামূলক ক্ষুদ্র পরিবার কত বার যে কত সুখ সম্ভোগ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। রামেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অধ্যাপক ছিলেন—দশ-কর্ম্মান্বিত পণ্ডিত ছিলেন। গুরুত্ব ও পৌরহিত্য জাত সম্মানের অভাব ছিল না। লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাপ্তি অপেক্ষা নিষ্ঠার দিকেই তাঁহার অধিক দৃষ্টি ছিল বলিয়া, আত্মীয় বন্ধুর গৃহে পূজা উপলক্ষে ব্রতী থাকিতে হইত। এইরূপ অনু-ষ্ঠানে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে সময়ে সময়ে তুমুল কাণ্ড হইয়া যাইত। দু তিন মাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইত, তাহাতে সে সময়ের ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন নিষ্ঠাবান জনগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানে আন্তরিকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইত। ১২৭১ সালের পূজার বৎসর বঙ্গে বড় বিপদ গিয়াছিল। সেইবার আশ্বিন মাসের শুক্ল পঞ্চমীর দিন সমগ্র দেশ-

ব্যাপী ভীষণ পবনপীড়নে ধনী দরিদ্র সমভাবে ধরাশায়ী হইয়াছিল। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত কত শত পুরুষ ও রমণী পুত্রকন্যা সহ নদীগর্ভে চিরনিদ্রাগত হইয়াছে। কত নিরাশ্রয় পথিক পথেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অসংখ্য দুঃখী জন কুটীরাবরণ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কত সম্পন্ন লোক শোভন দৃশ্য অট্টালিকা সহ ভূতলে পেষিত ও প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সে প্রচণ্ড মারুতলীলা সুখে দুঃখ, সম্পদে বিপদ, উৎসবে হাহাকারের ভয়ঙ্কর চিত্র দেখাইয়া গিয়াছে।

রামেশ্বর এখনও জীবিত। পূজার সময় দক্ষিণের বাড়ীর কর্ত্তা সুপ্রবীণ পণ্ডিত কাশীশ্বর রামেশ্বরকে নিজ গৃহের পূজায় আবদ্ধ রাখিতে বিশেষ চেষ্টা পান। কিন্তু সেই বৎসর ভাদ্রমাসে মাঝের বাড়ীর ন্যায়রত্ন লোকান্তরিত হন। রামেশ্বরের সহিত ন্যায়রত্নের সহোদরাধিক আত্মীয়তা। বাটীতে পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। নাবালক পুত্র ও বিধবার উপর সমগ্র ভার পড়িয়াছে। পিতৃহীন বালকের কার্য্য লোকাভাবে পাছে অসম্পূর্ণ থাকে বা অঙ্গহীন হয়, এই ভয়ে রামেশ্বর মৃত বন্ধুর আরব্ধ কার্য্যের উদ্যাপনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণের বাড়ীর কাশীশ্বর কোন মতেই রামেশ্বরকে এবার হস্তগত করিতে পারিলেন না। দুই বাড়ীই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ী। পাকা বাড়ী হইলেও পূজার দালান ছিল না, চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হইত। পবনদেবের দয়ায় ঐ দুই বাড়ীতেই প্রতিমাসহ মণ্ডপ ভূমিসাৎ হইয়া যায়। বেশভূষায় সুসজ্জিত প্রতিমা পঞ্চমীর রাত্রিতে পূজার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের দশা প্রাপ্ত হয়। রামেশ্বর ভিন্ন গ্রামে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি ষষ্ঠীর দিন ঐ দুই ভগ্ন প্রতিমার পুনর্গঠন কার্য্য সমাধা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পূজার ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন। কাশীশ্বর প্রাতে রামেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। মাঝের বাড়ীর ন্যায়রত্নের বিধবাও বিপদ সংবাদ দিলেন। রামেশ্বর উভয় বাড়ীর প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুনর্গঠন করিয়া, পূর্ব্ববৎ চিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, যতদূর সম্ভব প্রতিমা দুখানি পূজার উপযোগী করিয়া দিলেন। এইবারের কাজই তাঁহার জীবনের শেষ কাজ। তিনি জানিতেন, পর বৎসর আর তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্য করিতে হইবে না। কারণ পঞ্চমীর দিন বেলা আড়াই প্রহরের সময়, সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে বহু কষ্টে গৃহে ফিরিয়া সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, আমার

কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর বৎসর এমন দিনে আর আমাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকুমারকে বলিয়াছিলেন বাবা! সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া এই পথে চলা বড় কঠিন। সজ্জনের ন্যায় স্বাধীনভাবে চলিবার এই পন্থা প্রায় লোপ পাইতে চলিল। আমার দিন ফুরাইয়াছে, তাই তোমাকে বলিয়া রাখি, বহু অনাচার নিবন্ধন লোকসমাজে উপেক্ষিত ও হীনদশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসায় অবলম্বন করিও না। একটু ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া ২।১০ টাকা আনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ও সজ্জনের ন্যায় জীবন যাপন করিবে। পুত্রের প্রতি এই তাঁহার শেষ উপদেশ। ১২৭২ সালে তিনি লোকান্তরিত হইলে পর এই ক্ষুদ্র পরিবার বহুবিধ দুঃখ কষ্টে গত দুই বৎসর কাটাইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর কমলকুমারের জীবনে এই বার তৃতীয় বৎসরের পূজা আসিয়াছে। আট বৎসরের বালক গত দুই বৎসর মাতৃস্নেহে অতি সুন্দর নূতন বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ছোট ভাই ভগ্নীর সহিত পূজায় শত প্রকারের সুখভোগ করিয়াছে। কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে এবার দশ বৎসরের বালককে অভিভাবক সাজিতে হইয়াছে। এবার ছোট ভাইটীর সাংঘাতিক পীড়ার জন্য জননীর হস্ত শূন্য, ছোট বোন্‌টীরও একটু নূতন কাপড় হয় কিনা সন্দেহ। জননী সজল নয়নে পুত্রকে বলিলেন বাবা! আর বছরের যে কাপড আছে, তাতে কি এবার চলে না? কথাটী ছেলের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিলেও—প্রতিবেশী বালকবৃন্দের নূতন বস্ত্রের চাক্‌চিক্যে প্রাণ কেমন করিলেও—তাহাদের নূতন বস্ত্রের সুখ ও নৃত্য, মনে যাতনার উদয় করিলেও—তাহাদের উপেক্ষা ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিতে এবং বস্ত্রপ্রাপ্তির লোভ সংবরণ করিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। লুক্কাইত অশ্রুকণা মুখ ফিরাইয়া মুছিয়া ফেলিল। আবদ্ধ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করিয়া লইয়া মাকে বলিল মা! আমার আর বছরের কাপড়েই হবে, তবে পুঁটীকে যদি কেউ কিছু বলে মা, তা হলেই বড় কষ্ট হবে! বলিতে বলিতে অশ্রু জলে বালকের বৃহদায়তন চক্ষু দুটী জলে পূর্ণ হইয়া গেল। জননীর হৃদয়ে মনস্তাপের বজ্রাঘাত হইল। মা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান। মুখে কথা নাই, চক্ষে পলক নাই, নাসিকায় নিশ্বাস নাই। কাষ্ঠখণ্ডবৎ জননী ধরাশায়ী হইলেন। বালক চিৎকার করিয়া উঠিল "ওগো আমার মা যে কেমন হইয়া গেল!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নূতন বাড়ীতে।

কমলকুমারদের দুটা বাড়ী। দূরে নহে। এবাড়ী ওবাড়ী মাত্র। একটী বাড়ী পৈতৃক ভদ্রাসন। অপরটীতে কমলকুমারের পিতা রামেশ্বর স্বয়ং বাস করিতে আরম্ভ করেন। রামেশ্বর কিশোর বয়স হইতে ৺ কাশীধামে বাস করিয়া জীবনের মধ্যভাগ বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মকর্ম্মে যাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন পরিসমাপ্তির পরও দীর্ঘকাল পশ্চিমাঞ্চলে নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। গৃহে পরিজনবর্গের জন্য সময়ে সময়ে আবশ্যকমত অর্থ প্রেরণ করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নৃসিংহরাম গৃহে থাকিয়া নিজ পুত্রকন্যা, বিধবা ভগ্নী ও কনিষ্ঠের স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। রামেশ্বর যখন প্রবাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠের একমাত্র পুত্র ও একমাত্র কন্যা লোকান্তরিত। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ, বিধবা ভগ্নী ও পত্নী তিন জনে নয়নাসারে দিনরাত্রি ভাসিতেছেন, এমন সময়ে রামেশ্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আগমনে গৃহ আবার নূতন শ্রী ধারণ করিল, গ্রামেরও গৌরব বৃদ্ধি হইল। আবার এই গৃহ ক্রমে লোকজনে পূর্ণ ও আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া এক বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইয়া উঠিল। সকল সমারোহের মধ্যে কনিষ্ঠা বধূর (রাঙ্গা বউ) অশেষবিধ সুখ সৌভাগ্যের সমাগমে পতিপুত্র-হীনা বিধবা জ্যেষ্ঠার অশান্তির মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিধাতার ব্যবস্থাই এইরূপ। রাঙ্গা বউএর বিষাদ-তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে যখন রজনীর স্থির স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহ

উত্তপ্ত করিয়াছে, তখন তিনি স্বামী পুত্র লইয়া সুখে হাসিমুখে দিন যাপন করিয়াছেন। আজ একদিকে সুখের ক্রোড়ে দুঃখের অনন্ত শয্যা বিস্তার, অন্যদিকে বিষাদময়ী কালরাত্রির অবসানে শান্তি ও সুখের সুপ্রভাত সমাগম, ইহাতে কাতর হইলে চলিবে কেন? সংসারে সমগ্র রাত্রব্যাপী দুষ্ট অমাবস্যার অন্ধকারও আছে, আবার পক্ষান্তরে দিগন্ত-প্রসারিত ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নালোকে চকোরের সন্ধ্যায় সূচিত সুখের নৃত্য ফুরায় না, ঊষা-সংগীতও তাহার মত্ততা নিবারণ করিতে পারে না, এমন পূর্ণিমার রাত্রিও আছে।

কিন্তু বড় বউএর দৌরাত্ম্যটা ক্রমশঃ বড়ই বেশী হইয়া উঠিতে লাগিল। সময় নাই অসময় নাই, প্রাতঃকাল নাই সন্ধ্যাকাল নাই, গৃহের সকলকেই বড় বিব্রত করিয়া তুলিলেন। রামেশ্বর দীর্ঘকাল বিদেশে নানা স্থানে সসম্মানে শান্তিতেই বাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতিতে শান্তিপ্রিয়তা পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি জ্যেষ্ঠা বধূকে বিবিধ উপায়ে শান্ত করিতে,সংযত ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে লাগিলেন। বিধবা ভগ্নীকে উপদেশ দিয়া বড় বউকেই গৃহের কর্ত্রী করিলেন। টাকাকড়ি, সংসারের কাজকর্ম্ম সকল বিষয়ে জ্যেষ্ঠার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিতে বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শান্তি লাভ হইল না। বহু চেষ্টায়ও বিফল মনোরথ হইয়া শেষে রামেশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিদেশ যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। গ্রামের প্রধানেরা জানিতে পারিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও সন্তপ্ত হইলেন। সকলের মিলিত অনুরোধে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া ভাগীরথী-তীরে কোন নির্জ্জন স্থানে জীবন যাপনের জন্য পুনরায় যখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তখন গ্রামের কোন কোন প্রধান ব্যক্তির পরামর্শে ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নিকটে স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করাই স্থির হইল।

বড় বউ পুরাতন বাটীতেই রহিলেন। পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের অর্দ্ধেক, তাহাতে সঙ্কুলন না হইলে, বড় বউকে নিজ হইতে সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, রামেশ্বর এই নূতন বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নূতন বাটীতেই রামেশ্বরের সুখ-সৌভাগ্যের সূত্রপাত ও পরিসমাপ্তি! এখনও সেই গৃহেই তাঁহার সুখসম্পদের শেষ চিহ্নগুলির অল্পে অল্পে অন্তর্ধান হইতেছে। কে কোথায় কি ভাবে নির্ব্বাপিত হইবে, কিছুই বলা

যায় না। জ্যেষ্ঠাবধূর অন্য কোন গুণ থাক্, আর না থাক্, একটা প্রধান গুণ ছিল, তিনি তাঁহার দেবর-পুত্র গুলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এটা তাঁহার ধাতুগত গুণ হউক না হউক, তাঁহার শিক্ষার গুণের পরিচায়ক বটে। হিন্দুগৃহে স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা শ্বশুরের বংশরক্ষা। নিজের সন্তান নাই। দেবর-তনয়ে শ্বশুরের বংশ রক্ষা হইবে, এই গৌরবে তিনি অনেক সময়ে আহ্লাদে দিশাহারা হইতেন এবং এইজন্য কমলকুমার পৃথক্‌গৃহে পিতামাতার, বিশেষ ভাবে পিসিমায়ের আদরের ধন হইয়াও জেঠাইমায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিল। বালক অনেক সময়ে সুনিয়ম ও সদাচারের ব্যভিচারে পিতার নিকট দণ্ড পাইলে, জ্যেষ্ঠাবধূ যেখানেই থাকুন, আসিয়া নিজে পৃষ্ঠ পাতিয়া দিয়া বালককে রক্ষা করিতেন। এইজন্য বালকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ চলিয়াছিল, যাহা আর কাহারও সহিত হয় নাই, হইত না। অনেক সময়ে কোন দৌরাত্ম্য হইতে বালককে কেহই প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেছেন না,তিনি আসিয়া নিবারণ করিবা মাত্র বালক তাঁহাকে দুইএক ঘা প্রহার করিয়াই শান্ত হইত। বলা বাহুল্য যে,এ প্রহারটা আদরের প্রহার,আত্মীয়তার উপহার, অর্থাৎ আমার কাজে বাধা দিলে,কিছু পুরস্কার নিয়ে যাও। এই অনুরক্তির জন্য কমল কুমারের কণ্ঠধ্বনি জেঠাইমায়ের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। তিনিও বালককে নানা মতে কথা কহাইতে,হাসাইতে,নাচাইতে ভাল বাসিতেন। তাই কমল কুমারের কাতর কণ্ঠরবে তিনি যেখানেই থাকুন ছুটিয়া আসিতেন। আজ মা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরাশায়ী হওয়াতে কমলকুমার যেমন চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে, জেঠাইমা অমনি ছুটিয়া আসিয়া দেখেন ছোট বউ ভূশয্যা-শায়িত, সংজ্ঞাহীন, বালক বালিকা রোদন করিতেছে। তিনি সত্বরপদে অগ্রসর হইয়া জল লইয়া মুখে ছিটা দিতে লাগিলেন, মেয়েটাকে পাখা আনিয়া বাতাস করিতে বলিলেন। ছেলেকে বলিলেন, দাসেদের বাড়ীর মোহিনীকে ডেকে আন।

রাঙ্গা বউএর দাঁত লাগিয়াছে শুনিয়া মোহিনী ছুটিয়া আসিল। আরও দুই একজন আসিল। অনেক চেষ্টায় জাঁতির দ্বারা দাঁত লাগা ছাড়িল। কিন্তু সুস্থ হইতে বহু বিলম্ব হইল। পীড়িত পুত্র কুমদকুমার এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শয্যায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহার না ঘুম না জাগরণ, এক প্রকার ঘোর ঘোর অবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত নেত্রে কত প্রকার হরিদ্রা বর্ণের ফুল ফুটিয়া

চলিয়া যাইতে দেখিতেছে, চক্ষু চাহিয়া কেবল সাদা সূতার মত কত কি দেখিতেছে। সে দেখিতেছে, সূতায় কত সব ভয়ানক আকার দস্যু যেন আসিতেছে যাইতেছে, ভয় দেখাইতেছে, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলে, ফুলে ফুলে যেন রাক্ষস হইয়া ধরিতে আসিতেছে, কিন্তু এত দুর্ব্বল ও এত ভয় যে, সাহস করিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিতেছে না, ভয়ে কাঁদিতেও পারিতেছে না।

চেতনা হইতে না হইতে মা সর্ব্বাগ্রে ছেলেকে বলিলেন "বাবা! আমার খোকা কই?" এতক্ষণ কাহারও সে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। বড় বউকে লক্ষ করিয়া অতি ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন"দিদি,আমাকে রেখে আগে আমার বাছাকে দেখ।" খোকার কাছে গেলে খোকা নীরব নিরুত্তর, ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না। সকলেরই ভয় হইল। ভয় নিতান্ত অমূলকও নহে। বালক প্রায় বৎসরাধিক কাল সমানে ভুগিতেছে। এক দিনও একটু ভাল গেল না। পেট জোড়া পিলে ও যকৃৎ, সর্ব্বদা সমানে জ্বর আছে। সকলেই জানে যে কুমদ বাঁচবেনা কিন্তু মা জানেন যে এত টাকা খরচ করে ডাক্তার দেখান হচ্ছে, হরি কি মুখ তুলে চাবেন না? মনে মনে কতবারই বাবাঠাকুরের, পঞ্চানন্দের, মা কালীর পূজা মানিতেছেন আর বলিতেছেন "আহা! আমার বাছা সেরে উঠুক্।"

রাঙ্গাবউ আস্তে আস্তে বালকের শয্যাপার্শ্বে গিয়া ছেলের গায়ে হাত দিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "খোকা ও খোকা।"

খোকার ঘোর ভাঙ্গিল, খোকা উত্তর দিল, কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না। জননী কেবল স্নেহের দৃষ্টিতে শিশুর অধরওষ্ঠের ঈষৎ সঞ্চালন অনুভব করিয়া বলিলেন, একটু কিছু খাবে? বালক ইঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া বলিল "খাইব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ফানসে ও ফুলবাগানে।

আশ্বিন মাসও চলিয়া যায় যায়। প্রকৃতির নিয়ম—ঘাত প্রতিঘাতের ধর্ম্ম—বৈপরীত্যের মিলন-প্রবল উত্তেজনার পর বিরাম আসিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে চারিদিক জনতাপূর্ণ লোকারণ্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। বিবিধ বর্ণের বসন ভূষণে সুসজ্জিত নরনারী ও বালক বালিকার অবিরাম ছুটা ছুটীতে ধরাকে জাগরিত—কোলাহলময়—জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। সংবৎসর যাহার দুঃখে গিয়াছে, অশ্রুজলে যে গৃহতল সিক্ত করিয়াছে, সেও আনন্দময়ীর সমাগমে আনন্দের কথা বলিয়াছে ; যে সংবৎসর রোগ-শয্যায় শায়িত ছিল, সেও বৎসর-কার দিন উঠিয়াছে, মহামায়াকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে ; ২।৪ দিন পূর্ব্বে যে জনতাজাত কোলাহলে জনপদ ও শস্যক্ষেত্র পথ ঘাট ও হাট বাজার সমস্ত জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল, একটা মহাপ্রাণতায় সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়াছে। আজ চারিদিক নীরব, পথ ঘাটে লোক নাই, লোকালয় যেন পরিত্যক্ত, বিধাতা ধরাকে যেন জনশূন্য করিয়াছেন। যেন কোন মন্ত্রবলে সুসজ্জিত সংসার নীরব স্পন্দ-রহিত ভাবে স্থির—ধীর, যেন প্রাণী সকল প্রাণ হারাইয়া বিষাদের ছায়ায় নিদ্রিত। এমন সময়ে একদিন প্রাতঃকালে সুরাগ-রঞ্জিত উষা-বক্ষে নবোদিত সূর্য্যের কোমল কিরণ রেখায় যামিনীর নেত্রাসার সমুজ্জল মুক্তা ফলে পরিণত হইতে না হইতে, চারিদিক হইতে নবীন কণ্ঠের গীত-ধ্বনি শ্রুত হইল। এক স্থানের একখানি গৃহের একটী শিশুই যে

গাইল তাহা নহে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে বালক বালিকা মিলিতকণ্ঠে গান ধরিল :—"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে, মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে, আমাদের বাড়ীর পোকা মাকড় সব দূর যা।" কয়েক দিনের স্পন্দরহিত নীরবতার পর পুনঃ পুনঃ গাথার সুরে এই গীত-ধ্বনি শুনিয়া সহসা মনে হইল যেন, বিধাতা নূতন করিয়া সংসারের সৃষ্টি করিলেন, সহসা ইন্দ্রজাল-বলে কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে যেন অসংখ্য বালক বালিকা আনিয়া লোকশূন্য গ্রামবৃন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্রমে একটী দুটী বয়স্ক লোকের কণ্ঠরব শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহারা সন্তান-সুখে বঞ্চিত, এ স্বর তাহাদেরই। আমাদের কমলকুমারেরা দুটী ভাই বোনে গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যথাশক্তি উচ্চৈঃস্বরে এই বৎসরও নিয়ম রক্ষা করিল। কমলকুমার মুখে "আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে" ইত্যাদি বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার প্রাণটা আর একটা জিনিসের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, ক্ষুদ্র বালিকাও দাদার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া চিৎকার করিলেও তাগার প্রাণটাও অন্যত্র পড়িয়া আছে। দুই জনেরই ইচ্ছা, এই অপ্রিয় কাজটা শেষ হইলেই বাঁচে। একবারের পর আর একবার বলিতে যেন বিষম লাগিতেছে—গলা ধরিয়া আসিতেছে। জননী পশ্চাৎ হইতে রুদ্ধস্বরে বলিতেছেন "আর একটু চেঁচিয়ে বল্"। ছেলে মেয়ে দুজনেই মাকে খুব ভালবাসে, ভয়ও করে, কাজে কাজেই কিছু বলিতে পারিতেছে না, প্রাণপণে চেঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। জননী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নেত্রনীর মোচন করিতেছেন আর নিজ তনয় তনয়াকে উৎসাহ দিতেছেন। এই অপ্রিয় কার্য্যটী শেষ হইতে না হইতে, কমলকুমার নিজের অতি প্রিয় আকাশ-প্রদীপ নামাইতে গেল। পুঁটী একটী ছোট সাজিহাতে ফুল তুলিতে গেল।

কমলকুমার পাড়ার সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর করিয়া ফানস তৈয়ার করিয়াছে। খুব বড় ফানস, এক এক দিকে এক এক রকম রঙের কাপড়। পূর্ব্ব দিনের সন্ধ্যার সময়ে প্রথম আলো দেওয়া হইয়াছে। বহু যত্নে প্রস্তুত নূতন সুন্দর ফানস, সমস্ত রাত্রি আকাশে কেমন ছিল, দেখিবার জন্য বালক ব্যাকুল। শিশিরসিক্ত বহুবিধ কীটপতঙ্গ-পরিবেষ্টিত ফানস নামাইতে নামাইতে কতই আনন্দ! বালকের প্রাণের মধ্যে কি এক প্রফুল্লতা! পুঁটী যমপুখুর করিবে বলিয়া পূর্ব্ব দিন হইতে কত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে, ফুলের সাজি ফরসা

কাপড়ের আয়োজন করিয়াছে। পাড়ার কোন্ কোন্ মেয়ের সঙ্গে দল বাঁধিয়া কোন্ কোন্ গাছে ফুল তুলিবে, সন্ধ্যার সময়ে মায়ের সঙ্গে সে পরামর্শ করিয়াছে। পুঁটীর আর একটী মিষ্ট নাম আছে, সে নামে তাহাকে কেহই ডাকে না, সময়ে সময়ে তাতে তার খুব দুঃখ ও অভিমান হয়। কিন্তু তার ছোট ছোট প্রিয় সঙ্গিনীদের দুই একজন তাকে সেই বড় ভালবাসার নামে ডাকিবা মাত্র পুঁটী একবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে। পুঁটী সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর বাহির হইতে না হইতে দাসেদের নেড়ী আসিয়া ডাকিতেছে, "কমলা ও কমলা উঠেচিস্? শিগ্‌গির আয়না ভাই, এর পরে গেলে, গাছে কি আর ফুল থাক্‌বে"? কথা শেষ হ'তে নাহ'তে একগাল হাসি হাসিয়া কমলা বাহিরের দরজায় নেড়ীর দরবারে হাজির হইয়া বলিল, "ভাই অমলা! বল্‌ত আগে কাদের গাছে ফুল তুল্‌বি?" অমলা বলিল "চল্ রাণীকে ডাকিয়া আগে তাদের বাগানের গাছের টগর, অপরাজিতা ও গোলাপ ফুল তুলিয়া, পরে আমাদের বাড়ীর করুবী তুলে শিউলী ফুল কুড়াইলেই হইবে, কি বল্? কমলা তাতেই সম্মত হইয়া বিশ্বাস বাড়ীর ফুল বাগানের আগোড় খানি খুলিতে গেল, অমলা রাণীকে ডাকিতে গেল।
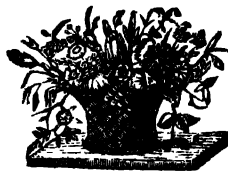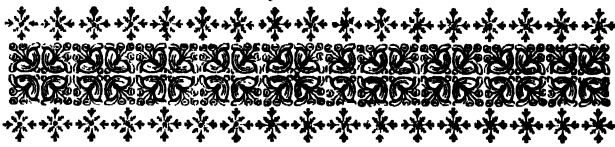
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কঠিন পরীক্ষায়।

কমলকুমার দশ বছরের ছেলে, কমলা সাড়ে সাত বছরের মেয়ে, আর কুমদকুমার পাঁচ পার হইয়া ছয়ে পড়িয়াছে মাত্র। রাঙ্গাবউ এই ক্ষুদ্র পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট সংসার-সাগরে কর্ণধারহীন এই ক্ষুদ্র গৃহ-ভেলায় কয়েকটী প্রাণী লইয়া ভাসিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী অন্য কোন তরণী-বাহী দয়া করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল ভালই, কিছু সাহায্য করিল ভালই, না করিলে তাহাতে রাঙ্গা বউএর অনুযোগ নাই, বিরক্তি নাই, অভিমান নাই। একাকিনী মরমে মরিয়া মরিয়া তরী বাহিয়া চলিয়াছেন। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। বিপদভঞ্জন হরির নাম করিতে করিতে, অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে,শরীরের শক্তিক্ষয় করিয়া দিনের পর দিন চলিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ও ধর্ম্মপরায়ণ সজ্জনের গৃহিণী বিপন্ন হইলে যেরূপে সকল ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যের পথে চলিলে ভাল দেখায়, রাঙ্গাবউ তাহাই করিতেছেন। এই ভাবে কার্ত্তিক মাসেরও অর্দ্ধেক অতীত প্রায়। সহসা একদিন সন্ধ্যার সময়ে কমলকুমারদের বাড়ীতে বড় সাধের "আকাশ-প্রদীপ" আর উঠিল না। ছোট ভাইটীর অসুখ খুব বাড়িয়াছে। মায়ের আদেশে কমলকুমার ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে। পাড়ার ২।১ জন স্ত্রীলোকের মনে এবং জননীরও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। আজ অপরাহ্নে ভয় ও ভাবনার ভারে জননীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি আজ তিন বৎসর কাল শরীর মন মাটী করিয়া সন্তান

কয়টীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। কিন্তু আজ তাঁহার মনে হইয়াছে যে, তাঁহার প্রাণের ধন একটী একটী করিয়া এমনই করিয়া কে কাড়িয়া লইবে। আজ হয়ত সর্ব্ব কনিষ্ঠটী ক্রোড় শূন্য করিয়া পলায়ন করে। থাকিয়া থাকিয়া যখনই এই চিন্তাটা এক একবার মনে উঠিতেছে, তখনই চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছেন। মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে। থেকে থেকে তিনি বসিয়া পড়িতেছেন। তবুও সাহসে ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে এবং ঘরের কাজগুলি শীঘ্র শীঘ্র সারিতে চেষ্টা করিতেছেন। মেয়েকে খেতে দিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, ছেলে এখনও ফিরিল না, ক্রমে ভাবনাও বাড়িতে লাগিল। ক্রমে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, তাঁহার ভাবনার তাড়না তাঁহার প্রাণের মর্ম্ম স্থানে দারুণ আঘাত করিতে লাগিল। ছেলের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার কি বাড়ী নাই? বেলা থাকৃতে ছেলে গেছে, অন্ধকার হ'য়ে গেল, এখনও ফিরিল না, একা আস্‌তে পথে বাছা আমার ভয় টয় না পায়। ক্রমশঃ ডাক্তারের আসার আশা ত্যাগ করিয়া কমলকুমারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, ঘরে যে আর কেউ নেই গা, একটা লোক ডাকৃতে হ'লে কি করবো। ভয় ও ভাবনা যখন তাঁহাকে দুদিক হইতে চাপিয়া ধরিল, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রবল বাত্যাবিতাড়িত তৃণখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কন্যাকে বলিলেন "মা! তুমি একবার ওপাড়ার ঠাকুরঝিকে (তোমার দিন পিসিমাকে) ডেকে আন। বলগে, মা একা খোকাকে নিয়ে বড় বিপাকে পড়েছেন, তোমাকে আজ আমাদের ঘরে থাকৃতে হবে"। তিনি জানিতেন গ্রামে অনেক লোক থাকিলেও, অনেকে আত্মীয়তা করিলেও, তাঁহার বিপদের সময় তাঁহার ঘরে রাত্রি যাপন করিতে সম্মত, এমন আর একজনও নাই। বলা বাহুল্য, কমলকুমারের জ্যাঠাইমা সে সময়ে বাড়ী ছিলেন না। পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। সংবাদ আসিয়াছে সেখানে তিনিও পীড়িত, বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প।

বালিকা মায়ের আদেশে অন্ধকারে পাড়ান্তরে গিয়া (দূর সম্পর্কীয়া) পিসিমাকে সংবাদ দিল। তাঁহার সে দিন খুব বিপদ। একমাত্র কন্যা জ্বরে ছটফট্ করিতেছে। বাড়ীতে অন্য যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অম্লানমুখে বলিয়া দিলেন "তোমার মাকে বলগে যে দিদির বড় অসুখ, সেই জন্য পিসি আস্‌তে পার্‌লেন

না।” এ কথায় পিসির মন উঠিল না। তিনি বলিলেন, রাঙ্গাবউ খুব সাবধান লোক, সে কি নাবুঝে আমায় খবর দিয়েছে, ওপাড়ায় এপাড়ায় এমন কেউ নেই যে একটু কষ্ট স্বীকার করে কাছে থাকে। সে একা, রাত্রিতে একটা বিপদ আপদ হলে কি উপায় হবে? পুঁটী তুই দাঁড়া, আমি আস্‌ছি। এই বলিয়া নিজ কন্যাকে গিয়া সমস্ত বলিলেন। মেয়ে বলিল “মা আমার নূতন জ্বর, তুমি না থাক্‌লে খুব কষ্ট হবে,কিন্তু তাই বলিয়া কি না যাওয়া ভাল? খুব বেশী বাড়াবাড়ী না হলে রাঙ্গামামী খবর দেবার লোক নন। তুমি যাও, আমি বুড়িকে কাছে নিয়ে কোন রকমে রাত কাট্‌য়ে দেবোকোন। মা তুমি যাও, আর একটুও দেরি করো না”। কন্যার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাড়ীর সকলকে বলিয়া তিনি শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বাহির হইলেন। আসিয়া দেখিলেন বিপদ খুব ভয়ানকই বটে। রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ।

সন্ধ্যা হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কমলকুমার একাকী ফিরিল। আসিয়া বলিল ডাক্তার বাবু অনেক দূরে গিয়েছিলেন। এই মাত্র বাড়ী আসিলেন। পথে বাজারের ওধারে বটতলায় ভুতের ভয় আছে, তাই আমি পড়ি ত মরি সমস্ত পথ ছুটিয়া আসিয়াছি। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, আজ আর আমি যাইব না, যে ওসুধ আছে তাই খাওয়াও গে। কাল সকালে আমাকে সংবাদ দিও। আমি যাইব।
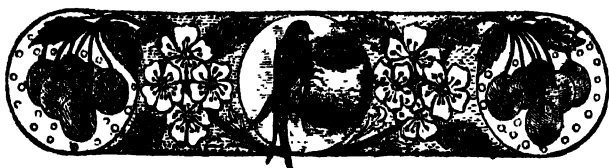
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রামপ্রান্তে—শ্মশানে।

পর দিন প্রাতঃকালে ডাক্তারকে আর সংবাদ দিবার প্রয়োজন হইল না। কালরাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বালক কুমুদকুমারের দুঃখ ও যাতনাময় জীবন-সংগ্রামেরও বিরাম হইয়াছে। অনাথিনী দুঃখিনী জননী বালকের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া হাহাকার করিতেছেন। রাত্রির সঙ্গিনী প্রাতঃকালে তাঁহার একমাত্র কন্যার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই পুত্রশোকাতুরা বিধবার পরিচর্য্যা করিতে পারিলেন না। যাইবার সময়ে দুটা মিষ্ট কথায় শান্ত করিবারও অবসর পাইলেন না। এই অবস্থায় প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নে পরিণত হইল। বালকের মৃতদেহের সৎকারের কোন আয়োজন হইল না। কারণ আয়োজন করিবার কেহ নাই। বেলা আড়াই প্রহর হইয়া যায়, বালক বালিকার মুখে এক ফোটা জল পড়িল না। বৃহৎ গ্রাম। গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকেরও অভাব নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে রামেশ্বরের লোকান্তর গমনের সময় ঐ গৃহ-প্রাঙ্গণে লোক ধরে নাই, আজ সেই গৃহে বিপন্না বিধবার মৃত পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবার লোক পাওয়া গেল না। আড়াই প্রহর অতীত হইতে যায়, বালক বালিকার মুখে এক বিন্দু জল পড়িল না। কেহ একটীবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না। একবার দূর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাঙ্গাবউএর গলা ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে—অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আর কাঁদিতেও পারেন না। পাড়ার একজন স্ত্রীলোক দয়া করিয়া বেলা একটার পর কমলকুমারদের গৃহ-প্রাঙ্গণে দেখা দিলেন। গৃহিণীর শোক-সাগর উথলিয়া উঠিল। বক্ষে করাঘাত করিয়া ভগ্নকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কমলকুমার বালক, কিন্তু পৈতৃক গুণে সে লোকের দয়া মায়া ও অনুগ্রহের উপর কখন নির্ভর না করিলেও, অবিশ্বাস করিতে শিখে নাই। তাঁই আজ গ্রামবাসিগণের আচরণে—যাহাদিগকে চির-প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাহাদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছে। সে বালক, সে গ্রামে মানুষ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে বুঝি বা মাকে এই ভাবে খোকাকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দিনের পর দিন কাটাইতে হয়। বেলা গেল, কিন্তু মা এমন করিয়া রাত্রিতে উঠানে কি করিয়া বসিয়া থাকিবেন? অল্প বয়স হইলেও বিপদে বিপদে বালককে বিজ্ঞ করিয়াছে,আজ তাহার সেই বিজ্ঞতার জ্ঞান আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে দুইবার দক্ষিণের বাড়ীর ছোট ঠাকুরদাদার নিকট গিয়া মায়ের এই বিপদের কথা বলিয়াছে, তিনিই এখন গ্রামের কর্ত্তা। কর্ত্তার যাহা করা উচিত, তিনি তাহা করিলেন না। বালক আর কাহারও নিকট যাইতে সাহস করিল না। যে স্ত্রীলোক আসিলেন তিনি দাসেদের বাড়ীর মোহিনী। তিনি আসিয়া বলিলেন "এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফিরিবে?" রাঙ্গাবউ বলিলেন "আজ আমার চারিদিক অন্ধকার,আমার কি কেউ আছে যে দেখ্‌বে? তাহলে কি এখনও এমন করে বসে থাক্‌তে হতো? তা হোক হোক, আমার বাছা যতক্ষণ আমার কাছে থাকে ততক্ষণই ভাল।" এই বলিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন।

মোহিনী কমলকুমারকে বাড়ীর বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন "দেখ্‌ এক কাজ কর্‌, তুই পাগ্‌লা তিনকড়েকে চিনিস্‌ তো? যা শিগ্‌গির বাজারে গিয়ে তাঁকে খুঁজে নিয়ে আয়—যা, দৌড়ে যা। আমাদের ছোট কর্ত্তার নাম করে ডাক্‌বি, তারপর আমি সব করে দেবোকোন্‌।

কমলকুমার বাজারের গুলির আড্ডায় গিয়া তিনকড়ে পাগ্‌লার দেখা পাইল। তাহাকে দাসেদের বাড়ীর ছোট কর্ত্তার নাম করিয়া ডাকিবামাত্র সঙ্গে আসিল। আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র কর্ত্তার বিধবা ভগ্নী মোহিনী অগ্রসর

হইয়া তাহাকে বলিলেন "তিনকড়ি! বড় দরকারে পড়িয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, একটু উপকার করিতে হইবে।"

তিনকড়ি। বুঝেছি, কেউ মরেছে। কোথায় ফেল্‌তে হবে বল। বেশী দেরি হলে চল্‌বে না, আমার নেশা ছুটে যাবে।

মোহিনী। এরই ছোট ভাইটী মারা গেছে। ছোট ছেলে। বেশী কষ্ট হবে না, বেশী বিলম্বও হবে না। আমার সঙ্গে এস।

তিনকড়ি। বলি, বাজারের ধারে বড় পুখুরের পাড়ে পোতা চল্‌বে তো? ক বছরের ছেলে?

মোহিনী। সে সব জানি না বাপু, তুমি এস, নিয়ে গিয়ে যে রকমে হয় এক রকমে কাজ সেরে দাওগে।

তিনকড়ি কমলকুমারদের উঠানে আসিয়া হাজির হইল। পাঁচ বছরের ছেলে দেখে সে ফিরে দাঁড়াল, বলে বস্‌লো এ আমি একা পার্‌বো না। আরও লোক চাই। মোহিনী অনেক করিয়া বুঝাইয়া সম্মত করিলেন। শেষে বলিল "আমি দুটী টাকা না পেলে এ কাজ করিতে পারিব না"। মোহিনী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া, অনেক স্তব স্তুতি ও কাকুতি মিনতি করিয়া শেষে এক টাকায় সম্মত করিলেন। একটী টাকা দিয়া যেমন যেমন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া কমলকুমারকে সঙ্গে দিলেন। কমলকুমার এক বিন্দু আগুন ও আনুসঙ্গিক সামান্য আয়োজন লইয়া তিনকড়ির সঙ্গে সঙ্গে যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইল, তখন বেলা প্রায় চারিটা। গ্রাম-প্রান্তে পথের ধারে নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায় লোকেরা যেখানে মৃতদেহ ফেলিয়া দেয়, তিনকড়ি সেই পথে চলিল। কমলকুমার সঙ্গে যাইতেছে মাত্র, তাহার কোন কথাই পাগ্‌লা শুন্‌বে না। সে তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, কমলকুমারকে তাহারই হুকুম পালন করিতে হইবে। জনশূন্য পথে, দরিদ্রের শ্মশানাভিমুখে চলিতে চলিতে তিনকড়ি বলিল "ও ঠাকুর আরতো আমি পারিনা, এই খানেই রেখে যাই বলিয়া অর্দ্ধ পথে মৃতদেহ নামাইল। কমলকুমার বড় বিপদ দেখিয়া তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন তিনকড়ি বলিল, "ঠাকুর দেখ্‌ছো না, সন্ধ্যা হয়ে এল, এখন কি আর সেই শ্মশানে তুমি আর আমি দুজনে যেতে পারি? সন্ধ্যার সময় সেখানে দলে দলে ভূত বেড়ায়।

গেলেই প্রাণটী রেখে ঘরে ফির্‌তে হবে। তুমি ছেলে মানুষ, তাতে মায়ের এক ছেলে, বাড়ী যাও, আমি একা যা হয় করিব, তোমার থেকে কা'জ নেই"। কমলকুমার কাঁদিতে লাগিল, তিনকড়ির কথায় ভয় পাইল না, কোন মতেই এক পা সরিল না। তখন তিনকড়ি নিজেই ফেলিয়া সরিবার চেষ্টা করিল। যখন সে কমলকুমারকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া পালাইতেছে, তখন দাসেদের মোহিনীর সহিত পথে দেখা হইল। তিনকড়ির আর উত্তর নাই। মোহিনী বলিলেন, তুই বাচ্ছা ছেলেকে মড়ার কাছে বসিয়ে রেখে পালাচ্চিস্? এমন কাজ করিস নে, শেষে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। আইন আদালত আছে, ছোট কর্ত্তাও আছে, আমি তোকে অম্নে ছাড়্বো না। তুই আমার কথা শোন। ঠিক যেমন বলিয়া দিয়াছি সেই মত কাজ করে চলে যা, তা না করলে আমি তোকে জব্দ করবো। তিনকড়ি অনন্যগতি হইয়া আবার ফিরিল, ফিরিয়া গিয়া দেখে বড় ভাই ছোট ভায়ের মৃতদেহ কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। অসহায় নিরুপায় দশমবর্ষীয় বালক পথের ধারে পঞ্চমবর্ষীয় কনিষ্ঠ সহোদরের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতেছে, এ দৃশ্যে পাষাণও বিগলিত হয়, তাই তিনকড়িরও কঠোর হৃদয় কোমল হইল—তাহার প্রাণে একটু দয়া হইল, করুণার্দ্রস্বরে বলিল "চল ঠাকুর তোমার কাজ সেরে দিয়েই যাই।"

মোহিনী জানিতেন যে তিনকড়ি ফেলে পালাবে, তাই রাঙ্গাবউকে স্নানের ঘাটে পাঠাইয়া দিয়া তিনি একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেলেন যে তিনকড়ি কি করে। তাঁহার সন্দেহ ঠিক, তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনকড়ি বহু কষ্টে যথাস্থানে পৌঁছিল। তখন গাছের আগায় রৌদ্রের আভামাত্র আছে। সে একটু বিশ্রাম করিয়া মৃতদেহের পরিমাণ একটা কূপ খনন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর শীর্ণ, তাদৃশ কার্য্যের উপযোগী শক্তি তাহার ছিল না। সে বলিল ঠাকুর আমি ইহার বেশী আর পারিব না। এক টাকার জন্যে আজ প্রাণটা গেল। বৈঠক ছেড়ে উঠে এসে কি কুকর্ম্মই করিছি। চাড়ুর্য্যেমশাইয়ের পাকা পেঁপের চাট্‌টাও ফস্‌কাল, কষ্টের শেষ নাই। এই বলিয়া তিনকড়ি একটু আগুন জালিয়া কমলকুমারের হাতে দিয়া বলিল "নাও তোমার ভায়ের মুখাগ্নি কর।" কমলকুমার পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে "মুখাগ্নি" ব্যাপারটা কি শিখিয়াছিল। কিন্তু আজ বালক

প্রজ্বালিত অগ্নি হস্তে লইয়া ছোট ভাইটীর শুষ্ক ও বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিল। তিনকড়ি ধমক দিয়া বলিল "ঠাকুর আগুন নিবে যায় যে,কি কর, শিগ্‌গির মুখে দাও না। ২।৩ টা ধমক দিয়া তিনকড়ি বালককে কোনমতেই অগ্রসর করাইতে পারিল না। শেষে রাগ করিয়া থাবড়া মারিতে উদ্যত। তখন কমলকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে সেই যে—সেই কি একটা কি করিল! চিরজীবনের জন্য সে ঘটনা তাহার স্মৃতিপথে বিদ্যমান!! বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে,কত শত শত ঘটনা—কত ক্ষুদ্র বৃহৎ সুখ দুঃখ—কত আপদ বিপদ জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গেল, সে সকলের অধিকাংশই বিস্মৃতির আবরণে আবৃত, কতক বা স্মরণপথের সঙ্গী হইয়া রহিল, কিন্তু কমলকুমারের ছোট ভাই কুমদকুমারের মৃত্যু, গ্রামের লোকের নির্ম্মম ব্যবহার, তিনকড়ির শববহন, শ্মশানের অত্যাচার, সর্ব্বোপরি ছোট ভাইয়ের সেই রোগক্লিষ্ট ও চিরনিদ্রিত মুখখানিও অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তদুপরি অগ্নিদান সকল সময়ে—সকল অবস্থায়—সকল ঘটনার মধ্যে—মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। যখনই মনে হয়, তখনই যেন অদ্যকার ঘটনা বলিয়া সংশয় জন্মায়—আর অমনই কমলকুমারের চক্ষুদুটী জলে ভাসিয়া যায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুত্র কন্যা পরগৃহে।

শোক সন্তাপ ও দুঃখ বিপদের মধ্য দিয়া প্রায় বৎসরাধিককাল অতীত হইল, এমন সময়ে রাঙ্গাবউ পুত্রের উপনয়ন ও কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সম্মুখে বৈশাখ মাসে উপনয়ন ও বিবাহের উত্তম দিন আছে। অগ্রে কমলার বিবাহ দিলেন, পরে পুত্রের উপনয়ন হইল। এই উভয় অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ ব্যয় হইলেও কমলকুমারের যত্ন ও পরিশ্রমে বিত্তসম্পত্তির আয় হইতে কায়ক্লেশে তাহার সঙ্কুলান হইল। কমলার সুন্দর বর হইল। বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি বা প্রতিপত্তি না থাকিলেও বরের বংশমর্য্যাদা ও অন্ন বস্ত্রের সংস্থান আছে। বর দেখিতে সুপুরুষ। অতি সামান্য ইংরাজী ও অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক বাঙ্গালা জানা আছে। বরের গান বাজনায় বিশেষ অনুরাগ আছে, দেখিতে যেমন সুপুরুষ তেমনি সুস্বরের লহরী তুলিয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিতে পারেন। অধ্যাপক পত্নী রাঙ্গাবউ এই কুলশীলসম্পন্ন, সচ্ছল ও সজ্জনের করে কন্যা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হইলেন। কমলার শ্বশুরবাড়ী গ্রামান্তর মাত্র, প্রয়োজন হইলেই যাতায়াত চলে। কমলকুমারের উপনয়নের দিন নূতন জামাতা উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন। গ্রামের মধ্যে কমলকুমার ও তাহার জননীর প্রতিষ্ঠা আবার এক

রেণু বৃদ্ধি পাইল। আজ গ্রামের সকলেই আসিয়াছে, এবং আত্মীয়তাও করিতেছে। সংসারের স্বার্থপর মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। যে অসহায় ও বিপন্ন, দুর্দ্দিনে তাহার সংবাদ লইতে অতি অল্প লোকই অগ্রসর! ধনবান ও লোক-বলে পুষ্ট ব্যক্তির সহকারিতা করিতে সকলেই লালায়িত। মানুষের এই দারুণ দুর্ব্বলতা প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। বিনাপ্রয়োজনে সবলের আনুগত্য স্বীকার, ও দুর্ব্বলের সহকারিতায় পশ্চাদপদতার পরিচয় পাইয়া বালক কমলকুমার বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিতে না করিতে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও দুর্ব্বল হস্ত পদের উপর নির্ভর করিতে শিখিতেছে। কমলকুমারের জননীর মাতুলালয় পাড়ান্তর মাত্র হইলেও অসময়ে তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্তি এক প্রকার অসম্ভব ছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে এই উভয় পরিবারের মধ্যে কিঞ্চিৎ গাঢ় মনোমালিন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কন্যার বিবাহের সময়ে রাঙ্গাবউ মাতুল-পৌত্রের সহিত মনোবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। নিজে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তা-বৃদ্ধি গ্রামের মধ্যে কাহারও কাহারও চক্ষুশূল হইল। এরূপ পরশ্রীকাতর লোকের সংখ্যা সংসারে নিতান্ত অল্প নহে। সংসারের অকারণ অশান্তি বৃদ্ধি এই শ্রেণীর লোক দ্বারাই হইয়া থাকে! ইহারা এই উভয় পরিবার মধ্যে পুরাতন অনাত্মীয়তার জের ধরিয়া নূতন অশান্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু রাঙ্গাবউ আশৈশব শিক্ষা ও কার্য্যকুশলতা গুণে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম—এবং যখন যে কাজ করেন, তাহার পূর্ব্বাপর ফলাফল স্থির করিয়া তবে সে কার্য্যে অগ্রসর হন। সেই জন্য পরের কথায় তাঁহার বড় বেশী আসে যায় না।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গত হইল। রাঙ্গাবউ আষাঢ়ের প্রথমেই সহসা একদিন পুত্র কন্যা ও প্রতিবেশীমণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার ডোর পড়িয়াছে, মহাপ্রভুদর্শনে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাইবেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প ত্যাগ করাইতে আত্মীয়স্বজন সকলেই চেষ্টা করিল। জামাতা আসিয়া অনেক বুঝাইল, কিন্তু বিফল হইল। পুত্র কন্যার ক্রন্দন ও কাতরতা পরাজয় মানিল। তিনি পাণ্ডাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন—যাওয়া স্থির করিয়াছেন। যাওয়ার দিনস্থির হইয়াছে। টাকাকড়ির

সংস্থান করিয়াছেন। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইলেন। পুত্রকে নিজের মাতুলালয়ে রাখিয়া গেলেন। কমলকুমার সর্ব্বদা ভগ্নীকে দেখিয়া আসে। অনুরুদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে ২।১ দিন সেখানে বাসও করে। কমলার শ্বশুরালয় তখনও নূতন, আদর যত্নের অভাব না হইলেও, তখনও সে বাড়ী তাহার পক্ষে পরের বাড়ী। কমলা ভাবিত মা আর ফিরিবে না। সংসারে দাদাই আমার আপনার জন। কমলকুমার ভাবিত, মা আর আসিবেন না। পরগৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত ভগ্নী ভিন্ন সংসারে ঠিক আমার বলিবার আর কেহ নাই। এই অবস্থায় ভাই বোনের মধ্যে ভালবাসার মাত্রা আরও একটু গাঢ় ও দৃঢ় হইয়া আসিল। আষাঢ়ের শেষে রথ-যাত্রা ও পুনর্যাত্রা হইয়া গেল। একদিন দুদিন করিয়া শ্রাবণেরও অর্দ্ধেকের অধিক গতপ্রায়, এমন সময়ে একদিন অপরাহ্ণে কমলকুমার অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিতেছে—তাহার মা যেন ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিদ্রিত মুখখানি অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহ বিগলিত হৃদয়ে নতজানু হইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! সুখের নিদ্রায়—সুখের স্বপ্ন—এই মুখ-চুম্বনের কল্পনা ভাঙ্গিয়া গেল! বালক তাকাইয়া দেখিল তাহার মা ক্লান্ত কলেবরে—অসমর্থ পাদবিক্ষেপে—ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ পার হইয়া পুত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এও কি স্বপ্ন? না—না—মা কি স্বপ্ন? না, সত্যই মা আসিয়াছেন। জননীকে দেখিয়া বালকের ক্ষুদ্র প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠিল। রাঙ্গাবউ মহাপ্রভুর পূজার নির্ম্মাল্য ফুল আনিয়াছিলেন পুত্রের মাথায় রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে মুখ-চুম্বন করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া অশ্রু-জলে ভাসিতে ভাসিতে ছেলে মেয়ের সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মাকে দেখিয়া বালকের এত আনন্দ হইয়াছে যে, একা সে আনন্দ সম্ভোগ তাহার ভাল লাগিতেছে না। সে আর মায়ের কোলে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না। তাহার ইচ্ছা হইতেছে এক দৌড়ে গিয়া পুঁটীকে ডাকিয়া আনে। আর বাড়ীর ও পাড়ার সকলকে ডাকিবার জন্য বালক ছট ফট্ করিতেছে। ২।১ কথার উত্তর দিতে দিতে কমলকুমার উঠিয়া দৌড়িল—পাড়ার মহিলা-বৈঠকে কমলকুমার (জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ) বউ ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিল, ঘুমন্ত কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি শাশুড়ীর অভ্যর্থনার জন্য গৃহে ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে আসিল,

বধূ আসিয়া শাশুড়ীর পদধূলি লইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ২।১ কথার উত্তর দিতে না দিতে পাড়ার সমস্ত স্ত্রীলোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, কথার উপর কথা, জবাবের উপর জবাব, ক্রমে উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। গোলমালে খুকি জাগিয়া উঠিল। কমলকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া রাঙ্গাবউকে দেখাইয়া আধ আধ মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিল, কাকা—কাকা—এ কে? কমলকুমার বলিল, তোমার ঠাকুরমা—আমার মা। বালিকা বলিল, আমাল ঠাকুলমা! তোমাল মা!! তোমাল আবাল মা কে? ক্ষুদ্র বালিকার মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই অবাক—সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেছে। কমলকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল কেন, আমার কি আর দুটা মা হতে নেই? খুকি বলিল, না তা হবে না। আমি একা মা হবো। রাঙ্গাবউ দুই মাস সময়ের মধ্যে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যার মধ্যে এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। পুত্রের ক্রোড় হইতে বালিকাকে লইলেন—স্নেহভরে বার বার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। বহু যত্নে রক্ষিত মহাপ্রসাদের পুঁটলি খুলিয়া সর্ব্বাগ্রে বালিকার মুখে ও হাতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুষ্প-কলিকায়।

রাঙ্গাবউ শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন সত্য, পুত্রকে লইয়া নিজ গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন সত্য, কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁহার সে পূর্ব্বের অনুরাগ আর নাই—শরীরেও সে শক্তি নাই। শতবিধ বিপদের মধ্যেও তাঁহার শরীরের যে সৌন্দর্য্য ও মুখের যে প্রফুল্লতা ছিল, তাহা আর নাই, কে যেন চিরতরে তাহা হরণ করিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার পর, মা ছেলেকে বলিলেন— বাবা আমারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, মেয়েটাকে এক ভদ্র লোকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি, বড় সাধ ছিল তোমাকেও সংসারে স্থায়ী করিয়া যাইব, কিন্তু তাহা হইল না, আমার শরীর মন দুই একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া পুত্রের প্রাণে যে ভয়ের সঞ্চার হইল, আর কখনও তাহা হয় নাই। ভয়ে বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না। প্রদীপের নিকটে মায়ের সম্মুখে বসিয়া শূন্য নেত্রে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল—ভয়ে চক্ষের জল চক্ষেই লুকায়িত হইল। মা বলিতে লাগিলেন—বাবা ক্ষেত্রের পথের ক্লেশ, খাওয়াদাওয়ার অভাব ও পাণ্ডাদের অত্যাচারে মানুষ মর মর হইয়া পড়ে, তাহার পর ফিরিবার সময়ে লোনা লাগিয়া ও বর্ষায় ভিজিয়া প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক লোক পথেই মরিয়া যায়। যারা মরে, তাদের মুখে একবিন্দু জলও কেউ দেয় না। ঐরূপ রোগীর সেবার জন্য যদি কেউ বিলম্ব করিল, তবে সে দল ছাড়া হইয়া একাকী পথের পথিক হইল, তাহার আর

বাঁচিবার বা ফিরিবার আশা রহিল না। আমিও মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছি, বোধ হয় তোদের দুটাকে চোখের দেখা দেখিবার জন্যই ফিরিয়া আসিয়াছি। কমলকুমারের শেষ কথা—"মা আমাদের আর কেউ নেই যে।"

কমলকুমারের লেখাপড়া কিছুই হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ দুইটী। প্রথম কারণ, নিজের এবং জননীর উদরান্নের জন্য সর্ব্বদাই নিকটস্থ ও দূরস্থ প্রজাপুঞ্জের বাটী একবারের স্থলে দশবার যাইতে হয়; অপর কারণ, এক-দিকে নানা প্রকার বিপৎপাতে বিদ্যালয়ের সহিত একবার সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় নাই। গ্রামের সমবয়স্কদিগের অনে-কেই বিদ্যালয়বিমুখ। অতি অল্প দিনের মধ্যে অনেকেই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। যাহা সহজ, সংসারের লোক সর্ব্বাগ্রে তাহাই করে—বালকের পক্ষে আবার তাহা অধিকতর স্বাভাবিক। সহজ পথে চলিতে পাইলে কষ্টকর পথে কে যায়? গুরুতর প্রয়োজনে—অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য্য হইলেই, কেবল মানুষ অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হয়। এক দিকে কমলকুমারের এখনও সেরূপ কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই, অপর দিকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়া তাহাকে সেই পথে চালাইবার লোকও কেহ নাই। যিনি ছিলেন, তিনি বহুপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন, রামেশ্বরের লোকান্তরের পর বালকের আর বিদ্যালয় প্রবেশ ঘটে নাই। বাধা বিঘ্নও অনেক ঘটিয়াছে। ছোট ভাইটী গেল, তাহার অল্প দিন পরে জেঠাইমারও গঙ্গালাভ হয়। লেখাপড়ার যে সম্ভাবনাটুকু ছিল, জননীর শ্রীক্ষেত্র যাত্রাতেই সেটুকু একবারে ফুরাইয়াছে। কমলকুমারের মা জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া একবারে উদাসীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। বালক এখন ইচ্ছামত আহার বিহার করিয়া মনের সুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। এমন সময়ে একদিন কমলকুমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ গ্রাম হইতে পূর্ব্ব দিকে চৌদ্দ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক আত্মীয়ের গৃহে একাকী গমন করিল। গ্রামের নাম শ্রীধরপুর, যাঁহার গৃহে গমন করিল তিনি কমলকুমারের বৃদ্ধ প্রপিতামহের সহোদরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, সুতরাং সম্পর্কে কমলকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন। তাঁহার পিতা ঐ গ্রামে বিবাহ করিয়া বাস করেন। গৃহকর্ত্তা চন্দ্রনাথ মাতামহের প্রচুর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া ঐ গ্রামেই বাস করিতেছেন। পৈতৃক বাসস্থান একপ্রকার পরিত্যক্ত।

কমলকুমারের মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি ঐ অঞ্চলে আছে, জননীর আদেশ আছে যে সুবিধা হইলে তাহার সংবাদ লইতে হইবে। দাদাকে বলিয়া যদি তাহার কোন উপায় হয়, সেই চেষ্টা করা এ যাত্রার উপলক্ষ।

কমলকুমার একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া গত শ্রাবণে দ্বাদশে পদার্পণ করিয়াছে। বালক শীতাতপে ও বিবিধ দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিত হইলেও দেখিতে সুন্দর, রংটুকু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণেরও উপরে যায়—মুখখানিতে কেমন একটু মাধুর্য্য আছে যে, যে দেখে সেই ভালবাসে। ক্লান্ত শরীরে পথের ধারে বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে দেখিলেও বোধ হয় যেন কোন সচ্ছল ও সুখপূর্ণ সংসারের স্নেহ মমতায় লালিত পালিত। বালককে একবার দেখিলে—আরবার দেখিতে—তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়—তাকাইয়া—তাকাইয়া ক্লান্তি বোধ হয় না। শেষে ইচ্ছা হয় "হউক পরের ছেলে, ঘরে নিয়ে যাই।"

চন্দ্রনাথ ভঙ্গ কুলীন—কিন্তু কমলকুমারের অপেক্ষা বড় কুলীন। কমলকুমার স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র, আর তার দাদা চন্দ্রনাথ স্বকৃতভঙ্গের পুত্র। কমলকুমার আশ্বিনের শেষে শ্রীধরপুরে ভ্রাতার গৃহে আসিয়াছে, কার্ত্তিক মাস চলিয়া গিয়াছে, অগ্রহায়ণেরও অর্দ্ধেক অতীত প্রায়, এখনও বিষয় সম্পত্তির বিশেষ কোন সংবাদ লওয়া হয় নাই। কিন্তু আর এক নূতন সম্পত্তি পাইবার সুযোগ হইয়াছে। চন্দ্রনাথের মাতামহবংশ লোপ পাইতে বসিয়াছে। মাতামহের বৃদ্ধ সহোদর গঙ্গাধর এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু গঙ্গাধরের একমাত্র পুত্র এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত। গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠের দৌহিত্র চন্দ্রনাথ অর্দ্ধেক বিষয় ভোগ করিতেছেন। অপরার্দ্ধ ঐ বালিকার প্রাপ্য। কমলকুমারকে দেখিয়া বালিকার মায়ের বড় সাধ হইয়াছে যে ঐ ছেলেটীকে এখন হইতে হস্তগত করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া উহাকেই কন্যা দান করেন। গঙ্গাধরের সংসারে নবীনা বিধবা পুত্রবধূ ও বালিকা পৌত্রী ভিন্ন আর কেহ নাই। গঙ্গাধর কমল-কুমারের পিতার মান সম্ভ্রম বিষয়ে বিশেষ অবগত ছিলেন। ছেলেটী কুলে শীলে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। দেখিয়া পছন্দও হইয়াছে, পুত্রবধূর আগ্রহে ইচ্ছাও যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে যেন স্পষ্ট কথায় সায় দিতে পারিতেছেন না। ভেবে চিন্তে দেখিতে একদিন দুদিন করিয়া অনেক সময় গত হইতেছে। গঙ্গাধর ও চন্দ্রনাথ পৃথক বাড়ীতে বাস করিলেও সে এক

বাড়ী। চন্দ্রনাথের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং গঙ্গাধরের বালিকা পৌত্রী সুন্দরী একত্রে ধূলা খেলায় ও অকারণ প্রিয় ও অপ্রিয় সজ্ঘটনে নিয়ত নিযুক্ত। আনন্দে সকলে মিলিয়া হাসিয়া আটখানা, আবার কলহে ও নিরানন্দে সকলেই বিমর্ষ ও অশ্রুসিক্ত। কমলকুমার এই অল্প সময় মধ্যেই সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশেষ ভাবে ঐ পিতৃহীনা বালিকার প্রতি তাহার প্রাণের অকপট প্রীতির ডোর পড়িয়াছে, সে তাহাকে ভালবাসিতে—আদর করিতে—সোহাগ দেখাইতে—কলহে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে এবং প্রয়োজন হইলে তীব্র মিষ্ট তিরস্কারে সাবধান ও শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুন্দরীর বয়স আট বছর চলিতেছে,সে স্বভাবতঃই ধীর ও মিষ্টভাষী,,কিন্তু ফুটফুটে জ্যোৎস্না—গলা সোণা—কিংবা কাঁচা হলুদের মত বর্ণ নহে। সুন্দরীর রং কমলার মতও নহে, আধপাকা কাগ্‌চি লেবুর মত। সুন্দরী শ্যামাঙ্গীও নহে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণাও নহে, উভয়ের মাঝামাঝি। কিন্তু সুন্দরী সত্য সত্যই সুন্দরী। সে কিসে সুন্দরী, তাই বলিতেছি। সুন্দরীর মুখে কমনীয়তা আছে, বিধাতার লিপি চাতুরীর পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই কোমল কমনীয়তা ও বিধাতার সেই লিপি-নৈপুণ্যের মধ্যে একটা বিশেষত্ব—একটা কমনীয়তামাখা ব্যক্তিত্ব—একটা প্রাধান্যের ভাব সুন্দরীর চখে, মুখে, ললাটে—সর্ব্বাঙ্গে যেন ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। এখনও সে বালিকা—কলিকায় তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যাইতেছে, আর তিন চারি বৎসর পরে সে স্ফুটোন্মুখ পুষ্পকোরকে এই অস্ফুটস্ত প্রতিভা ফুট ফুট হইবে, পরে পূর্ণ বিকাশে তাহার জন্মস্থান বা তাহার ভাবী বিচরণ ক্ষেত্র বিচিত্র শোভায় শোভিত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একটা প্রাণ দুই ভাগে।

মাঘ মাস পড়িল। কমলকুমার এখনও শ্রীধরপুরে চন্দ্রনাথের বাটীতে আছে। বিষয় সম্পত্তির কিঞ্চিৎ সন্ধানও হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া পর-করকবলিত সম্পত্তির উদ্ধার সাধন বালকের কর্ম্ম নহে। চন্দ্রনাথ সম্পন্ন ও সম্মানিত লোক, তাঁহারই চেষ্টায় কিছু টাকা আদায় হইয়াছে। আরও কিছু পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাই বালক দুই একদিন করিয়া বহু বিলম্ব করিয়া ফেলিতেছে। বিলম্বের পরিমাণ কমলকুমার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। তবে একএকবার যখন জননীর জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠে, তখনই কেবল বাড়ীপানে মনটা ছুটাছুটী করে। ইচ্ছা হয় একবার দেখিয়া আসে, মা কি করিতেছেন, কিন্তু মাকে দেখিবার এই আকাঙ্ক্ষাটা আজ তিন চারি দিন কিছু বেশী হইয়াছে,সঙ্গে সঙ্গে কমলকুমারের স্বাভাবিক ভাব—সে ক্রীড়াপ্রিয়তা—সে আনন্দ—সে স্ফূর্ত্তি—সে নিত্য নূতন খেলার সৃষ্টি আজ কাল আর নাই। সঙ্গীরা সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে—কিন্তু সুন্দরী কিছু বেশী বুঝিয়াছে; তাহার শৈশব-প্রাণে কিছু লাগিয়াছে—সেও সঙ্গে সঙ্গে ভার ভার—কেমন খাপ-ছাড়া হইয়াছে, হইয়াছে বটে কিন্তু লুকাইবারও চেষ্টা করিতেছে। মা জানিতে পারিলে কি বলিবেন? ঠাকুরদাদা শুনিলে রাগ করিবেন। তাই ভয়ে ভয়ে সাবধান হইয়া চলিতেছে। বেলা দ্বিপ্রহরের পর কমলকুমার বিষণ্ণচিত্তে খিড়কির বাগানে পুষ্করিণী-পার্শ্বে বৃক্ষতলে একাকী বসিয়া আছে। বাগানটী

বৃহৎ,উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ—উত্তর সীমা বহুদূরে ইছামতী তীরে শেষ হইয়াছে। সুন্দরী তাহার মায়ের সঙ্গে পুখুরের ঘাটে আসিয়াছে। উত্তরে দূরে দৃষ্টিপাত করিলে বৃক্ষতলে কমলকুমারকে দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরী দেখিয়াছে,দেখিয়া মাকে বলিল মা—মা—দেখ, দেখ,কে বসে আছে! জননী তাকাইয়া দেখিলেন, দেখিলেন কমলকুমার একাকী চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। সে মা ও মেয়ের পুষ্করিণী-ঘাটে অবতরণ ও কথাবার্ত্তার কিছুই জানিতে পারে নাই। সুন্দরীর মা সুন্দরীকে বলিলেন, যা, কমলকে ডেকে নিয়ে আয়। সুন্দরী মায়ের আদেশ পাইবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিল। পড়ে ত মরে—উর্দ্ধশ্বাসে কমলকুমারের দিকে ছুটিল। পাদসংঘর্ষণজাত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে কমলকুমার শব্দসঙ্কেতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল বনবিহারিণী বালিকা সুন্দরী বিষাদ রাশি পশ্চাতে লুকাইয়া—মৃদু মধুর হাসির আবরণে দুঃখ রাশি ঢাকিয়া—পল্লীগ্রামের বনভূমি ঈষৎ হাসিতে—মন্দমধুর প্রফুল্লতাতে—উজ্জ্বল করিয়া কমলকুমারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বালক দেখিল বালিকা যেন পৃথিবীর ঘন অন্ধকারে বিজলী-লীলা! সে দৌড়িতেছে আর তাহার চারিদিকে যেন শোভা, প্রীতি ও প্রফুল্লতার কণা সকল ছড়াইয়া পড়িতেছে। বালিকা নিকটে আসিতে না আসিতে বালক আপনার দুঃখ-চিন্তা ভুলিয়া গেল—হাসিমুখে সুন্দরীকে বলিল কেন, এত দৌড়াদৌড়ি কেন, ভয় পেয়েছ? সুন্দরী বলিল, ভয় কিসের? ঘাটে মা আছেন, এখানে তুমি রয়েছ, ভয় পাব কেন? কমল বলিল, তবে অত দৌড়ে কেন? বালিকা বলিল, মা তোমাকে একা বসে থাক্‌তে দেখে ডেকে পাঠালেন, তাই আমি ডাক্‌তে এসেছি। বালক বলিল,মা কি করে জান্‌লেন যে আমি এখানে বসে আছি? বালিকা বলিল, বা! আমার মা কি তোমারও মা নাকি? কমল বলিল, হ'লেই কি কিছু দোষ আছে? এইবার সুন্দরীর আর উত্তর নাই। সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি আমার মায়ের ছেলে হবে? আমার মা তোমার মত একটী ছেলে পেলে বেঁচে যেতেন। বলিতে বলিতে সুন্দরীর আকর্ণপ্রসারিত চক্ষু দুটী জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার তোমার মত একটী ভাই থাক্‌লে বেশ হতো, আমার মা কত যে কাঁদেন—আমার ঠাকুরদাদা কত যে দুঃখ করেন। আমার মায়ের আমি না হয়ে যদি তুমি হতে, কি আমি যদি

তুমি হইতাম, তাহা হইলে আমার মায়ের সুখের সীমা থাকিত না, আর আমার ঠাকুরদাদাও এত দুঃখ করিতেন না।

কমলকুমার বলিল—তোমার মা কি করিয়া জানিলেন যে আমি এখানে ব'সে আছি? এবার "তোমার মা" কথাটায় সুন্দরীর প্রাণটা যেন কেমন ছোট হইয়া গেল, মুখখানি বিবর্ণ হইল—অপ্রস্তুত হইয়া নতমুখে বলিল—আমার মা তোমার মা কেন হবেন, ভুলে বলে ফেলেছ না? কমল বলিল না, ভুলে বল্‌বো কেন? আমার মুখে আপনা আপনি বাহির হইয়াছে, আমি ইচ্ছা করিয়া বলি নাই, সাবধানও হই নাই। কেন জানি না তোমার মাকে আমার খুব ভাল লাগে, আমার মাকে আমি যেমন ভাল বাসি, তোমার মাকেও আমার তেমনই করিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। এইবার সুন্দরীর মুখ-কমল বিকশিত হইল—তাহার অন্তরের প্রফুল্লতা মুখে ফুটিয়া উঠিল—কি এক অব্যক্ত প্রীতির হিল্লোলে তাহার আপাদমস্তক আন্দোলিত হইল—পুলকে পূর্ণ হইয়া—হাসি রাশিতে অধর-ওষ্ঠ হইতে নয়নপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসাইয়া—ঈষৎ মৃদুমধুর অন্দোলনে মাথাটী দুলাইয়া—বালিকা বলিল, মাকে আমিই বলিয়াছিলাম—ঐ দেখ গাছতলায় কে একা বসে আছে। মা তোমাকে দেখে ডাক্‌তে বল্লেন। কমল বলিল, আমি ত লুকায়ে বসে আছি, তুমিই বা টের পেলে কেমন করে? বালিকা বলিল, এই দিকে তাকাইতেই তোমাকে দেখ্‌তে পেলুম। কমল বলিল, এতদূরে তোমার চোখ পড়্‌ল? সুন্দরী আবার অপ্রস্তুত হইয়া নতদৃষ্টিতে বলিল, তুমি বড় দুষ্ট—বড় ঝগড়াটে—আমার সঙ্গে এত ঝগড়া কর কেন? দেখ্‌তে পেয়েছি সেটাও কি আমার দোষ? কমল বলিল,কে বল্লে তোমার দোষ? তোমার দোষ নাই, সকলে বলে তোমার চোখ্‌ দুটী খুব বড় বড়—তোমার দোষ নয়, তোমার চোখের দোষ। বালিকা লজ্জায় নতমস্তকে যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিল। যাইবার সময় বলিল, তুমি আস্‌বে না? মা তোমাকে ডাক্‌ছেন এস। বালক বলিল, তুমি যদি আর একটু দাঁড়াও তা হলে আমি যাইতে পারি। সুন্দরী যাইতে যাইতে দাঁড়াইল, কিন্তু চোখের দোষে আর ফিরিয়া দাঁড়াইল না। কমলকুমার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বলিল, কিন্তু বালিকা তাহা শুনিল না, অগত্যা বালক বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল—দেখ, সুন্দরী তুমি আজ দু তিন দিন কেমন এক রকম হয়েছ

কেন? সুন্দরী ছোট একটী কথায় উত্তর দিল, "কই?" কমলকুমার বলিল, হাঁ হয়েছ বইকি। বালিকা বলিল, তবে তুমিও হয়েছ? কমলকুমার বলিল, তাতে তোমার কি? বালিকা বলিল, তবে আমার "কেমন এক রকমে" তোমারই বা কি? দুজনেই চুপ! ধীর ও শান্ত পাদবিক্ষেপে বালিকা বালককে সঙ্গে লইয়া জননী-সদনে উপস্থিত হইল। কলিকার পশ্চাতে ফুটোন্মুখ কোরক দেখিয়া কাহার না চক্ষু জুড়ায়? সান্ধ্য-তারার মাথার উপর শুক্ল তৃতীয়ার চাঁদের উদয় দেখিয়া এক দৃষ্টিতে কেনা তাকাইয়া থাকে? এমন মধুর মিলন—এমন সোণায় সোহাগা যখনই মানুষের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, মানুষ চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া থাকে, দেখিয়া দেখিয়া দেখার সাধ আর মিটে না। আজ সুন্দরীর মাও তদ্রূপ কন্যাকে ও কন্যার পশ্চাতে কমলকুমারকে নীরবে মৃদু পাদবিক্ষেপে আসিতে দেখিয়া এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। কি এক স্বর্গীয় শোভা—এক দেব-দৃশ্য—মধুর সৌন্দর্য্যের আভা তাঁহার বিষাদ ভরা কোমল প্রাণের সমগ্র ভাগকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি আনন্দ-বিগলিত-হৃদয়ে গভীর গাঢ় স্নেহ-ভরে—অসংযত হইয়া—আত্মবিস্মৃত হইয়া, উভয়ের মুখচুম্বন করিয়া একবার কন্যার মুখের দিকে, আরবার কমলকুমারের মুখের দিকে তাকাইতেছেন আর বলিতেছেন, বিধাতা কি একটা প্রাণ দুইভাগ করিয়া এতে আধখান্ ওতে আধখান্ রাখিয়াছেন? এমন সময়ে চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকুমারের সমবয়স্ক হৃদয়নাথ আসিয়া বলিল, "কাকা! তোমাকে নিতে লোক এসেছে!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃবিয়োগে।
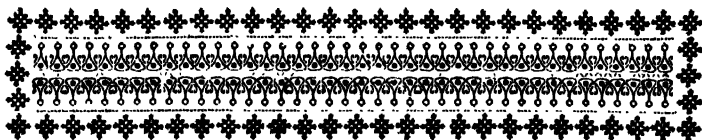
গোয়ালপাড়ার অর্জ্জুন ঘোষ কমলকুমারকে আনিতে গিয়াছিল। সে তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে গ্রামপ্রান্তে পৌছিয়া বলিল,ঠাকুর! তুমি বাড়ী যাও, আমি এইখান হইতেই বাঁয় ভাঙ্গিয়া বাড়ী যাই। চাটুয্যে মশাইয়ের খাতিরে সব কাজ ফেলে গিয়েছিলুম। তুমি বরাবর তাঁর বাড়ীতেই যাইবে। আমি তোমার মাকে বাড়ী থেকে সেই বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেখে গিছি। কমলকুমারের দাদা (কালীকুমার মাতৃমাতুলপৌত্র) পীড়িতা ও মৃতপ্রায়া পিসিমার সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে নিজগৃহে আনিয়াই কমলকুমারকে ও কমলাকে সংবাদ দেন। কন্যা নিকটে ছিল, আসিল, পুত্র বহু দূরে, সুতরাং আসিতে বিলম্ব হইল। কন্যার সহিত এ বাড়ীর সম্পর্ক কিছুই নাই বলিলেই হয়। অনেক দিনের অনাত্মীয়তার পর যখন আত্মীয়তার নূতন সূত্রপাত হইয়াছে, তখন হইতেই বালিকা পরগৃহবাসিনী, সুতরাং ইঁহাদের সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না! কমলা শাশুড়ীর পরামর্শে হৃতচৈতন্য ও মুমূর্ষু জননীকে নিজ শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার জন্য কাঁদাকাটি করিতে লাগিল। কালীকুমার কমলাকে তাহার দাদার পৌছান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন ও বুঝাইলেন কিন্তু কমলা তাহা বুঝিল না। সুতরাং কালীকুমার নিরুপায় হইয়া বালিকার আবদার ও কাঁদা কাটিতে সম্মতি দিলেন এবং পাল্‌কী আনাইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যার সহিত পিসিমাকে পাঠাইয়া দিলেন। নিজে সঙ্গে গিয়া সেখানে

সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলেন। সেই রাত্রির অবসানে মকর সংক্রান্তির সূর্য্যোদয়ে কমলকুমারের জননী—কমলার মা—রাঙ্গাবউ বালিকা-কন্যার ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিলেন। প্রাণ-বায়ু নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নিয়ত "আমার কমলকুমার—কমলকুমার—আমার কমল—কমল কই? আসিল না? একটীবার আমার বাছাকে দেখ্‌তে পেলুম না গা, আমার বাছা একবার এলনা?" সন্তানবৎসলা জননী এই ভাবে সমস্ত রাত্রি আক্ষেপ করিতে করিতে শেষে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র দিনে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার অতীত পবিত্র রাজ্যে গমন করিলেন। কালীকুমার বহু লোকের সাহায্যে গঙ্গাতীরে পিসিমায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া কমলার শ্বশুর বাড়ী হইয়া পূর্ব্বদিন বাড়ী আসিয়াছেন। পরদিন ৩রা মাঘ বেলা ৮।৯ টার সময়ে কমলকুমার কালীকুমারের গৃহ-প্রাঙ্গণে দেখা দিল। পিতৃমাতৃহীন বালককে দেখিয়া কালীকুমারের চক্ষু দুটী জলে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। নতমস্তকে ভূমিদৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন। জ্যেষ্ঠাবধূ দেবরের হাত ধরিয়া লইতে আসিলেন। বালক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে বলিল, বউদিদি! মা কোথায়? বউ বলিলেন, বল্‌ছি বসোনা। বালক বলিল, না, তুমি আগে বল, মা কোথায়? মা কি বাড়ীতে? বউ বলিলেন, না, মাকে সুন্দরীর শ্বশুর বাড়ী নিয়ে গিয়েছে। কমল বলিল, তবে আমি যাই, আগে মাকে দেখে আসি। এইবার বধূঠাকুরাণীর বাহিরের কাঠিন্য ভাঙ্গিয়া গেল। মাতৃহীন বালকের মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা তাঁহার কোমল প্রাণের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল, বেদনার পরিচায়ক অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। বালক বুঝিল তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার পৃথিবী শূন্য হইয়াছে, তাহার চারিদিক অন্ধকার হইয়াছে। কমলকুমার আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছিন্ন তরুর ন্যায় বালক গৃহ-প্রাঙ্গণে আছাড়িয়া পড়িল। তাহার আর্ত্তনাদে প্রতিবেশিবর্গ ছুটিয়া আসিল। শত চক্ষে শতধারা বহিতেছে, আর বালক প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধূলায় লুণ্ঠিত ও অশ্রুসিক্ত হইতেছে। যাহারা সে দৃশ্য দেখিল, জন্মের মত বালকের মাতৃবিয়োগ ঘটনা তাহাদের অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেল। শেষে বালক কত আশা ভরসার কথা—কত সুখের কল্পনা বিনাইয়া বিনাইয়া কত দুঃখ, কত বিপদ একত্র গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে আক্ষেপে—সে ক্রন্দনে পাষাণও

গলিয়া যায়। দাসেদের মোহিনী দাঁড়াইয়া ছিলেন, ছোট ভাই কুমদের মৃত্যু ও মায়ের বিপদ ও সেই—সেই শ্মশান-দৃশ্য যখন কমলের গাথায় গাঁথা পড়িল, তখন মোহিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ঐ মাতৃহীন বালককে কোলে লইয়া বসিলেন ও বুঝাইতে লাগিলেন। যত মিষ্ট কথা শুনিতেছে,বালকের প্রাণের উপর ততই আঘাত পড়িতেছে—তাহার যন্ত্রণা ততই বাড়িয়া যাইতেছে,এমন সময়ে কালীকুমার আসিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন, চল্ ওঠ্ এখন আর পড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। আগে স্নান করে কাচা গলায় দে। বালক অবশ ও অসমর্থ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলকুমার স্নান করিয়া সময়োপযোগী বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গ্রামের প্রবীণ ও গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। তৎপরে ভগ্নীর শ্বশুর বাড়ী গেল। সেখানে কমলা মায়ের জন্য কাঁদাকাটী করিয়া এক প্রকার শান্ত হইয়াছিল। দাদাকে দেখিয়া আবার মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দুই ভাই বোনে অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইল। ক্রমে অনেকের শান্ত্বনাবাক্যে নীরব বিষাদ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া রহিল। ভগ্নীর ইচ্ছা ভাইটী এই অবস্থায় সেইখানেই থাকে। কমলার শ্বাশুড়ীও কমলকুমারকে রাখিবার জন্য একটু বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন। বালক ও বালিকা আজ পরস্পরের পরমাত্মীয়। আজও অন্য কেহ ইহাদের আত্মীয়তার মধ্যস্থলে স্থান পায় নাই। অন্য সকলেই এখনও পরের মত আছে। তাই মাতৃহীন বালক মাতৃহীনা ভগ্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া নিজের দুঃখ দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া এবং কমলার শ্বাশুড়ীর যত্নে মুগ্ধ হইয়া সেইখানেই রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দশম দিবসে।

ক্রমে একদিন দুদিন করিয়া কমলের মায়ের মৃত্যুর নবম দিবসের সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা ভাবনা চিন্তায় ও মনের দুঃখে বিনা নিদ্রায় রাত্রি শেষ হইল। আজ কমলকুমারের জীবনে বিশেষ দিন। এমন দুর্দ্দিন এরূপ সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন বালকের জীবনে আর কখনও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। কমলার শ্বাশুড়ী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া কমলকুমারকে জাগাইয়া বলিলেন—"বাবা! আজ দশ দিনের দিন, আজ অন্যত্র থাকিয়া অন্যের বাড়ীতে কোন কাজ করা ভাল নয়। আজ তুমি বাড়ী যাও!" কমলকুমার চারিদিক অন্ধকার দেখিল। মাতৃহীনা বালিকা-ভগ্নীকে কোন কথা না বলিয়া, কাহারও সহিত দেখা না করিয়া, পথে বাহির হইল। অনাথ বালক গলায় কাচা, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে নিজ গৃহাভিমুখে চলিল। বাড়ী আসিয়া শূন্য গৃহে বহুক্ষণ বসিয়া একাকী রোদন করিল। আজ তাহার কোমল প্রাণে পিতা-মাতার স্নেহ মমতা—জেঠাইমায়ের আত্মীয়তা—পিসিমায়ের বহু যত্নে লালন পালন—ভাই ভগ্নীর সহিত একত্রে খেলাধুলা—পিতার মৃত্যু—জননীর অদর্শন, শেষে শ্রীধরপুর—সুন্দরীর মায়ের আদর—সুন্দরীর সজল নয়ন ও বিষণ্ণ মুখ, একে একে স্মরণপথে উদয় হইল। শূন্য গৃহে বসিয়া বালক চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আজ তাহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার—আহা বলিবার লোক নাই। বালক আজ কাহারও বাড়ীতে যাইতেও সাহস

করিতেছে না। এই ভাবে বসিয়া একাকী কাঁদিতে কাঁদিতে বেলা ৯॥ টা ১০টা হইয়া গেল। তখন পিতার সঞ্চিত নূতন বস্ত্রের মোট হইতে একখানি পরিধেয় ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র বাহির করিয়া লইয়া বাজারে অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ও নবীন পরামাণিকের সন্ধান করিতে গেল। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া পরামাণিকসহ বালক পুরোহিতের গৃহে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনে বলা ছিল। পুরোহিত মহাশয় জানিতেন না যে, সেদিন কখন কোথায় কাজ সমাধা হইবে। সকল আয়োজনসহ বালককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, অবশ্য কেহ এ সকল আয়োজন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই বালক অধ্যাপকপুত্র এবং পরামাণিক সঙ্গে থাকায় আয়োজনের ক্রটী হয় নাই। বেলা প্রায় ১২॥ টার সময়ে বালকের চিরপ্রিয় নূতন পুখুরের পূর্ব্ব দিকের ঘাটের একপার্শ্বে পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা হইলে, পুরোহিত ও পরামাণিক উভয়েরই তিরোধান হইল। বালক আর্দ্র বস্ত্রে ঘাটের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল। জনমানবহীন গৃহে যাইতে তাহার মন সরিল না। আর গিয়েই বা কি করিবে? আজ তাহার একাকীত্ব অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বালক আজ সত্য সত্যই দশদিক অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল। হৃদয়ের আবেগে—মনের উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আজ জনসমাজ তাহার নিকট অরণ্য—আজ আত্মীয়স্থল ও ভদ্রসমাজ তাহার নিকট অস্পৃশ্য ইতর জাতীয় লোকের সংস্পর্শ অপেক্ষাও ঘৃণার্হ বলিয়া মনে হইতে লাগিল—আজ লোকালয় হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ ও পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হইল! একটীবার কাতর দৃষ্টিতে উর্দ্ধে তাকাইয়া বলিল "ভগবান! আজ আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই?" এই কয়টী কথা বলিতে না বলিতে জনসমাগম সন্দেহে যেমন পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি সেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে কালীকুমারের কোমল—স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইল। বালক গভীর মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া নতমস্তক হইল।

কা। এখানে এমন করে দাঁড়্য়ে কেন?

ক। (অশ্রুজলে আর্দ্র বক্ষ প্লাবিত করিয়া বলিল) কোথায় যাইব?

কা। কেন, কমলার শ্বশুর বাড়ীতেই ছিলি ত ?

ক। হাঁ ছিলুম। আজ ভোরে তারা আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে।

কা। কেন ?

ক। আজ দশদিনের দিন, অশৌচান্তে স্নান করিয়া কাহারও বাড়ীতে উঠিতে নাই।

কা। কে বলিল ?

ক। কমলার শ্বাশুড়ী।

কা। তা বাড়ীতে যা না। বাড়ীর পথ চিনিস্ না ?

ক। কে আছে যে বাড়ী যাব ?

কা। আমাদের বাড়ীর কথা বল্‌ছি। এ বাড়ীতেও কি যেতে নেই ?

ক। আজ কারো বাড়ীতে উঠা যখন এত দোষের কাজ যে, একজনেরা বিদায় করিয়া দিল, তখন আমি কোন্ সাহসে ওবাড়ীতে যাই ?

কা। আচ্ছা দাঁড়া।

কালীকুমার ক্ষিপ্রহস্তে স্নান সমাপন করিয়া কমলকুমারকে সঙ্গে লইয়া সত্বরপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বাড়ী আসিয়া কমলকুমারকে বসিতে বলিলেন। আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া গামোছা হস্তে দেহ মার্জ্জন করিতে করিতে বাজারে দৌড়িলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে বালকের আহারের আয়োজনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। নিজ হস্তে তাহার পাকাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। কমলকুমার আহার করিতে বসিলে পর, কালীকুমার আহার করিতে বসিলেন। বহু ক্লেশ ও যত্নে প্রস্তুত ভোজ্য-পাত্রে বসিতে না বসিতে বালকের অশ্রুধারা প্রবলতর আকার ধারণ করিল, গণ্ড অতিক্রম করিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় বালকের বক্ষে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে ও ভোজনপাত্র সিক্ত হইতেছে দেখিয়া গৃহকর্ত্তা একটীবার বলিলেন "কি কচ্চিস্ ? খা না।" বউঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া মিষ্ট কথায় আহারে প্রবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বালকের দুঃখের অনন্ত পারাবার উথলিয়া উঠিল। বালক বুঝিল সংসারে মন্দও আছে, ভালও আছে—অমাবস্তার ঘন অন্ধকারও আছে, আবার পূর্ণিমার ফুটফুটে চাঁদের আলোও আছে—শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী মানুষের প্রাণনাশের পূর্ণ আয়োজনে

বিরাজ করিতেছে, আবার সুজলা সুফলা ধরিত্রীর নিত্য নূতন আয়োজনে মানুষ প্রাণ পাইতেছে—বসুন্ধরার নিত্য নূতন শোভা ও সৌন্দর্য্যে মানুষের হৃদয় মন প্রীতি ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে। কমলকুমার বুঝিয়াছে সংসারে দানবও আছে,আবার দেবতাও আছে—সে আজ বুঝিয়াছে আচরণের দ্বারা এই মানুষই দেবতা হয়, আবার এই মানুষই দানব হয়। তাই আজ সে দাদার আচরণে—বধূঠাকুরাণীর স্নেহ-সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। আজ তাহার অন্নের প্রত্যেক গ্রাস তাহার রসনায় অমৃত সিঞ্চন করিতেছে! আজকার এই দুর্দ্দিন বালককে বেশ পরিষ্কার ভাবে শিখাইল যে,সংসারে কেহ কাহারও নহে, কিন্তু সময় বিশেষে পরের আশ্রয় নিজ গৃহ হইতেও শতগুণে প্রিয় জ্ঞান হয়—সুখের স্থান—নিরাপদ আশ্রয় বলিয়া মনে হয়। কমলকুমার আহার সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিল, এই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবে না। আর যদি কখনও সুযোগ হয়, তবে এই গৃহের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। জননীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে এইরূপ কৃতজ্ঞতার ভাব লইয়া কমলকুমার কালীকুমারের গৃহেই বাস করিতে লাগিল। কমলার স্বামী ও শ্বাশুড়ী বহু চেষ্টা করিয়াও বালককে আর তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিতে পারিলেন না। কমলকুমার মধ্যে মধ্যে গিয়া কমলাকে দেখিয়া আসিত—ভ্রমক্রমেও আর সেখানে রাত্রি যাপন করিত না। দীর্ঘকাল সে সেখানে জল গ্রহণ করে নাই। শেষে ভগ্নীর বহু সাধ্য সাধনায়—কাঁদা কাটীতে পণের এক কণামাত্র ভাঙ্গিয়াছিল। যখনই যাইত, ভগ্নী অনুরোধ করিলে, কেবল জল গ্রহণ করিত মাত্র।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনাথ বালক—বিপথে।

রামেশ্বরের কিঞ্চিৎ বিত্তসম্পত্তি ছিল। যাহা ছিল, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থের কায়ক্লেশে দিনপাত হইতে পারিত। কালীকুমার কমলকুমারের ঐ সম্পত্তি রক্ষা ও তাহার লেখা পড়ার সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না। কমলকুমার বুদ্ধিমান ও সরল প্রকৃতির বালক হইলেও স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার প্রবল প্রবৃত্তিই তাহার পরিচালক ছিল। সহজে কাহারও পরামর্শের অধীন হইয়া চলিত না। তাহাতে আবার কালীকুমার একবারে মাটির মানুষ—কখনও কাহাকেও বলপূর্ব্বক নিজের বুদ্ধি বিবেচনার অধীন করিতেন না। একদিকে কালীকুমারের দৃঢ়তার অভাব; অপর দিকে বালকের স্বেচ্ছামত বিচরণের প্রবৃত্তি, এই দুয়ে মিলিত হইয়া কমলকুমারকে এখন বিপথে লইয়া চলিল। কালীকুমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, তাঁহার গৃহিণী অনেক মিষ্ট কথায় বালককে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া, উভয়েই অকৃতকার্য্য হইলেন। কোন মতেই ইহারা বালককে সৎপথে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ক্রমে কমলকুমার সর্ব্বশাসনচ্যুত ও সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইয়া প্রথমে, প্রবৃত্তি কুলের ছোটগুলির হাতে আত্মসমর্পণ করিল, পাপের পথ বড়ই চিত্তমুগ্ধকর, কাজেই ক্রমে বৃহত্তর প্রলোভনের মুক্ত পথে কমলকুমার পদার্পণ করিল। নিরাশ্রয় বালক চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া যখন নূতন পুখুরের ঘাটে বসিয়া পড়িয়াছিল, তখন কালীকুমার, হাত ধরিয়া বাড়ী আনিতে ও আশ্রয় দিতে

পারিয়াছিলেন, এ শক্তি ও সাধুতা তাঁহার ছিল, কিন্তু বালক না বুঝিয়া যে বিপদ ডাকিয়া আনিল—নিজের যে দুর্দ্দশার সূত্রপাত করিল, কালীকুমার তাহা হইতে বালককে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বধূঠাকুরাণীর স্নেহ ভালবাসা ও আদর যত্ন বালককে বাঁচাইতে পারিল না। প্রবৃত্তিকুলের চরিতার্থতা নিবন্ধন আপাত-মধুর সুখসেব্য পথেই লোক সহজে পদার্পণ করে। তাহাতে কমলকুমার বালক, অশাসিত ও অরক্ষিতপ্রায়। কিঞ্চিৎ বিত্তসম্পত্তি থাকায় অর্থাগম সহজ-সাধ্য বলিয়া জীবনের প্রথম সংগ্রামে পদে পদে জয়লাভ হইতে লাগিল। প্রকৃত যৌবন-পথে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই অপেক্ষাকৃত বয়স্ক দলে মিলিত হইয়া বালক যৌবন-সুলভ সহজসাধ্য আমোদ প্রমোদে ডুবিয়া গেল। তাহার প্রকৃতিতে কোমলতা ও লজ্জাশীলতা অত্যধিক, তাই এখনও গুরুতর গর্হিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়াও হয় নাই। সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। যাহারা এইরূপে তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর—প্রধান সহায়, তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল অসাধু সঙ্গসম্ভোগ নহে। গূঢ় ও গভীর উদ্দেশ্য পরিচালিত হইয়া তাহারা এই বালকের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর। ইহাকে পথের ভিখারী করিয়া দিয়া নিজেদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করাই ঐ সকল গ্রাম্য সুহৃৎদের একমাত্র অভিপ্রায়। কালীকুমার কমল-কুমারকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু বালক বুঝিয়াও বুঝিল না। যাহা কিছু ছিল ত্বরায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

ভট্‌চাযি্য বাড়ীর ছকুবাবু ও চাড়ুয্যে বাড়ীর দুর্গা নক্‌সা ও প্রেমারা খেলায় বড়ই মজবুত—প্রয়োজন হইলে কোন্ কাজেই পশ্চাৎপদ নহে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বালকের সহিত আত্মীয়তা করিতে লাগিল। এই আত্মীয়তার ফলে অতি অল্প কালে বালক নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। সামান্য যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ইহাদের সম্পত্তিভুক্ত হইয়া গেল। যে সামান্য মূল্যে নাবালকের ঐ সকল সম্পত্তি বিক্রয় হইল, সে টাকার অধিকাংশই অল্পে অল্পে উহাদেরই হস্তগত হইল। এইরূপে কমলকুমার পিতৃ মাতৃহীন হইয়া নিজের বুদ্ধির দোষে ও গ্রাম্য সঙ্গিগণের প্রবঞ্চনায় ত্বরায় দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপনীত হইল। অর্থাভাবে যখন পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত জগন্নাথের বাড়ী হইতে কাপড়গুলি লইয়া মলিন বস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, সেই সময়ে চাড়ুয্যে.. বাড়ীর দুর্গা (সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র) কমলকুমারকে বলিল, দেখ খুড়ো, তোমার

বেয়াদবি বড়ই বাড়িতেছে,এই রকম ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে আমাদের দরজা দিয়ে ফের যে দিন যাইতে দেখিব, সেদিন তোমাকে আস্ত ছাড়িব না। ইহারই তিন দিন পূর্ব্বে কমলকুমার খেলিতে বসিয়া ইহারই নিকট ২০৲ টাকা হারিয়াছে। কমলকুমার এই কথা শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠিল, তাহার চক্ষু হইতে যেন আগুনের কণাসকল নির্গত হইতে লাগিল। কমলকুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া দুর্গা মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই কমলকুমারের দারিদ্র্য ও তন্নিবন্ধন দুর্দ্দশার বিবিধ পরিচয় পাইয়া বলিল "থাক্ থাক্ ও ঢোঁড়ার গর্জ্জন, ওতে বিষ নেই, কেবল চক্রে কি ভয় পাই?" কমল-কুমার ক্ষণকালের জন্য সব অন্ধকার দেখিল—দুঃখে ও অভিমানে প্রাণের ভিতর এক বিষম যাতনার সঞ্চার হইল—তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল—শেষে যেন চক্ষু ফাটিয়া জলধারা প্রবাহিত হইল। কমলকুমার যেখানে যাইতে-ছিল—সেখানে আর গেল না। দাদার বাড়ীর দিকে ফিরিল—পথে আসিতে আসিতে প্রতিজ্ঞা করিল, "আজই এই সাধের জন্মভূমি,আত্মীয় স্বজন,বন্ধু বান্ধব, ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। যদি কখন আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারি, তবেই আসিব, নতুবা এই শেষ। এই বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী আসিল। ভাইঝিটাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া একটু আদর করিল, অশ্রু-পূর্ণ নয়নে বউঠাকুরাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বউদিদি! আমাকে চারিটী ভাত দাও—আজ রাত্রি শেষে তোমার দেবর লক্ষ্মণ একাকী চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইবে।

বউ। কেন চাঁদ (বউ কমলকে আদর করিয়া কখন চাঁদ, কখন বা দেবর লক্ষ্মণ বলিয়া ডাকিতেন) তোমার কি হয়েছে যে বনবাসে যাবে? সীতাদেবী ত ঘরেই আছেন? তবে বনে কেন?

ক। বাবার নিকট সত্যবদ্ধ আছি, তাই সত্য পাল্‌তে বনে যাব। বাবা আমাকে বলেছিলেন যে লেখা পড়া শিখে, যাতে দশ টাকা আন্‌তে পার, আর দশজনের একজন হয়ে ভদ্রলোকের মত চল্‌তে পার,তাহার চেষ্টা করিবে। আমি তাহার কোন চেষ্টাই করি নাই। এ অবস্থায় এ গ্রামে বাস করিলে, বাবার আদেশ পালন হইবে না।

বউ। চাঁদ! তোমার এতদিন পরে জ্ঞান হলো, একটু আগে হলে ত

আর জমি জমাগুলি—অমন বাগানখানি এ সব ত যেত না। যাক্, তোমার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে এই লাভ। কোথায় যাবে?

কাল ভোরে তোমাদের উঠিবার আগেই চলিয়া যাইব। কোথায় যাইব কিছুই জানি না, ভগবান যে দিকে নিয়ে যাবেন সেই দিকেই যাব। এই বলিয়া ভাইঝিটীকে আর একবার কোলে লইয়া স্নেহভরে মুখচুম্বন করিয়া বলিল "ফুল, (মেয়ের নাম গোলাপী,কমল আদর করিয়া তাহাকে 'ফুল' বলিত, আবার সময়ে সময়ে 'মা'ও বলিত) তুমি তোমার বাবার ঘরে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। আমি যদি কখন ফিরি, তাহলে যেন আসিয়া দেখিতে পাই, আমার মা-টী আমার মনের মত হয়েছে, পছন্দ না হলে আমায় মা খারিজ করিব—মানিব না। ভাল করে ফুট্‌বে ত? 'ফুল' উত্তরে স্বপক্ষে মাথা নাড়িয়া বলিল—কাকা, তুমি কোথায় যাবে? তুমি গেলে আমাকে বইবে কে, এত করে ভালবাসবে কে, পাতে বসিয়ে খাওয়াবে কে, অমন করে আদর করে আঁব, কাঁটাল, সন্দেশ গালে তুলে দেবে কে? কাকা বলিল, ফুল! আমার আদরটা তোমার উপরি-পাওনা বইত নয়—তোমার বাবা মা তোমাকে অমনি করেই খাওয়াবেন—তারপর তুমি বড় হলে, আর একজন—উড়ে এসে জুড়ে বস্‌বে, সেও তখন তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে—আদর করে—গলা ধরে—গাল ভরে খাওয়াবে,যেমন তোমার মাকে—এইবার বউঠাকুরাণী কপট রোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রিয়তম দেবর লক্ষ্মণকে (তবে র‍্যা বাঁদর বলিয়া) তাড়া করিয়া যাইতেছেন, আর কমলকুমার গোলাপীকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে দূরে যাইতে যাইতে বলিতেছে "ফুল! তোমার মায়ের কাণ্ড দেখ্‌লে? আচ্ছা বলত, চাঁদ কি কখন বাঁদর হয়? না বাঁদর কখন চাঁদ হয়?" এমন সময়ে কালীকুমার বাড়ী আসিলেন, আসিয়া এই সখের যুদ্ধের আয়োজন ও অভিনয় দেখিয়া—গৃহিণীর কিঞ্চিৎ অসাবধানতা দেখিয়া—সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্যামাঙ্গী সুন্দরীর আপাদ-মস্তক পরিব্যাপ্ত সুরসাল লাবণ্য-লীলা দর্শন করিয়া—মুগ্ধ মনে মুহূর্ত্ত কাল নীরবে সে দৃশ্য-সম্ভূত সুখ সম্ভোগ করিয়া বলিলেন—গালভরা হাসি হাসিয়া বলিলেন—বেশ সেজেছ ত? আজ এ কিসের লড়াই? এমন রণরঙ্গে মেতেছ কেন? কাণে কাণে কি একটা কথা বলিয়া, পরে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ও কি তোমায় এঁটে উঠ্‌তে পারবে?" ঠাকুরাণী

এই কথায় নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পাকশালাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কালীকুমারও সঙ্গে সঙ্গে পাকশালায় প্রবেশ করিলেন এবং কি জানি কি ধূলাপড়া দিয়া গিন্নীর মেজাজ আরও সরল—কোমল—তরল করিয়া দিয়া আসিলেন। পরক্ষণেই কমলকুমার অগ্রসর হইয়া বলিল "নাও, তোমার ফুল তুমিই নাও—অনেক বক্‌সিস পেয়েছ দেখ্‌ছি—একটা আধটা মেয়েটা-কেও দাও", বউঠাকুরাণী আবার রোষকষায়িত নেত্রে দেবরের দিকে তাকাইয়া পরক্ষণেই স্নেহ বিগলিত হইয়া বলিলেন—সম্পর্কবিরুদ্ধ না হ'লে এ ফুল তোকেই দিতুম।

ক। না না, ছি! আমি যে বাঁদর; কিন্তু আমি সত্যিই বাঁদর।

বউ। না না—তুমি আমার সোণার চাঁদ—ওটা রাগের কথা, আদরের বাঁদর। ওতে কি রাগ করে—ছি!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

একাকী জীবনের পথে।

আজ কমলকুমার সত্যই জীবনের পথে একাকী ভাসিল। একখানি গামছায় ২য় পরিধেয় বাঁধিয়া লইয়া দীনহীন কাঙ্গালের বেশে পঞ্চদশবর্ষীয় বালক জন্মভূমি ও তৎসংস্পৃষ্ট সমস্ত প্রিয় পদার্থ পশ্চাতে রাখিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। পথে এক কুটুম্বের বাড়ীতে স্নানাহার করিয়া—বিশ্রামান্তে অপরাহ্ণে আবার যাত্রা করিল। কলিকাতা কিরূপ স্থান, তাহা তাহার জানা থাকিলেও—কোন না কোন পরিচিত লোকের আশ্রয়ে রাত্রি যাপন সম্ভব মনে করিয়া ক্রমে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। কমলকুমার পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যথন সহরের সীমানায় পদার্পণ করিল, তথন সন্ধ্যাসমাগত-প্রায়। সন্ধ্যাদেবীর সমাগমে গৃহে গৃহে পুরাঙ্গণারা শঙ্খধ্বনি করতঃ তাঁহার বন্দনা করিলেন। উপনগরীয় দেবালয়সমূহে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরাদির যোগে সান্ধ্য আরতি ঘোষিত হইল। কমলকুমারের প্রাণে রাত্রি যাপনের চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। ত্বরিত পদে কমলকুমার হাতিবাগানে প্রতিবেশী সিংহদের বাসা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পূর্ব্বে সে বাসায় দুই এক বার আসিয়াছে বটে কিন্তু এখন দুটী কারণে ঠিক করিতে পারিতেছে না। ১ম কারণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ২য় কারণ অনেক বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে—পরে সেই রাস্তার নাম হয় "গ্রে ষ্ট্রীট," ছেলে মানুষ যেখানে যেটী দেখিয়াছিল, রাস্তার জন্য তাহার কতক কতক গোলমাল হইয়া গিয়াছে, কাজেই বাসা

এইবার-কমলকুমারের রৌদ্র-দগ্ধ লোহিতাভ গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। কমলকুমার বলিল—আজ কিছুই খাই নাই। বাবুটী তাহাকে জল খাবার ঘরে লইয়া গিয়া পেট ভরিয়া খাবার খাওয়াইলেন। খাওয়াইয়া বলিলেন, আজ এঁড়েদহে আমার সঙ্গে এক বিয়ের বরযাত্রে চল—আবার কাল ভোরে আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবে। আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইব; কি বল, আমার কথা শুনে চল্‌বে তো? কমলকুমার গভীর কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক মুখ-ভঙ্গিমায় মাথা নাড়িয়া লেখা পড়া শিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করিল।

ঐ বাবুটীর নাম লালমোহন ভট্টাচার্য্য, এইখানে তাঁহার বাসায় থাকিয়া বহু যত্নে লালিত পালিত হইতে ও বহু শ্রমে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে তিন চারি বৎসর অতীত প্রায়। স্কুলে ছাত্র-মণ্ডলী মধ্যে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষকগণের স্নেহদৃষ্টি লাভ করিয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। এমন সময়ে পুরন্দর সরকার নামে কলের কুলির একজন সর্দ্দার কমলকুমারের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইল। এই ব্যক্তি লালমোহন বাবুর শ্বশুর বাড়ীর দেশের লোক। বাবুর অনুগ্রহে চাকৃরি করে, বাড়ীর ভিতর গিন্নীর খুব অনুগ্রহভাজন। হাট বাজার করিয়া দেয়। সুতরাং লালমোহন বাবুর বাড়ীতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করে। সেই সূত্রে কমলকুমারের সঙ্গে পরিচয়—পরিচয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাধীন প্রকৃতির যুবকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যেরও সূত্রপাত হয়। কিন্তু পুরন্দর বাহিরের আত্মীয়তা ভাঙ্গিয়া দেয় নাই। খুব সাবধান লোক। সকল দিক রক্ষা করিয়া চলে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কর্ত্তা গিন্নী দুজনেই কমলকুমারকে খুব ভালবাসেন এবং ছেলেটী ভাল বলিয়া একটু স্বার্থচিন্তাও ক্রমে এই লালন পালনের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। পুরন্দর তাহা জানে, এবং মনে মনে তাহার বিরোধী। পুরন্দর কলিকাতায় শ্যামপুখুরে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইবার সময়ে কমলকুমারকে সঙ্গে লইয়া গেল। কমলকুমার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পুরন্দরের সঙ্গে গেল। ফিরিবার সময়ে পুরন্দর কমলকুমারকে লইয়া অন্যায় পথে অগ্রসর হইল। কমলকুমার পুরন্দরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আপত্তি করিল—কিন্তু তখন সন্ধ্যা অতীত প্রায়। কমলকুমার আপত্তি করায়, কমলকুমারকে পথে বসাইয়া রাখিয়া পুরন্দর চলিয়া গেল।

বিলম্ব দেখিয়া কমলকুমার একাকী আলমবাজার যাত্রা করিবে বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়ে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা স্ব-ভাবে ও সময়োপ-যোগী বেশে—এগ্‌য়ে এ'সে বলিল, "হ্যাঁগা তুমিই কি কমল বাবু ?" কমলকুমার নতমস্তকে বলিল "হ্যাঁ"। বালিকা বলিল—"পুরন্দর বাবুর বড় বেশী অসুখ হয়েছে, অচেতন হয়ে পড়েছে, দু তিন জনে বাতাস করছে, তাই তোমাকে ডাক্‌তে এলুম, তুমি একবার এসে দেখ। একটু ভাল হলে একখানা গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে যাও।" কমলকুমার বড়ই বিপদে পড়িল, তাহার সে বাড়ীর ছায়া মাড়াইতে ইচ্ছা নাই। এইরূপ ইতর স্থানের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিয়াছে এবং ভদ্রলোক হইবার আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে,কিন্তু একদিকে পুরন্দরের অসুখের সংবাদ শুনিয়া উপেক্ষাকরা ও ফেলিয়া যাওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অন্যদিকে ঐ বালিকা, তাহার হাবভাবে—লালসা-উদ্দীপনোযোগী বেশ ভূষায় কমল কুমারের কোমল ও নবীন হৃদয় অলক্ষিত ভাবে অধিকার করিতেছে। কমলকুমার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কমলকুমার সকল প্রকার বিপদ ঘটাইলেও বালক বলিয়া ইতিপূর্ব্বে এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও পড়ে নাই। আত্ম-রক্ষা করিয়াছিল। যাহা কিছু বাকি ছিল, আজ তাহা যায়, আজ আত্মরক্ষা ও আত্মসমর্পণে সংগ্রাম। জয় পরাজয় সময়ে প্রকাশ পাইবে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কমলকুমার শেষে শূন্য দৃষ্টিতে একটীবার বালিকার মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মস্তক নত করিল। বালিকা বলিল—"বাবু! তুমি একবার এসনা,যদি না এস, তা হলে আমি যাই।" এই কথা বলিতে না বলিতে, কে যেন বলপূর্ব্বক কমলকুমারকে সেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর করিল। সে বাড়ীর দ্বার অতিক্রম করিতে কমলকুমারের চরণদ্বয় কম্পিত হইল। হৃদয়ে শঙ্কার সঞ্চার হইল—প্রাণে কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট কারণ-সম্ভূত যন্ত্রণার সূচনা হইল। সহসা তাহার প্রাণে শৈশব-সহচরী সুন্দরীর সুন্দর মূর্ত্তির আভাস প্রতিভাত হইল! সে, সে বালিকাকে ভালবাসে—কেন ভালবাসে—কত ভালবাসে—তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য আজ পূর্ণরূপে কমলকুমারের হৃদয়-পটে প্রতিভাত হইল! কমলকুমারের মনে হইল সুন্দরীও এত দিনে এত বড়ই হইয়াছে—না জানি সে এখন আরও কত সুন্দর হইয়াছে। আমি কি নিষ্ঠুর! আসিবার সময় সুন্দরীকে ও মাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম "আবার শীগ্‌গির আস্‌বো"। কিন্তু

কই, একবারও ত তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলাম না। আর আমি নিতান্ত হত-ভাগ্য, তা না হলে, আমার এমন দশাই বা কেন হবে? আচ্ছা এইবারের পূজার সময় একবার যাইব। কিন্তু হায়! নিজের যে দশা করেছি যাইব বা কোন্ মুখে! পলকমধ্যে কমলকুমারের মনের উপর দিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারের পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র এক বিন্দু অভিনয় হইয়া গেল। বালিকা গৃহের প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কমলকুমার দ্বার অতিক্রম করিয়াই প্রাঙ্গণে সহসা আপনা আপনি দাঁড়াইল। উপরে পুরন্দরের আনন্দ-বিহ্বল অট্টহাস্য শুনিতে পাইয়া অধিকতর ভীত হইল। বালিকা অগ্রসর হইয়া সাদরে কমলকুমারের হাতখানি ধরিয়া বলিল "যদি এলে, তবে আবার দাঁড়ালে কেন?" তাহার এই কয়টী কথা এমন মধুর কাতরতা-ব্যঞ্জক যে কমলকুমার করবদ্ধ হইয়া নীরবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী—প্রথম যৌবনে।

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সুন্দরী গত বৈশাখ মাসে চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিয়াছে। এখনও বিবাহ হইল না। পাড়ার সকলে নিন্দা করিতেছে। দেশ দেশান্তর হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে। কিন্তু কোথাওই ঠিক হইতেছে না। সুন্দরীর পিতামহ গঙ্গাধর অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুন্দরীর মা কন্তা লইয়া বিপন্ন, তাই দিবানিশি বিষন্নভাবে—দীর্ঘনিশ্বাস ভরে কালাতিপাত করিতেছেন। গৃহকর্ম্মে কি বিশ্রামে, সজনে কি নির্জ্জনে, কোথাও তাঁহার সুখ নাই। দিনের পর দিন যাইতেছে, তাঁহার অশান্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতেছে। সুন্দরী বালিকা হইলেও তাহার বাল্যচপলতা নাই, তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত সে লাবণ্যলীলা নাই, তাহার বিশালায়তন নয়ন-দ্বয়ের উভয় কূলে বহুদূর ব্যাপিয়া কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে—মৃতের বিশুষ্ক ভাব তাহার কমলাভ অধরওষ্ঠ অধিকার করিয়াছে। তাহার যে সুপ্রশান্ত—সুগঠিত ললাট-প্রাঙ্গণে সুকুমার চিন্তা-প্রবাহ সুখের লহরী তুলিয়া খেলা করিত, আজ দৃষ্টি মাত্রেই তাহা শূন্য ও আবর্জ্জনাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়—বোধ হয় যেন কেহ বল পূর্ব্বক বালিকার জীবনভরা অমৃত-কলসে বিষ মিশাইয়া দিয়াছে—আজ তাহার সে গভীর বিষাদভরা মুখমণ্ডলে শ্মশানের চিত্র প্রতিফলিত বলিয়া বোধ হয়—বোধ হয় যেন বালিকা নিজের কোমল হৃদয়-

ক্ষেত্রে কাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া তাহারই ভস্মরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া দিন যাপন করিতেছে—তাহার সুগোল—সুঠাম—সুললিত বাহুলতাদ্বয় পরম যত্নে সেই ভস্ম-পাত্র বক্ষে ধরিয়া আছে, তাই অলস—উদাস ভাবে হস্ত দুখানি সর্ব্বদাই পরস্পরে যুক্ত, কেবল নিতান্ত প্রয়োজনে সময়ে সময়ে এক আধবার পৃথক হয়। যখনই কার্য্যানুরোধে কর-কমল পরস্পর হইতে পৃথক হয়,তখনই ঘন-শ্যাম-মেঘাবৃত নয়ন-প্রান্তে শ্রাবণের ধারা প্রবাহিত হয়—আহারাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও, প্রবৃত্ত হইতে না হইতে, নয়নাসারে নবোন্নত বক্ষ প্লাবিত হইয়া যায়, সে উত্তপ্ত সলিল-ধারা যতদূর যায়, ততদূরই দগ্ধ করে। কন্যার দুঃখে জননী সদা দুঃখিত ও অশ্রুসিক্ত, আবার কন্যা ও জননীর দুঃখে বৃদ্ধ গঙ্গাধরও সদা সন্তপ্ত ও চিন্তিত। এই ভাবে আজ চারি পাঁচ বৎসর অতীতপ্রায়।

কমলকুমার কোথায় কি অবস্থায় এই দীর্ঘকালের শেষ তিন বৎসর কাটাইতেছে, আত্মীয় স্বজনের কেহ তাহার সংবাদ পান না—রাখেনও না। কমল কুমারও প্রতিজ্ঞা করিয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে, অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে বাড়ী যাইবে,নতুবা আর যাইবেনা। মাকে দেখিবার জন্য শ্রীধরপুর হইতে যাত্রা করিবার সময়ে কমলকুমার ছোট বড় সকলেরই নিকট বিদায় লইয়াছিল। গুরুজনদের প্রত্যেকের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণতমস্তকে বিদায় লইয়াছিল। সেই কয়েক মাসের ব্যবহারে সকলেই বালকের উপর সন্তুষ্ট—সুন্দরী চির আকৃষ্ট—তাহার মা পুত্রাধিক স্নেহসূত্রে আবদ্ধ। কমলকুমার সুন্দরীর মাকে প্রণাম করিতে গিয়া, তাঁহার স্নেহপূর্ণ মুখ ও সজল নয়ন দেখিয়া অতি কাতরভাবে বলিয়াছিল "তবে আমি যাই"? সুন্দরীর মা বলিয়াছিলেন "না না, বাবা যেও না; 'যাই' কি বল্‌তে আছে?" কমলকুমার নতমস্তকে সুন্দরীর মায়ের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তিনি পুনরায় স্নেহভরে কমলের মুখ-কমল দুই হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলেন "বাবা! যাই বলে না, বল, মা! আমি আসি।" প্রবল ধারা-প্লাবিত চক্ষে বালক গৃহিণীর দিকে তাকাইয়াছিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল "মা! আমি আসি?"; অনতিদূরে দণ্ডায়মানা বালিকা বালকের জয়-পরাজয়ে আনন্দিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোন অজ্ঞাত কারণে নিজেকে বিপন্ন ভাবিতেছিল, তাই বিষণ্ণ। বালক যখন চলিয়া যায়—যায়, আবার দাঁড়ায়,

যেন চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতেছে! তখনও সুন্দরী আপনার সহিত আপনি নীরবে যুদ্ধ করিয়াছিল, শেষে অসমর্থ হইয়া গোপন রণে ভঙ্গ দিয়া অশ্রুজলে ভাসিল—মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল "না তুমি যেও না।" কমলকুমার "আবার শীগ্‌গির আস্‌বো" বলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা।

এই পাঁচ বৎসরের প্রথম দুই বৎসর সুন্দরীর বিবাহ লইয়া গঙ্গাধর ও তাঁহার পুত্রবধূর মধ্যে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা ও অশান্তিকর ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। সুন্দরীর মায়ের ইচ্ছা কমলকুমারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন, তাঁহার সে ইচ্ছা এত প্রবল এত গভীর যে গঙ্গাধর কোন মতেই পুত্রবধূকে সঙ্কল্প-চ্যুত করিতে পারিলেন না। অনেক বুঝাইলেন অনেক যুক্তি দেখাইলেন, কেন এরূপ করা উচিত নহে, তাঁহার গূঢ় কারণেরও আভাষ দিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ তাহাতেও শান্ত ও নিরস্ত হইলেন না। তখন গঙ্গাধর চন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"সে ছেলেটীর কোন সংবাদ কি জান? সে এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, একবার সংবাদটা লও দেখি।" চন্দ্রনাথ বলিলেন—"শুনেছি এখান হইতে যাওয়ার পরেই তাহার মায়ের কাল হইয়াছিল, তাহার পর কোথায় কি অবস্থায় পড়িয়াছে জানিনা—আচ্ছা, এক সপ্তাহের মধ্যেই সংবাদ আনাইব।" কমলকুমারের সংবাদ লওয়া হইবে—তাহাকে সংবাদ দিয়া আনান হইবে—আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হইবে, গঙ্গাধর এইরূপ আদেশ দিয়াছেন শুনিয়া, সুন্দরীর মায়ের মন কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল—শ্বশুরের উপর বিরক্তি চলিয়া গেল। কিন্তু শ্বশুরের মনের অশান্তি ও বিরক্তি গেল না। এই সংবাদে সুন্দরীরও অবশ শরীরে যেন অল্পে অল্পে প্রাণের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহার দিবারাত্রব্যাপী অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে যেন শুক্ল পক্ষের সঞ্চার সম্ভাবনা সমুপস্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে সুন্দরীর মুখে শুক্ল প্রতিপদের চাঁদের কণার ন্যায় ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিতে লাগিল। দেখিয়া সকলেই সুন্দরীর দীর্ঘকালব্যাপী রোগের কারণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। লোক একটু আধটু গা টেপাটিপিও করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের আয়োজনে।

চন্দ্রনাথ ও কমলকুমারের পূর্ব্বপুরুষদের বাসস্থান গঙ্গার অপর পারে বাঁস-বাড়িয়া গ্রামে। সেখানে উভয়েরই কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি আছে। অতি পুরাতন গ্রাম। বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। উভয়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ তৎপরে প্রপিতামহেরাও একত্রে এক সংসারে ঐ গ্রামে বাস করিয়াছেন। তাহার পর অগ্রে কমলকুমারের পিতামহ তৎপরে চন্দ্রনাথের পিতা স্থানান্তরিত হন। শ্রীধরপুর হইতে বাঁসবাড়িয়া যাইতে হইলে কমলকুমারদের গ্রাম পার হইয়া যাইতে হয়, ঐ পথই সুগম ও সহজ। চন্দ্রনাথ বহুদিন বাঁসবাড়িয়া যান নাই, তাই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে, তিনি কয়েক দিনের জন্য গৃহ ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে কমলকুমারদের গ্রামে আসিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে কালীকুমারের বাটীতে পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের নাম শুনিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। পরিচয়ে উভয়েই আপ্যায়িত হইলেন। কমলকুমারের উদ্দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া কালীকুমার নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"সে এতদিন এইখানেই ছিল, আজ কয়েক দিন হইল, না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আপাততঃ কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহার কোন সন্ধানই জানি না. এবং বিশেষ অনুসন্ধান ভিন্ন

কোথায় আছে বলিতেও পারিব না।" চন্দ্রনাথ তিন চারি দিন সেখানে থাকিয়া কালীকুমার ও কমলকুমারের ভগ্নীপতির দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করাইলেন, কিন্তু কোন সন্ধান হইল না। গঙ্গাধরকে ঐ মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া দিয়া চন্দ্রনাথ বাঁসবাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গঙ্গাধর সংবাদ পাইয়া পুত্রবধূকে জানাইলেন। গঙ্গাধর এই সংবাদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইলেন—সুন্দরীর মা একবারে দমিয়া গেলেন—তাঁহার মাথায় বাজ পড়িল। তিনি যে আশা-সূত্র ধরিয়া এতদিন বুক বাঁধিয়াছিলেন, এই সংবাদে তাহা ছিন্ন হইল—তিনি গঙ্গাধরের আদেশমত নির্দ্দিষ্ট অন্য পাত্রে কন্যা দান করিতে বাধ্য হইলেন। সুন্দরীর কি হইল? সুন্দরীর সর্ব্বনাশ হইল—কমলকুমারের নিরুদ্দেশ সংবাদ তাহার কর্ণগোচর হইতে না হইতে সেই যে সে চমকিত হইল—সেই যে তাহার কানে তালা লাগিল—সেই যে সে লোকের সহিত কথা কওয়া বন্ধ করিল—সেই যে সে এক দৃষ্টিতে, যখন যে দিকে ইচ্ছা, তাকাইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল—সেই যে সে বহুক্ষণ পরে পরে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিল—আর তাহা সারিল না। কমলকুমারকে পাওয়া গেল না, তাহারও আর এই উন্মাদ রোগের গুরুতর লক্ষণ সকল দূর হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। অন্যত্র বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, আয়োজনও হইতে লাগিল। সুন্দরীর মা প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা—দণ্ডে দণ্ডে—পলে পলে মনে করিতেছেন, হায়! এখনও যদি ছেলেটার সংবাদ পাওয়া যাইত, তা হলেও আমাদের সকল দিক রক্ষা হইত। হে ভগবান! হে নারায়ণ! শেষে কি এই করিলে? একটা মেয়ে—শেষে তারও এই দশা! হে ঠাকুর! যদি শেষ রক্ষা করিবে না, তবে কেন এ বিপদে ফেলিলে? কেন তবে সংসার হইতে বাছিয়া সেই ছেলেটীকে আমার কোলে আনিয়া দিলে? এমন সোণার চাঁদ আনিয়া কোলে তুলিয়া দিলেই বা কেন, আবার কাড়িয়া লইতেছ কেন? হে হরি! হে নারায়ণ! মুখ রক্ষা কর—হতভাগিনীর এমন সর্ব্বনাশ করিও না, বলিতে বলিতে সুন্দরীর মায়ের নয়নদ্বয় জলে ভাসিয়া গেল। কিন্তু নারায়ণ মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, মুখ রক্ষাও করিলেন না।

গঙ্গাধরের অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশ মত এক সম্পন্ন গৃহের বিংশতিবর্ষ বয়সের

এক রূপবান পাত্রে পৌত্রীর বিবাহ স্থির করিলেন। এ পাত্রেরও কুল ও বংশমর্য্যাদা মন্দ নহে। তবে চন্দ্রনাথ ও কমলকুমারের মত নহে। পাত্রের পিতামাতা বর্ত্তমান। আর তিনটী ভাই ও দুটী ভগ্নী আছে। সচ্ছল ও বৃহৎ পরিবার। বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট থাকিলেও পাত্রের পিতা টাকীর রায় বাবুদের তরফে নায়েবী কর্ম্ম করেন। নাম নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরের নাম বিধুভূষণ, টাকীতে পিতার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করে। এইবার এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে। পল্লীগ্রামের সচ্ছল গৃহের বালকদিগের লেখাপড়ার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে যেরূপ হয়,এখানেও তাহাই হইয়াছে, যথেষ্ট যত্নের অভাবে বিধুভূষণ ইতিপূর্ব্বে ইহার অপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে পারে নাই। যাহা হউক মোটের উপর ছেলেটী ভাল।

কন্যা অরক্ষিতা হইয়া পড়িয়াছে, গঙ্গাধর পৌত্রীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু উপায় নাই, আশ্বিনের মধ্যভাগে পূজার সময়ে প্রস্তাব ধার্য্য হইল, সম্মুখের কার্ত্তিক মাস অতীত না হইলে—অগ্রহায়ণেরও চৌদ্দদিন গত না হইলে বিবাহের দিন পাওয়া যাইবে না। সুতরাং অগ্রহায়-ণের ১৫ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পত্রও হইয়া গেল।*

সুন্দরীর মা শুনিলেন বর বড় মানুষের ছেলে, লেখাপড়াও শিখ্‌ছে, দেখ্‌-তেও বেশ সুন্দর, তবুও তাঁহার মন উঠিল না। সুন্দরীও শুনিল—এক কাণে শুনিল অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার মনের উপর এ সকল সংবাদের ছায়াও পড়িল না। সে ধূলা-খেলায় যাহাকে দেখিয়াছিল, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, চারি মাসের জন্য যাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখে হাসিয়াছে, দুঃখে কাঁদিয়াছে, কাঁদিলে যে যত্ন করিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছে, রাত্রিতে তাহার মায়ের পাশে শুইয়া যে কত গল্প করিয়াছে, তার কেমন খোলা মন—কেমন মিষ্ট কথা—কেমন গালভরা হাসি—কেমন হাসিভরা সুন্দর মুখ—ভার ভার হইলে—রাগ করিলেও তাকে কেমন সুন্দর দেখায়—কাঁদিলেও তাহার মুখশ্রী কেমন মধুর ভাব ধারণ করে—এখনও তাহার প্রাণে সেই স্মৃতি কি এক

---

* তখন এখনকার মত কাঁচা ও পাকা দেখা ও অকারণ রাশীকৃত অর্থব্যয় ছিল না।

গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে—তাহার দীর্ঘকালব্যাপী বিষাদান্ধকারে কমলকুমারের প্রিয়দর্শন চিন্তা তাহাকে গোপনে গোপনে সুখী করে, সে বালিকা মানস-রথে আরোহণ করিয়া নিয়তই তাহার প্রিয় সঙ্গীটীর সন্ধানে নানা স্থানে ছুটাছুটী করে। এই ভাবে এতদিন কাটিয়াছে, এখনও এই ভাবে কাটিতেছে, ভবিষ্যতে কি ভাবে কাটিবে বিধাতাই জানেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কমলকুমারের অন্বেষণে।

দুই মাস সময় আছে দেখিয়া, সুন্দরীর মা আর একবার কমলকুমারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপনে চন্দ্রনাথকে বলিলেন, দেখ বাবা! আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হইত না?

চ। আর কেন? যে ছেলে পাওয়া গিয়াছে, এওত সর্ব্বাংশেই উত্তম হইয়াছে। তবে আবার তাহার সংবাদ নেবার দরকার কি?

সু-মা। ভাল ত অনেক জুটেছিল, খড়গাছির ছেলে সকল বিষয়েই এর চেয়েও ত ভাল ছিল। সে ছেলেটাকে মনে ধরেছিল—আরো—

চ। আরো—কি?

সু-মা। মেয়েটা সে ছেলেটাকে দেখেছিল, আমাদের সকলের পছন্দও হয়েছিল, অন্যত্র হলে হয়ত মেয়েটা সুখী হবে না।

চ। মামী, মেয়েটীর সুখ না হলে, তুমিই তার জন্য বেশী দায়ী। বিয়ের কথা যখন হলো, তখন ছেলেটী ও মেয়েটীকে অত মিশ্‌তে দিলে কেন? সকল কাজেরই একটা সীমা আছে। তুমি বড় বেশী অসাবধান হয়েছিলে, তারই ফলে তোমার মেয়ে চিরকাল দুঃখ ভোগ করবে।

সু-মা। কেন বাবা, আমি এমন কি অন্যায় কাজ করিছি? সে ছেলে তোমার ভাই, সুতরাং আমাদের ঘর, ছেলেটী দেখ্‌তে শুন্‌তেও বেশ। তার কেউ নেই, আমারও আর কেউ নেই। মেয়ে দিয়ে ছেলেটীকে একবারে পাইতাম।

চ। ছেলেটীকে একবারে পাওয়ার কোন বাধা ছিল না, তাই বলিয়া বেশী ব্যস্ত হওয়া, কি অসাবধান ভাবে কিছু বলা, কি করা, ত ভাল নয়।

সু-মা। কেন আমি এমন কি বলিছি বা কি করিছি, যাতে দোষ হয়?

চ। করেছ বইকি—ছেলে মেয়ের সাম্‌নে অনেক সময়ে বিবাহের কথা কহিয়াছ—ছেলেকে মেয়েকে একত্র করিয়া এমন ভাবে আদর করিয়াছ যে, ছেলে মেয়েকে ও মেয়ে ছেলেকে খুব ভালবাসিতে উৎসাহিত হয়—মনে কর, যেদিন কমলকুমার চলে যায়, সেদিন খিড়কীর ঘাটে, তুমি এক হাতে ছেলের, আর এক হাতে মেয়ের মুখ ধরে চুম দিয়ে আদর করেছিলে? কাজ কি ভাল হয়েছিল?

সু-মা। ছেলে মেয়ের সাম্‌নে বিয়ের কথা ত অমন অনেক হয়—তবে আদর যত্ন সব যায়গায় সকলের সুবিধা হয় না, কারেও না—আমার সুবিধা হয়েছিল করেছিলাম। তাতে দোষ কি? আমি—মা—আদর করিছি, এ ত আর মন্দ কাজ নয়?

চ। সকল ভাল কাজই যে সব সময়ে কর্‌তে হবে, এমনই বা কি কথা? করেছ বলেই ত এখন ক্লেশ পাইতে হইতেছে—তাহার চেয়ে ভাল ছেলে পেয়েও মন উঠিতেছে না। আমার মতে ঐরূপ না করাই ভাল। সাবধানের মার নাই।

সু-মা। আমার কাছে ত দোষ বলে মনে হয়নি, এখনও হচ্চে না। ছেলেটীকে খুঁজে পাচ্চি না, বলেই ক্লেশ পাচ্চি। যা করিছি, ছেলের খোঁজ পেলে, সুখের বই, দুঃখের অবস্থায় পড়্‌তে হবে না।

চ। যদি সে মারা গিয়ে থাকে বা বিগ্‌ড়ে গিয়ে থাকে?

সু-মা। মরা বাঁচা, কার হাত? বেছে বেছে হাজার ভাল দেখে দিলেও ত মারা যায়—বিগ্‌ড়েও যায়—মেয়ে বিধবাও হয়—স্বামী থেকেও দুঃখ কষ্ট পায়।

চ। (একটু বিরক্ত হইয়া) তাই বলিয়া কি যা খুসি করিবে?

সু-মা। না—না, বাবা! যা খুসি তাই কর্‌বো কেন? এখন আমার অনুরোধ এই, যে, যদি কোন উপায় থাকে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হইত না?

চ। তা কেমন করে হবে—এক স্থানে কথা দেওয়া হইয়াছে, আর কি অন্য চেষ্টা হইতে পারে?

সু-মা। আমি মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি, একবার খোঁজ করে দেখ।

চন্দ্রনাথ সুন্দরীর মায়ের কাতরতা দেখিয়া ও সুন্দরীর পরিণাম চিন্তা করিয়া কমলকুমারের সংবাদ লইতে সম্মত হইলেন এবং সেই দিনের ডাকেই কালীকুমারকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি এই:—

পরম পোষ্টাবরেষু—

বিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

অল্প সময়ের জন্য হইলেও আপনার সহিত পরিচয়ে আপ্যায়িত ও আপনার আত্মীয়তা ও আদর যত্নে নিতান্ত অনুগৃহীত হইয়া আসিয়াছিলাম। আপাততঃ নিতান্ত প্রয়োজনে পড়িয়া নিম্নে কয়েক ছত্র লিখিলাম। ত্বরায় একটা সংবাদ দিবেন।

আমি বাটী ফিরিয়া আসিয়াই আপনাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে আপনার ওখান হইতে যাইবার সময়ে পথে নানাস্থানে কমলকুমারের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কোন সংবাদই পাই নাই। যদি তাহার কোন সন্ধান পাইয়া থাকেন তবে ত্বরায় সংবাদ দিবেন। এখানে যাঁহারা তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাঁহাদের কন্যাটী বড় হইয়া পড়িয়াছে। আসার পর দুই বৎসরেরও অধিক কাল কমলকুমারের সন্ধান পাইবার আশায় বিলম্ব করা গেল এবং অনুসন্ধানও করা গেল। আর অধিক বিলম্ব করা অসম্ভব বোধে কন্যার পিতামহ অন্যত্র বিবাহ স্থির করিয়াছেন। আমি কন্যাটীর পরিণাম চিন্তা করিয়া এবং তাহার জননীর নির্ব্বন্ধতাতিশয়ে বাধ্য হইয়া আর একবার তাহার সংবাদ লইতে বলিতেছি। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে তাহার সন্ধান পাইলেও, বোধ হয়, সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।

এই অঞ্চলের একটী বাবু (আলমবাজারে বোর্ণীও কোম্পানির কলে চাকুরি করেন) বলিয়াছিলেন যে একটী মা বাপ মরা ব্রাহ্মণের ছেলে তাঁহাদের বড় বাবুর বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া করিয়া থাকে। সে ছোকরার নাম স্মরণ

নাই। তবে নামটা কমলকুমার হইলেও হইতে পারে। তাহার বাড়ীটা আপনাদের ঐ অঞ্চলে। কিছু দিন হইল এই সংবাদ পাইয়াছি কিন্তু আলমবাজারে গিয়া সংবাদ লইবার আমার আর সুবিধা হয় নাই। সে ভদ্রলোককে সংবাদ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম কিন্তু তাহার কোন সংবাদই পাইলাম না। যদি আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া একবার তাহার সংবাদ লন, তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিব।

আমরা এই মেয়েটীকে লইয়া একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিতেছে। কিন্তু কোথাও পছন্দ হইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ আপনাকে সাক্ষাতেই বলিয়াছি—১২৭৪ সালে কয়েক মাস কমলকুমার এখানে ছিল—তাহার স্বভাবগুণে এবং কথাবার্ত্তায় এখানকার সকলেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। এ আকর্ষণ এত বেশী, যে, আজও তাহার জের মিটিল না। তাই বলি এখনও তাহাকে পাওয়া গেলে বড় ভাল হয়।

এবাটীর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। ত্বরায় মহাশয়ের কুশলসমাচারসহ সংবাদ দিবেন। নিবেদন ইতি ২৩ আশ্বিন সন ১২৭৯ সাল। *

একান্ত বশংবদ

শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালীকুমার পত্র পাইয়া পরদিনই আলমবাজার যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার দুঃখ ও মনস্তাপের সীমা রহিল না। নিতান্ত হতাশ ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া গৃহে ফিরিলেন—বাটী আসিয়া গৃহিণীর নিকট তাঁহার দেবর লক্ষ্মণের সংবাদ দিলেন। সংবাদ শুনিয়া সকলেই নিতান্ত পরিতপ্ত হইল। কালীকুমার চন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে অন্যান্য কথার মধ্যে কমলকুমারের বিষয় লিখিয়া দিলেন যে "কমলকুমার আলমবাজারে ছিল, এখন নাই। কেহ তাহার উপস্থিত কোন সংবাদই দিতে পারে না। কোথায় কি অবস্থায় আছে, কিংবা আছে কিনা, সে বিষয় নিশ্চিৎ-

---

* আমরা ঠিক এইরূপ একটী ঘটনার বিষয় অবগত আছি এবং এইরূপ একখানি পত্র নিজে পাঠ করিয়াছি।

রূপে কেহ কিছুই বলিতে পারে না। যে যে স্থানে অনুসন্ধানের প্রয়োজন, আর একবার তাহা করিব। যদি ১৫ই অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে কোন সন্ধান পাই, জানাইব। কোন সংবাদ না পাইলে জানিবেন, যে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।”
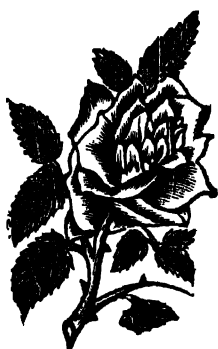
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনাহারে পথে পথে।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। অনাহারে পথ চলিতে চলিতে কমলকুমার সুখচরের নিকট বারাকপুর ট্রাঙ্করোডের উপর এক বৃক্ষতলে বসিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব দিনে—মধ্যাহ্নে আহার জুটিয়াছিল—সন্ধ্যায় কেবল আহার হয় নাই, তাহা নহে, রাত্রিতে মাথা রাখিবারও স্থান জুটে নাই। কলিকাতার রাজপথে সমস্ত রাত্রি পথে পথে ঘুরিয়া কাটাইতে হইয়াছে। পুলিসের হাতে পড়িবার ভয়ে কমলকুমার কোথাও কাহারও দ্বারে বা বাহিরের বারাণ্ডায় বসিতেও সাহস করে নাই। সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরে সমস্ত প্রাতঃকাল পথ হাঁটিয়া ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত শরীরে বৃক্ষতলে যেমন বসিল, অমনি ঘুমাইয়া পড়িল। অপরাহ্নে নিদ্রা ভঙ্গে দেখে তাহার উত্থান শক্তি নাই। সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। হস্ত পদ অবশ হইয়া পড়িয়াছে—এইরূপ অবস্থায় তাহার বহু দিন কাটিতেছে। কিন্তু তবুও তাহার শিক্ষা হয় নাই, সংশোধনও হয় নাই। যে অন্যায় কার্য্যে ঘৃণা, আশ্রয়চ্যুত হইয়া, তাহাতে অনুরাগ—তাহাতে আসক্তি বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে যে পাপ কার্য্যে প্রবৃত্তি নিবন্ধন এই দুর্দ্দশার সূত্রপাত, স্থিতি ও বৃদ্ধি তাহার কবল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। লোক ইচ্ছা করিলে—নিজে নিজেকে বাঁচাইতে পারিলে, সংসার স্বর্গরাজ্য হইত। ভাল হইতে, ভাল থাকিতে, ভাল চলিতে, কেনা ইচ্ছা করে? কেনা ইচ্ছা করে, অর্থে, সম্পদে, সম্ভ্রমে বা ধর্ম্মে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবীতে

আরোহণ করে? কিন্তু মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতিতে তাহার সামঞ্জস্য নাই—সামঞ্জস্য ভিতরে নহে—বাহিরে সামঞ্জস্য, আপনাতে নহে, অন্যেতে। বালক হউক, যুবা হউক, বৃদ্ধ হউক, জ্ঞানী বা প্রবীণ হউক, পুরুষ বা স্ত্রীলোক হউক, সম্পূর্ণরূপে অন্যদীয় শক্তির অধীন না হইলে—উপযুক্ত উপদেষ্টা ও পরিচালক না পাইলে, পাইয়া তাহাতে সমগ্র হৃদয় মনের সহিত আত্ম সমর্পণ না করিলে, সামর্থ্যের অল্পতার সহিত অনন্ত আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য হয় না—দুঃখ দুর্দ্দশার বিরাম হয় না—শোক সন্তাপের নির্ব্বাণ হয় না। প্রবৃত্তিপরিচালিত মানুষ না বুঝিয়া সুখের লালসায় দুঃখ ভোগ করে—সম্পদের প্রলোভনে বিপদ বেষ্টিত হইয়া হাহাকার করে। কমল কুমার এখনও বালক, অরক্ষিত ও অশাসিত বালকের অবস্থা যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। ভাল হইবার, সৎপথে থাকিবার কত আয়োজন করিল, সংসারের প্রতিকূল অবস্থা কতবার তাহা ভাঙ্গিয়া দিল। আশ্রয় লাভ করিয়া অবস্থা বৈগুণ্যে ও বুদ্ধির দোষে বার বার তাহা হইতে বঞ্চিত হইল।

আলমবাজারে লালমোহন বাবুর বাসায় যে সুখের অবস্থায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছিল, যে অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গুণগুলি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, যে অবস্থায় সে দশজনের প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, সে অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাক্ষাৎভাবে তাহার নিজের দোষ না থাকিলেও, তাহার বুদ্ধির দোষ যথেষ্ট হইয়াছিল। কুটিলবুদ্ধি পুরন্দর তাহাকে বিপাকে ফেলিয়া বিপদ ঘটাইবে, এটী সে বেশ বুঝিয়াছিল, তখনই বুঝিয়াছিল, যখন পুরন্দরের ভাবভক্তি, চলা ফেরা, কাজ কর্ম্ম কমলকুমার মনে মনে অপছন্দ করিতেছিল। সে যে বাড়ীর জামাই হইলে হইতে পারে, সে বাড়ীতে পুরন্দরের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ তাহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিল, যতই সে গোপনে গোপনে বিরাগ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব মনে মনে পোষণ করিতেছিল, ততই দুর্ম্মতি পুরন্দর ভিতরে ভিতরে তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের মন্ত্রণা আঁটিতেছিল। গৃহিণীর মনে কমলকুমারের সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল—গৃহিণীর দ্বারা কর্ত্তারও কাণভারি করিতে লাগিল—কিন্তু লালমোহন বাবু খুব চতুর লোক। কার্য্যসূত্রে দিবানিশি ভাল মন্দ উভয়বিধ লোকের সহিত মিশিয়া থাকেন, তাই কমলকুমারকে সহজে মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না—সাধারণ ভাবে সকল দিক সুপ্রতুল

করিয়া রাখিয়া পুরন্দর কমলকুমারকে লইয়া কলিকাতায় যায়—কলিকাতায় যে স্থানে যে অবস্থায় কমলকুমারের সহিত পাঠকের শেষ সাক্ষাৎ হয়, তাহারই ফলে নিরাশ্রয় অনাথ বালক গৃহ-বহিষ্কৃত ও তাড়িত হয়।

পুরন্দর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া বিকল মূর্ত্তি—সুরামত্ত কমলকুমারকে তাহার শয়নাগারে রাখিয়া যায়। যাইবার সময়ে সাবধানে পলায়ন করে। পুরন্দর আপন বাসায় আহারাদি করিয়া, কিছুক্ষণ পরে একাকী বাবুর বাসায় আসিল—যেন কিছুই জানে না। বাড়ীর ভিতর বসিয়া অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে কথা কহিয়া একবার উঠিল—বাহিরে গেল—আবার ফিরিল। ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কমলকুমার কোথায়? সকলেই এক সময়ে বলিয়া ফেলিল, কাল ছুটী আছে, সে বোধ হয় খেয়ে শুয়েছে। পুরন্দর বলিল "কই আমিও ত অনেকক্ষণ বসিয়া আছি তাহার সাড়া শব্দ কিছুই নাই। আর খেলেই বা কখন? গৃহিণী পাচিকাকে ডাকিয়া কমলকুমারের খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিল "কই কমল বাবু ত খান নাই। আমি তাঁহার ভাত নিয়ে, বসে আছি।" তখন কর্ত্তা চাকরকে বলিলেন "দেখ্‌তো রে কমল ঘরে আছে কিনা?" চাকরটী কমলকুমারের বড়ই অনুগত, পাছে ঠিক সংবাদ না দেয়, এজন্য পুরন্দরও কথায় কথায় চাকরের সঙ্গে বাহিরের ঘরে চলিল। আলো হাতে চাকর বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে অবাক! স্পন্দরহিত!! ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া যেমন বাহির হইবে, অমনি পুরন্দর পশ্চাৎ হইতে বলিল "গোপাল কি দেখ্‌লে, ব্যাপার কি বলত?" গোপাল কমলকুমারকে কেবল ভালবাসিত, তাহা নহে, তাহাকে ভাল ছেলে বলিয়া জানিত, বলিল "কমল বাবু বোধ হয় কোথাও খুব বেশী খাবার খাইয়াছিলেন, তাই বমি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আমি পরিষ্কার করিয়া দিতেছি, আর এখন ঘুম ভাঙ্গাইয়া কাজ নাই।" গোপালের সিদ্ধান্তে পুরন্দরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া পুরন্দর গোলমাল করিতে লাগিল। গোপাল নিষেধ করিল। পুরন্দর "মদের গন্ধ—মদের গন্ধ" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন লাল-মোহন বাবু বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কমলকুমারকে দেখিতে গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বাবু ক্ষণকাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আঘাত পাইয়া, পরক্ষণেই দুর্জ্জয় গর্জ্জনে গৃহের চারিদিক

কম্পিত করিয়া তুলিলেন—বলিলেন "এই কি প্রথম? প্রথম হলে এমন ভাবে বাড়ী আসিয়া চুপচাপে শুইতে পারিবে কেন? এ ছোকরা এই ভাবেই চলিয়াছে! 'বর্ণচোরা আঁব' ভিতরে ভিতরে পাকিয়াছে,বাহিরে যেমন কাঁচা তেমনই আছে! বাবা! সর্ব্বনেশে ছেলে! কালই বিদায় করিয়া দাও।" বাড়ীতে একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সকলেই কমলকে ভাল ছেলে বলে জানে, কেহই কমলকুমারের বেচাল দেখে নাই, তাই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কিন্তু পুরন্দরের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ। সে বলিতেছে, "আমি মধ্যে মধ্যে ওকে মন্দ সঙ্গে দেখিছি, এরূপ বাড়াবাড়ি না দেখিলেও একটু আদটু খেতেও দেখিছি।" বাবু বলিলেন "আমাকে বল নাই কেন?" পুরন্দর বলিল "আপনাদের সকলের মুখে উহার প্রশংসাই শুনি, আমার ধারণা, সেরূপ স্থলে স্বচক্ষে কিছু না দেখিলে সহজে বিশ্বাস নাও করিতে পারেন,তাই বলি নাই। এখন দেখিলেন, বিশ্বাস করিলেন, তাই বলিলাম।" গৃহিণী বলিলেন, "একে পরের ছেলে, তাতে গরিব—নিরাশ্রয়, রীত চরিত্র ভাল নাহলে কথনই বাড়ীতে রাখা উচিত নয়।" কমলকুমারের ভাগ্যদেবী আবার বিমুখ হইলেন। কমলকুমার বরাহনগরের হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে পুরন্দরের চক্রান্তে আশ্রয়চ্যুত হইয়া পুনরায় পথের পথিক হইল।

সে আজ চারি পাঁচ মাসের কথা। কমলকুমার পৈতৃক গুণে ভয়ানক একগুঁয়ে ও জেদাল। নিজের অপরাধের পরিমাণ অতিরঞ্জিত হইলে, নিজের পক্ষসমর্থনের প্রয়াসী হওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নিজে বিপন্ন হইবে—উৎসন্ন যাইবে—মরিবে, সেও ভাল, তবুও নিজের বিষয়ে তাহার নিজের কথা বিশ্বাস না করিয়া যে অন্য প্রমাণ চাহিবে, তাহার নিকট কমলকুমার নীরব, সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যাকুল নহে। তাই পরদিন প্রাতঃকালে বহু সাধ্য সাধনায়ও নিজের বিষয়ে একটী কথাও না বলিয়া কেবল পুরন্দর কর্ত্তৃক গৃহকর্ত্তার যে বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে, যে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে, ইঙ্গিত মাত্রে তাহারই আভাস দিয়া কমলকুমার বিদায় হইল। বাবু বলিলেন "যাইবার পূর্ব্বে তোমার আচরণের ছাপাই দাও, আমি তোমাকে তাড়াইব না।" এই কথায় বাড়ীর সকলেই আশ্বস্ত হইয়া কমলকে বুঝাইতে লাগিল ও পরামর্শ দিল যে বাবুর কাছে বল "আর এমন কাজ কখনও করিব না।" তাহা হইলেই সব

গোল মিটিয়া যাইবে। কমলকুমার সকলের সম্মুখেই বলিল "কন্যাকার ঘটনায় আমার দোষাপেক্ষা গুণই অধিক, কিন্তু তাহা প্রমাণ করা কঠিন, প্রমাণ-প্রয়াসীও নহি, তবে আপনার (বলিতে বলিতে কমলকুমার কাঁদিয়া ফেলিয়াছে) অবিচলিত স্নেহে এতদিন লেখাপড়া শিখিতে ছিলাম, আপনি আমার অসময়ের অন্নদাতা—পিতা, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" পায়ের ধূলা লইয়া কমলকুমার বিদায় লইল। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, "আপনি সাবধান হউন, আমি পথের ছেলে পথেই ভাসিলাম, আপনার ঘরে সাপ ঢুকিয়াছে সকলকেই খাইবে।" কর্ত্তা যেন বুঝিয়াও বুঝিলেন না, সকল কথা সকলের নিকট কহিলেন না। দু চারি দিন পরেই কমলকুমারের তাড়িত হওয়ার প্রকৃত কারণ এবং কারণসংসৃষ্ট সমস্ত ব্যাপারটী বুঝিতে পারিলেন। সামান্য একটা উপলক্ষ করিয়া আলমবাজারের বাসা কিছু দিনের জন্য ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজে পাঁচ জনের সঙ্গে, বাসায় খাইতে লাগিলেন। পরিজনবর্গকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই কোন গুরুতর অপরাধের জন্য পুরন্দরের কর্ম্মটুকুও গেল। কিছুদিন কর্ম্ম কাজ না থাকায় বাড়ী বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিয়া পুরন্দর কলিকাতা হইতে সাত আট ক্রোশ দূরে দক্ষিণে বজবজের নূতন কলে কর্ম্মের চেষ্টায় যাত্রা করিল। দু দশ দিন যাতায়াত করিতে করিতে কুলি-খাটান ও কলচালান কাজ একটা জুটিল। বেতন হইল ১৮ টাকা, ইহার উপর দু চারি টাকা উপরি পাওনাও আছে। যে দিন পুরন্দর বজবজের কলে চাকুরি পাইল, সেই দিন কমলকুমার অনাহারে পথের ধারে বৃক্ষতলে শায়িত। সে বহু কষ্টে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী-ঘাটে নামিয়া হাত মুখ ধুইল। দুই অঞ্জলি শীতল জল পান করিয়া দারুণ জঠরানল নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পাইল। অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেও, সে হতভাগার এ জ্ঞান হয় নাই যে, জলে আগুন নিবিলেও উদরের জ্বালা নির্ব্বাণ হয় না। মন্দীভূত-প্রায় জঠরানল জলস্পর্শে জ্বলিয়া উঠিল এবং শত শিখা বিস্তার করিয়া যুবককে চারিদিক হইতে দগ্ধ করিতে লাগিল। কমলকুমার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে চাতালের উপর বসিয়া পড়িল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী বিয়ের কনে।

কমলকুমার যে দিন একাকী সুখচরের নিকট বড় রাস্তার ধারে অবসন্ন শরীরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট, প্রজ্বলিত জঠরানলে উৎপীড়িত, কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া—চারিদিক শূন্য দেখিয়া—অন্ধকার দেখিয়া—শয়ন করিল, সেই দিন পুরন্দর বজবজের নূতন কলবাড়ীতে নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। নিরপরাধী উপবাসে বৃক্ষতলে, আর দুর্ম্মতি, নীচ-প্রবৃত্তি ও ইতর প্রকৃতির পুরন্দর সংসারের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আবার সুখ ও সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পাইল। সহসা উপরে উপরে দেখিলে, ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ে, পদে পদে বিধাতার বুদ্ধি বিবেচনায় সন্দেহ জন্মায়—মনে হয়, অনেক দিনের পুরাতন বিধাতা—অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পূর্ব্বের আমলের বিধাতা—বয়স অনেক হইয়াছে—ভীমরথী দশাগ্রস্ত, পদে পদে ভুল ভ্রান্তি হইতেছে; আজ কালকার মত নূতন ধরণের নবীন বয়সের একজন বিধাতা পুরুষ পাইলেই ভাল হয়। কিন্তু এ সকল অবস্থা বিপর্য্যয়ের অন্তরালে মানব জীবনাভিনয়ের যে অংশ টুকু লুক্কায়িত—অদৃশ্য—যাহাকে কেহ অদৃষ্ট, কেহ বা ভাগ্য, কেহ বা কর্ম্মফল, আর কেহ বা ঘটনাচক্র বলিয়া থাকে, বহু অভিধানবিশিষ্ট, বহু ভাবে ব্যক্ত মানবের সেই অদৃষ্ট টুকুর নিয়ামক রূপে বিধাতা তাঁহার তুলাদণ্ড ধরিয়া বসিয়া আছেন। শত চেষ্টা করিলেও, তাঁহার ব্যবস্থার বিপরীত ফল ফলাইতে পারিবে না। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত চেষ্টাতেই কেবল সুফল ফলিয়া থাকে। যখন গায়ের রক্ত জল করিয়া—মাথার

ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মানুষ অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়, তাহার কার্য্যকলাপে জনসমাজ অবাক হয়, অসামান্য উন্নতি, সুখ সম্পত্তি লাভে, নীচ-প্রকৃতির লোক যখন ঈর্ষার চক্ষে দৃষ্টিপাত করে—প্রাণের লুকায়িত কুটীরে কাতরতা অনুভব করে—মরমে মরিয়া যায়,তখন সজ্জনমণ্ডলী তাহার কার্য্যপরম্পরা বিচিত্র গুণাবলী সন্দর্শনে—মুগ্ধ মনে—পুরুষকারের পূজা করে। ঐ পরশ্রী-কাতরতা জনসমাজের অর্দ্ধেকের অধিক পরিমাণ সুখ ও সৌন্দর্য্য হরণ করিতেছে,আর এই পুরুষকারের পূজাতে জনসমাজ মনুষ্যত্বের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

আজ ১৫ই অগ্রহায়ণ—অপরাহ্নে কমলকুমার নিজের কর্ম্মফল বা নিয়তি নিবন্ধন অনাহারে—বিষণ্ণ মুখে, পুষ্করিণী-তীরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। আর ঠিক সেই সময়ে সুন্দরীর জীবনব্যাপী সর্ব্বনাশ সাধনের সূচনা—তাহার ভাবী জীবনাভিনয়ের প্রথম অঙ্কপাত—তাহার শুভ বিবাহ হইতেছে। কমলকুমার অনাহারে—ক্লান্ত শরীরে—পুষ্করিণীর ঘাটে উপবিষ্ট, দিনমণি ম্লানমুখে পশ্চিম গগনের সীমান্ত প্রদেশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দীনতা দেখিয়া দীনহীনেরও দয়ার উদয় হয়। এমন সময়ে—এমন স্নিগ্ধ সুন্দর সন্ধ্যার প্রাক্কালে—কমলকুমার দেখিল—সুন্দরী! দেখিয়া তাহার সমস্ত শরীর সিহরিয়া উঠিল। বিবাহের কনে সুন্দরী! বসন ভূষণে সুসজ্জিত সুন্দরী!! ছায়ার ন্যায় সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল!!! বলিয়া গেল "অরক্ষিত ও অসহায় পাইয়া আমাকে অন্যে লইয়া গেল, তুমি রক্ষা করিলে না? তোমারই জন্য বসিয়াছিলাম,আমার মা কত দিন ধরিয়া তোমারই জন্য দিবানিশি কাঁদিয়াছেন,আজ আমাকে তোমার হাতে না দিয়া অন্যের হাতে দিতে, চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। আমার ত সুখের সীমা নাই। এ জীবনে চিরদিন তোমারই জন্য কাঁদিব। আজ বুঝিলাম সংসারে সুখও আছে, দুঃখও আছে; অনেক লোকের ভাগ্যে সুখ দুঃখ দুই হয়, কিন্তু আমার ভাগ্যে নিভাঁজ দুঃখ। দুঃখের একটানা স্রোত সমানে জীবন ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আজ—আজ তাহারই আয়োজন হইল। যেখানে যে অবস্থায় যাহার হাতে পড়িনা কেন, সংসারের অত্যাচারে—মনের দুঃখে—হৃদয়ের সন্তাপে—যখন জরজর হইব, তখন সকল ভুলিয়া তোমাকেই স্মরণ করিব; কয়েক দিনের ধূলা খেলায় তোমাকে সুখের সঙ্গী—মনের মত খেলবার লোক মনে করিয়া-

ছিলাম, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হইত, তাই অনেক সময়ে মনে মনে তোমাকেই পূজা করিয়াছি। যে অবস্থায় যেখানেই থাক, তুমিই দেবতা—তোমাকে প্রণাম।" সর্ব্বনাশ! সহসা কেন এমন হইল? ছায়াবাজীর অভিনয়ের মত, পলকমধ্যে এত গুলি কথা বলিয়া সুন্দরীর চলিয়া যাওয়া—বায়ুভরে আসিয়া বায়ুবেগে চলিয়া যাওয়া—এত অনুরাগ —এত সোহাগ—সমাদর ও পূজা—এত ভালবাসা—এত প্রাণের টান ত কমল কুমার পূর্ব্বে ঠিক অনুভব করিতে পারে নাই। কমলকুমার সুন্দরীকে পছন্দ করিত, ভালবাসিত, আদর করিত, সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ হইলে সুখী হইত, কিন্তু যে প্রেমে পলকে প্রলয় হয়, যাহা পাইলে স্বর্গ-সুখ ভোগ—না পাইলে, নরকের নিভৃত কোণে, গভীর অন্ধকারে মানুষ হাহাকার করে—যাহা পাইলে, মানুষ একটা নূতন প্রাণ পাইয়া নবজীবনের পথে সবল, সুস্থ ও প্রফুল্ল মনে অগ্রসর হয়, যাহা না পাইলে, মানুষ দীর্ঘ-জীবনেও মৃতবৎ ইতর জীবের শ্রেণীভুক্ত, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কৃপাপাত্রমাত্র—দীনহীন হতভাগ্য কমলকুমারের অপেক্ষাও সে অধমাধম।

আজ কমলকুমার একি দেখিল! কি শুনিল! কে কি বলিয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরীই যে আসিয়াছিল, তাহার পোষাক যে কনের পোষাক, তাহার দুটী চক্ষে যে জলধারা প্রবাহিত, সে যে ছায়ার মত চলিয়া যাইবার সময়ে, করজোড়ে প্রণাম করিয়া গেল, এতে আর একবিন্দু সন্দেহ নাই! কিন্তু কেন এমন হইল? এ রকম কি হইতে পারে? এই অসম্ভব ঘটনায় চিত্তের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইল। ভয়, ভাবনা ও যন্ত্রণা তিনে মিলিয়া কমলকুমারকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা হইল, সুন্দরী যেমন বায়ুবেগে আসিয়া চলিয়া গেল, সেও তেমনি করিয়া তখনই শ্রীধরপুরে সুন্দরীদের গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়—গিয়া দেখিয়া আসে সত্যই তাহার বিবাহ হইতেছে কিনা, আর তাহারা সকলে কেমন আছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

একাকী অন্ধকার গৃহে।

সন্ধ্যা অতীত প্রায়, কমলকুমার ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে গাত্রোত্থান করিল। নিকটে সুখচরে এক আত্মীয়ের বাস। কমলকুমার বহু কষ্টে সেই দিকে অগ্রসর হইল। এরূপ আত্মীয়স্থল নিকটে থাকিতে সে প্রাতঃকাল হইতে উপবাসে বৃক্ষ-তলে ও পুষ্করিণী তীরে বসিয়া দিন কাটাইল কেন, সহসা পাঠকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কমলকুমার যে অবস্থাতেই পড়ুক না কেন, তাহার আত্ম-সম্মান বোধ এখনও একবারে চলিয়া যায় নাই। যে সকল আত্মীয় স্থলে বালক ইতিপূর্ব্বে পিতামাতার জীবদ্দশায় সসম্ভ্রমে আসিয়াছে গিয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে, সেই সকল স্থানে দীনহীনের বেশে, কাঙ্গালের মত, যাইতে লজ্জাবোধ করে, তাই অধিকাংশ সময়ে দিনের বেলা আহার জুটে না, উপবাসেই কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার পর কোন দিন অতি কষ্টে কোন আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করে, প্রাতঃকালে গৃহের সকলের উঠিবার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া যেখানে একবার গিয়াছে, সেখানে আর যায় না। কমলকুমারের এইরূপ দুর্দ্দশা হইবার পর, অনেক দিন হইল, একবার ইহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার সময়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইল। বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ সকলেই কমলকুমা-রের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কমল-

কুমার লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারে না। কোন উত্তর দিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, এত বিপদে পড়িয়া, এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া, এত মন্দ লোকের হাতে পড়িয়াও কমলকুমার মিথ্যা কথা কহিতে শিখে নাই। সত্য কথা বলা তাহার স্বাভাবিক গুণ ছিল। নিজের বিষয়ে লোকের নিকট কিছু বলিতে হইলে, অভীষ্ট সিদ্ধির উপযোগী কথা না বলিয়া, ঠিক কথাই বলিত। ঠিক বলিলে অনেক স্থলে ঘৃণার পাত্র হইতে হয়, তাই অনেক সময়ে কোন কথাই না বলিতে হয় এরূপ চেষ্টা করিত, এবং দীর্ঘকালের জন্য একস্থানে অবস্থান করিত না। আজ রাত্রিতে ইঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াও সেই অসুবিধায় পড়িতে হইল। যত সহজে, যত অল্প কথায় সম্ভব, নিজের কথা বলিয়া অব্যাহতি পায়, তাহার চেষ্টা করিল। রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ আর শুইতে না শুইতে নিদ্রা দেবীর অনুগ্রহ হইল না। আজ কমলকুমার অন্ধকার গৃহে শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে, চারিদিক যেন আলোক-মালায় উদ্ভাসিত, বহু লোকের গমনাগমনে একটা ভয়ানক জনতা—বহুস্বর মিশ্রিত একটা কোলাহল,কমলকুমারের সমক্ষে যেন একটা বৃহৎ অনুষ্ঠানের পরিচয় দিতেছে। বহুদিন ধরিয়া অনাহার ও একাহার নিবন্ধন ক্ষীণ ও ক্লিষ্ট শরীর মনের উপর এইরূপ জনতা ও কোলাহলপূর্ণ সমারোহের দৃশ্য অসহ্য বোধ হওয়াতে, কমলকুমার চক্ষু মুদ্রিত করিল, চক্ষু বুজাইয়াই দেখে—সুন্দরী! সুন্দরী ম্লান মুখে কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে,লৌহ কোমল হয়—পাষাণ গলিয়া যায়—চিরশত্রু চিরসুহৃদ হয়—মানুষের কঠোর প্রাণে দয়ার সঞ্চার হয়—কমলকুমার সরল ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়—তাতে সুন্দরীকে ভালবাসে—সে সুন্দরীর সেই কাতরতাব্যঞ্জক নীরব মুখে, কত প্রেম—কত ভালবাসা—কত সোহাগ—কত আদর অনুভব করিল, এই দুঃখের দিনে অপরিমেয় প্রীতি অনুভব করিল। পরক্ষণেই "সুন্দরি! তুমি কই, তুমি কোথায়?" এই বলিয়া কমল কুমার যেমন উঠিতে—উঠিয়া ধরিতে যাইবে,অমনি শয্যা হইতে গৃহতলে পতিত হইল। পতনের সঙ্গে সঙ্গে হৃতচৈতন্য হইয়া কেমন একটা অস্পষ্ট শ্রুতিকঠোর শব্দ করিতে লাগিল।

পার্শ্বের শয্যাতে বাড়ীর অপর একজন শয়ন করিয়াছিলেন—তাঁহার নিদ্রা-

কর্ষণ হইয়াছিল। পতনের শব্দে চমকিত হইয়া একবারে উঠিয়া বসিয়াছেন—কিছু বুঝিতে না পারিয়া ত্বরায় আলো জ্বালিলেন। প্রদীপ হস্তে অগ্রসর হইয়া দেখেন, কমলকুমার গৃহতলে পড়িয়া গিয়াছে, হাত পা সব লৌহ অপেক্ষা কঠিন হইয়া বেঁকিয়া যাইতেছে, আর একটা অস্পষ্ট শব্দ হইতেছে, কিন্তু দাঁত লাগিয়াছে। তিনি জল আনিয়া তাহার মুখে চোখে মাথায় দিলেন। পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। চাকরটাকে উঠাইয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে একবার ডাকিতে বলিলেন। কর্ত্তা সংবাদ পাইয়া বাহির বাটীতে আসিলেন। কমলকুমারের অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তিত—ক্রমে একটু ভীত হইলেন। নিকটে একজন ডাক্তার ছিলেন, তখনই তাঁহাকে ডাকাইলেন। ডাক্তার আসিয়া কমলকুমারকে দেখিয়া বলিলেন, "এ কে? এখানে কবে আসিয়াছে, আসিবার পূর্ব্বে কোথায় ছিল, জানিতে না পারিলে ত কিছুই বলিতে পারিব না।"

গৃ-ক। আমার বড় জাজঠাকুরুণ ছিলেন জানেন ত? তাঁহারই ভাইপো।

ডা-বা। আহা, বলুন না বিদ্যালঙ্কারের ছেলে।

গৃ-ক। আপনি তাঁকে জান্‌তেন?

ডা-বা। আমি জান্‌বো না কেন? আমাদের বাড়ী থেকে ত বেশী দূর নয়, আর দূর হলেই বা কি? তাঁকে দেশের অনেক লোকই জানে। তা এমন অবস্থায় কেন? তাঁর ত বিষয় সম্পত্তি ছিল।

গৃ-ক। সে সব গিয়েছে—গ্রামের পাঁচজনে ছেলেমানুষ পেয়ে সব নিয়ে নিয়েছে।

ডা-বা। আর কি দেখ্‌বার লোক কেউ নেই?

গৃ-ক। একটী ছোট ভগ্নী ও ভগ্নীপতি আছে, কিন্তু তারা দেখে না কেন, বা এ ছেলেটা সেখানে থাকে না কেন, সে সংবাদ ভাল জানি না।

ডা-বা। কবে এসেছে?

গৃ-ক। আজ সন্ধ্যার একটু পরে এসেছে।

ডা-বা। সমস্ত দিন কোথায় ছিল?

গৃ-ক। বোধ হয় পথে পথে।

ডা-বা। অবস্থা দেখে কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় এর কখন কখন একটু ফিট হইয়া থাকে। তাহার উপর সমস্ত দিন রৌদ্রে পথ-

হাঁটিয়াছে, তাই এমন হইয়াছে,বহু কষ্টে দাঁত ছাড়াইয়া দিয়া বলিলেন একখানা ফরসা ন্যাকড়া ভিজিয়ে কপালে দিয়ে দিন। মাথায় অনেক চুল, বেশী জল দিবেন না। ইহার উপর জ্বর হইলে বাঁচ্‌বে না। মাথার গোলই বেশী। আমার সঙ্গে একটা লোক দিন্, এখনই একটা ঔষধ দিব, সেটা এক ঘণ্টা অন্তর তিনবার খাওয়াইলে যদি বিশেষ উপকার না হয়, তাহা হইলে আমাকে আবার ডাকাইবেন। একটু খারাপ হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও বিশেষ ভয় নাই।

গৃ-ক। দেখুন দেখি, পরের ছেলে—তাতে বাপের এক ছেলে, একটু ভাল করে দেখ্‌বেন, যেন কোনমতে সাম্‌লে যায়, এই বলিয়া হুটী টাকা তাঁহার হাতে দিলেন।

ডা-বা। একি? রামেশ্বরের ছেলে, তিনি আমাদের গুরুদেবের আত্মীয় ছিলেন। এই কথা বলিয়া জিব কাটিলেন। ঔষধের বিল করিব না—যখনই দরকার হইবে ডাকাইবেন।

গৃ-ক। আপনার অনুগ্রহে নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম।

রাত্রিতে ১ম বার ঔষধ খাওয়াইতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। ২য় বার অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশে ঔষধটুকু গলাধঃকরণ করান গিয়াছিল। ৩য় বার অপেক্ষাকৃত আরও সহজে হইয়াছে। ডাক্তার বাবু প্রাতঃকালেই সর্ব্বাগ্রে কমলকুমারের সংবাদ লইলেন। আসিয়া দেখিলেন সে ভাল আছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল, এমন কি কথা কহিতেও পারে না। তখন ডাক্তার বাবু সমস্ত দিনের মত আর একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতেই কমলকুমার অল্পে অল্পে আরোগ্য হইয়া উঠিল। কমলকুমার চতুর্থ দিবসে দেখিল তাহার হাতে পায়ে পূর্ব্ববৎ সামর্থ্য হইয়াছে—তখন আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। পরদিন প্রাতঃকালে বাটীর সকলকে বলিয়া আবার পথের পথিক হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চাকুরির চেষ্টায় বজবজে

আলমবাজারের আশ্রয় ত্যাগ করার পর পথে পথে আট নয় মাস এইরূপে কাটিয়াছে, ক্রমে প্রায় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। কমলকুমারের মন হইতে লেখা পড়া শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা একবারে তিরোহিত না হইলেও উপস্থিত অবস্থায় কর্ম্ম কাজের চেষ্টাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে—কি কাজ করিবে? বেশী লেখা পড়া শিখে নাই—হাতের লেখাও ভাল নয়। নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া কোন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত লোপ পাইতেছে। আলমবাজার ত্যাগ করার সময়ে কলের বাবুদের কাছে সর্ব্বদা বজবজের নূতন চটকলের কথা শুনিত এবং অনেকে সেখানে কাজের চেষ্টা করিবে, একথাও শুনিত, তাই বৈশাখের শেষে ধীরে ধীরে কলিকাতা পার হইয়া, খিদিরপুরের পোল পার হইয়া ডায়মণ্ডহারবার-রোড ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন অপরাহ্নে বজবজে গিয়া উপস্থিত হইল। এক দোকানে ২।৩ দিনের জন্ত বাসা করিয়া কল বাড়ীতে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্প লেখা পড়া জানিয়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বা কিছু ইংরাজী কিছু হিন্দি ও কিছু বাঙ্গালা এই তিনের মিশ্রণে তৈয়ারী এক রকম নূতন ভাষায় কল বাড়ীর সাহেবদের সঙ্গে কথা কহিয়া কাজ বুঝাইয়া দিয়া চাকুরি করা চলে—বাবুগিরি

চলে—অনেক রকমে অনেক লাভও থাকে। কমলকুমার অনেক রকমের লাভের প্রত্যাশা না রাখিয়া কেবল ভদ্র ভাবে চলিবার মত একটা কর্ম্মের প্রার্থী।

কোন পরিচিত লোক না থাকিলে, কিংবা বিশেষ ভাবে ব্যক্তি বিশেষের নজরে না পড়িলে,কর্ম্ম কাজের সুবিধা হওয়া ও উন্নতি করা সহজ নহে। সুতরাং কমলকুমারের চেষ্টায় কোন সুফল ফলিল না। চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার সময়ে কমলকুমার নিতান্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া কল বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময়ে পথে সহসা পুরন্দরের সহিত কমলকুমারের দেখা হইল। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া চমকিত হইল—উভয়ে নীরবে ক্ষণকাল উভয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে পুরন্দর বলিল "কি ঠাকুর! এখানে কোথা থেকে?" কমলকুমারের দুটী চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইল। আবার পুরন্দর! ভাবিতে বেচারার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে অতি কাতর ভাবে একটীবার আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া পড়িল। পুরন্দরের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহার প্রাণে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। পুরন্দর অগ্রসর হইয়া কমলকুমারের হাত ধরিয়া উঠাইল এবং সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেল।

রাত্রিতে কমলকুমারের প্রতি নিজের কৃত অপরাধ ও তাহার প্রতিফল প্রাপ্তির কথা বলিল, দুঃখও করিল দেখিয়া কমলকুমার নিজের বজবজে যাত্রার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিল। পুরন্দর কল বাড়ীর সকল বিভাগের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিল "কই, কোথাও ত ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজ খালি নাই। আর তুমি ত অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। আফিসের কাজ কি হাজিরা বাবুর কাজ, কি ঐরূপ অন্য কোন কাজ জুটিবার সম্ভাবনা কোথাও কিছু নাই শুনিয়া কমলকুমারের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। আর থাকিলেও পুরন্দরের সহায়তা পাওয়াও সম্ভব নহে,সে তাহা বেশ বুঝিতে পারে। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কমলকুমার পরদিন বজবজ ত্যাগ করিয়া আসিবে স্থির করিল—কিন্তু যখন চিন্তা করিল "কোথায় যাইবে" তখন তাহার সমগ্র সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। পুরন্দর তাহা বেশ বুঝিতে পারিল, কিন্তু কি কারণে [illegible] প্রতিজ্ঞা-সূত্রে কমলকুমার বিপন্ন বলিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল, তাহা [illegible] না—সংসারে কয়জনই বা তাহা বুঝিয়া থাকে। পুরন্দর কমলকুমার[illegible]জ্ঞাসা

করিল "ঠাকুর! এখন কোথায় যাবে?" কমলকুমার বলিল "বাড়ী হইতে যেমন অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আলমবাজারে গিয়া পড়িয়াছিলাম—আলমবাজার হইতে তোমারই কৃপায় তাড়িত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে যেমন ঘুরিতে ঘুরিতে আজ চারিদিন হইল এখানে আসিয়াছি, তেমনি এখান হইতে আবার অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে চলিলাম, যেখানে বিধাতা বসাইবেন সেইখানে বসিব।

পু। তুমি আলমবাজার ছাড়িয়াছ সেত প্রায় এক বৎসরের কথা, এতদিন কোথায় ছিলে?

ক। নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। বেশীর ভাগ পথে পথে কাটিয়াছে।

পু। তোমার কথা বিশ্বাস হয় না।

ক। নাই হলো? সকলে কি সকলের কথা বিশ্বাস করিতে পারে?

পু। তুমি বল্‌ছো বেশীর ভাগ পথে পথে কেটেছে।—তাহলে কি তুমি বাঁচ্‌তে? আচ্ছা, খাওয়া দাওয়ার কি করিতে?

ক। যখন বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, তখন আর শুনে কি হবে?

পু। এত দুঃখ কষ্টে পড়িয়া কই তুমিত নরম হও নাই, সেই পূর্ব্বের মত উদ্ধত স্বভাব সমান আছে! (মনে মনে বলিল, থাক আমি তোমার তাত ঠাণ্ডা করে দিচ্চি) তুমি আমার উপর এখনও এত নারাজ কেন? সেই শ্যামপুখুরের ব্যাপারে? তাতে ত তোমারই জিত হইয়াছিল, আমি ত তোমাকে ফেলেও ফেলতে পারিনি—অসুবিধা করিয়াছিলাম বটে,কিন্তু তোমাকে ফেলতে পারিনি, মোটের উপর তোমারই যখন জিত হয়েছিল তখন আর আমার উপর এত রাগ কেন?

ক। তোমার উপর রাগ করিব কেন? আমার নিজের বুদ্ধির দোষ। আমি নির্ব্বোধের মত তোমার সঙ্গে না গেলে ত আর তুমি আমাকে যে টুকু বিপদে ফেলিয়াছিলে তাহাও ত পারিতে না। এখন এই যে ঘুরে ফিরে আবার তোমারই হাতে পড়িতেছি ইহারই বা ফল কি হইবে কে জানে?

পু। আমি সত্য সত্যই তাহার যথেষ্ট দণ্ড পাইয়াছি, আর তোমার সুবিধা করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, আমাকে সমস্ত বল।

ক। আচ্ছা বল্‌বো—তুমি কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে?

পু। এই এক বৎসর কেমন করে কাটালে?

ক্র। এই এক বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক দিনের অধিকাংশ একাহারে—আর কতক অংশ অনাহারে কাটিয়াছে। এক কালীন উপবাসের সংখ্যা ধরিলে, দুই মাসেরও অধিক হইবে। ভয়ানক পেটের জ্বালায় ঘাটের জল খেয়ে, গাছ-তলায় বসে ছটফট করেছি, এমন দিনও অনেক গিয়েছে।

পু। বল কি, এও কি কখন হয়? একথা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি অমর। তোমার ক্ষমতাও অসাধারণ—এখনও চেষ্টা করিলে, তুমি মানুষ হইতে পার। বড় লোক হইতে পার। আচ্ছা তুমি কাল যেওনা, এই খানেই থাক, যদি কিছু সুবিধা হয়, কাল একবার আমাদের সাহেবকে বলে দেখ্‌বো।

পুরন্দর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী ইচ্ছা। ২।১ দিন যাইতে না যাইতে তাহার ইচ্ছা আপনা আপনি লয় পাইল। কেন সে ইচ্ছার লয় হইল, পুরন্দরের পূর্ব্বের গোপন সঙ্কল্পের পরবর্ত্তী বিকাশেই তাহা প্রকাশ পাইবে। কমলকুমার কর্ম্ম কাজের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, যে দিন চলিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছে, সেই দিন পুরন্দর বলিল "দেখ ঠাকুর কোন সুবিধা ত হইল না।" কমলকুমার বলিল "এখন পথে পথে না ঘুরে এই খানে যে কাজ পাই আমি তাই করিতেই সম্মত আছি। তুমি আমাকে যে কোন কাজ যোগাড় করিয়া দাও, এমন কি কাজ আছে, যা আমি কর্‌তে পারি? আমাকে বল।" পুরন্দর বলিল "কাজ আর কি আছে? মুটে মজুরের কাজ আছে, পার্‌বে? তবে তাতে পরিশ্রম বেশী নয়। আমার ডিপার্টমেণ্টের কাজ এক জায়গায় দাঁড়্‌য়ে দাঁড়্‌য়ে ছোট নলী থেকে বড় বড় নলীতে কলে সূতা জড়াইতে হয়। হপ্তায় দেড় টাকা মাহিনা। বুঝে দ্যাখো।" কমলকুমার বলিল "পথে পথে ব্যাড়ানোর চেয়ে আমার মতে সেও ভাল। তুমি আমাকে তাহাই যোগাড় করিয়া দাও।"

পুরন্দর পরদিন প্রাতঃকালে কমলকুমারকে সঙ্গে লইয়া গেল এবং কেমন করিয়া ছোট নলী হইতে বড় নলীতে সূতা উঠাইতে হয় নিজে হাতে করিয়া দেখাইয়া দিল। কমলকুমার দেখিয়া বলিল "এ খুব সোজা কাজ, আমি বেশ পার্‌বো।" এই বলিয়া কাজে নিযুক্ত হইল।

অতি অল্প সময় মধ্যে কমলকুমার বুঝিতে পারিল, সহজ হইলেও এ কাজ

তাহার উপযুক্ত নহে, অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতে বুঝিতে পারিল এ স্থান তাহার হৃদয় মন ও মর্য্যাদার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ২।৪ দিন যাইতে না যাইতে সে বুঝিতে পারিল তাহার সমস্ত দিনের প্রতিবেশী মণ্ডলীর আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তা রীতি নীতি এতই কদর্য্য ও ঘৃণিত যে অধিক দিন সে সহবাসে থাকিলে ইতরত্বের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইবে। কমলকুমারের তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, অবস্থার প্রতিকূলতায় ও ব্যবস্থার দোষে, কোন দিকেই সুবিধা করিতে পারিতেছে না। সে নিজের ভাবী দুর্দ্দশার ইঙ্গিত পাই-য়াও সে স্থান ত্যাগ করিতে পারিল না। স্থান ত্যাগ করিবার পথে প্রধান অন্ত-রায় হইল পুরন্দর। বিধির বিপাকে পুরন্দর যে তাহার অবশিষ্ট জীবনী-শক্তিটুকু হরণ করিতে বসিয়াছে,কমলকুমার পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারে নাই। আত্মীয়তার জাল বিস্তার করিয়া পুরন্দর সরল যুবকের মন হরণ করিয়াছে। ক্রমে তাহাকে নিজের বাসায় পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। কমলকুমারের উপস্থিত চাকরি দুটী—একটী, প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে উঠিয়া কলে চাকরি করিতে যাওয়া—অপরটী, বেলা নয়টা বাজিলে বাসায় আসিয়া পাঁচ ছয় জনের (কলের লোক) পাকের কার্য্য একাকী সম্পন্ন করা। বলা বাহুল্য, রন্ধনের সমস্ত আয়োজন নিজেকেই করিয়া লইতে হয়। আহারান্তে বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলে মজুরের কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাসায় পূর্ব্বাহ্ণের ন্যায় ঐ লোক গুলির সেবা করিয়া শেষে অতি কষ্টে নিজের জঠরানল নির্ব্বাণ করে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয় দশটা পর্য্যন্ত এইরূপ পরিশ্রম করিয়া অতি মলিন, অতি কদর্য্য শয্যার বহু লোকের সহিত একত্রে শয়ন করিতে না করিতে সুখে নিদ্রা যায়। হপ্তায় হপ্তায় যে দেড়টাকা পায় তাহার অর্দ্ধেক নিজের খোরাকি বলিয়া পুরন্দরকে দক্ষিণা দিতে হয়। অবশিষ্ট যে বার আনা থাকে, তাহাও সঙ্গ দোষে বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। পিতৃগৃহে পিতার স্নেহ মমতায় যে বাল্যকালে শীতে দোলাই,র‍্যাপার ও শালের রুমালে দেহ আবৃত করিয়া সুখে ও সম্ভ্রমে কাল কাটাইয়াছে, আজ সে শীতে ছিন্ন পরিধেয়ে দেহ আবৃত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বহু পথ অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম স্থানে উপস্থিত হইতেছে। বর্ষায় মাথায় ছাতি নাই, শীতে পায়ে জুতা নাই, জল কাদায় ও শীতে জুতা না থাকায় পায়ের তলে ঝাঁঝরার মত কদর্য্য

দাগ হইয়া গিয়াছে—গায়ে একপুরু ময়লা পড়িয়াছে—উপবীতগাছি দীর্ঘকাল ধরিয়া পেনসনপ্রাপ্ত বৃদ্ধের ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ দেহে কণ্ঠাগত প্রাণে কণ্ঠায় সংলগ্ন! দেহের যত ময়লা সেই বৃদ্ধ উপবীতকে আশ্রয় করিয়াছে। এই ত গেল কমলকুমারের জীবনের প্রতি দিনের ২৪ ঘণ্টার সুখ। ইহার উপর আরও সুখ আছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী বিবাহ-রাত্রিতে।

আজ অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চদশ দিবসে গঙ্গাধর গোবিন্দগঞ্জের নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ বিধুভূষণের সহিত নিজ পৌত্রীর বিবাহ দিতেছেন। সুন্দরীর মা বহু চেষ্টায় আত্মগোপন করিয়া, দশজনকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অনেকেই বুঝিতে পারিতেছে যে তাঁহার মনে সুখ নাই,—হৃদয়ে শান্তি নাই। সুন্দরী আজ বিয়ের কনে, তাহার 'সাত খুন মাপ'। সে এমন ভাবে আছে যে, দেখিয়া বোধ হয় তাহার জীবনের এই বৃহৎ ঘটনার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। বিবাহবাড়ী হইলেও এখনও বর ও বরযাত্রীরা পৌঁছায় নাই, তাই সে চেষ্টা করিয়া ক্ষণকালের জন্য একা এক ঘরে বসিয়া কল্পনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক কমলকুমারের অনুসন্ধানে, নানা স্থানে ছুটাছুটী করিতেছে। তাহার মনে হইতেছে যেন গোধুলিতে এক উপবনের পুষ্পোদ্যানপরিবেষ্টিত পুষ্করিণীতীরে শীর্ণ দেহে ও ম্লান মুখে সেই সরল সুজন বসিয়া আছে! সে সর্ব্বজন পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে বসিয়া আছে, সংসারে কেহ তাহাকে দেখে না—আদর করে না, তাই অভিমানভরে একাকী বসিয়া আছে—কেউ দেখে না? নাই দেখিল, আমি ত দেখিতে চাই—আমার মা ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রান হইয়া

পড়িয়াছেন। সকলে ত্যাগ করিয়াছে? আমরা ত এক দিনের জন্যও ত্যাগ করি নাই—তুমি উপেক্ষিত,কই ? আমি চিরদিন তোমাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেছি, আর যে কয়দিন প্রাণটা ধড়ে থাক্‌বে, সে কয়দিন দেবতা বোধে তোমার—তোমারই পূজা করিব। তুমিই আমার দেবতা, আমি অন্য দেবতা দেখি নাই; অন্য দেবতার কথা জানি না।

সুন্দরী দেবতা বোধে কমলকুমারের মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া যখন প্রণাম করিতেছে, তখনই পুরাঙ্গনাদের হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ কোলাহলে বরের আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হইল। শঙ্খধ্বনি সুন্দরীর কর্ণে কামানের ন্যায় নিনাদিত হইল। সে ধ্বনি তাহার কোমল বক্ষে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল। সুন্দরী গলবস্ত্রে করজোড়ে ভক্তিভরে উদ্দেশে যখন কমলকুমারকে প্রণাম করিতেছে, তখনই, প্রণামান্ত হইতে না হইতে, তাহার প্রাণান্ত উপস্থিত হইল—সংসারের আনন্দ কোলাহলে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে নীরবে রুদ্ধশ্বাসে উপস্থিত বিপদ স্মরণ করিয়া, একটীবার বাতায়ন-পথে শূন্য দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকাইয়া বলিল "নারায়ণ! শুনেছি তুমি লজ্জা নিবারণ, ঠাকুরদাদার নিকট শুনেছি, মহাভারতের কৌরব সভায় তুমি রমণীর লজ্জা নিবারণ করেছিলে। আমিও তোমার শরণাপন্ন হইয়া একান্ত হৃদয়ে বলিতেছি,আমাকে রক্ষা কর। আমি যাহা চাই,যদি তাহা না পাই,তাহা-তেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ঠাকুর! যাহা চাইনা, তাহা আমার উপর চাপাইও না। আমার মাথায়,আমার সাধের সোণার মুকুট নাই দিলে?—খালি থাক—কাঁটার মুকুট বসাইয়া দিও না, সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। এ বিপদে আমাকে রক্ষা কর।"

দেখিতে দেখিতে বিবাহের লগ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল, বরসভা হইতে বরকে উঠাইয়া লইয়া গেল। চারিদিকে সমারোহের ভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। জাঁকজমক ও বহু সমারোহে সুন্দরীর বিবাহ হইতেছে। এমন সময়ে অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে একটা গোলমাল অল্প অল্প শুনা গেল। ব্যাপারটা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইলেও সকলে জানিতে পারিল না। সংবাদটা অল্প লোকের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। ছাল্‌নাতলায় সাত পাক দিবার জন্য কনে আন্‌তে বাহকদ্বয়ের প্রাণ বায়ু ফুরাইল। তিনবার বিশ্রামে সাত পাক হইয়া গেল।

একখানি বৃহৎ বস্ত্রে কিয়দ্দূর আবৃত করিয়া শুভদৃষ্টির আয়োজন করিতে না করিতে, পরামাণিক মহাশয় কতকগুলি চিরপ্রচলিত অতি মিষ্ট সম্ভাষণে অনেকের পতি পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপন করিলেন—অনেকের চক্ষু কর্ণের মাথাও খাইলেন। চন্দ্রনাথের স্ত্রী, নবীনা ননদিনীর বিবাহে বর-বরণ করিতেছিলেন, বরণ-কালে, তাঁহার হাতে, সম্পর্ক-সঙ্গত অনেকগুলি উপহার পাইয়া উপবাসী বরের অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়াছে। বাকি অর্দ্ধেক প্রাণ লইয়া সে বেচারা এখনও আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ভ্রাতৃজায়া ননন্দার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, একবার তাকাইয়া দেখ, কেমন সুন্দর বর হয়েছে। সুন্দরী চাহিল না। সে অনাবৃত মস্তক নত করিয়া রহিল। বর লজ্জার হাত এড়াইয়া একটীবার কনের দিকে তাকাইল। সে দেখিল, কনে সত্য সত্যই সুন্দরী! এমন সুন্দর মুখ আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। পলকের জন্য নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিল। কিন্তু কনে, চন্দ্রনাথের স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ আদেশে—উপদেশে—অনুনয়ে, একটীবারও চক্ষু খুলিতেছে না, সুন্দরী পলকের তরে লোচনানন্দ বিতরণ করিতেছে না। যখন সুন্দরীর প্রিয় সঙ্গিনীরা বহু সাধ্য সাধনায়ও পরাজয় মানিল, তখন স্নেহপ্রাণা জননী ভাবী অকল্যাণ ভয়ে দূর হইতে অতি কাতর স্বরে বলিলেন "ওমা লোচন! একবার তাকাও, একবার দেখ কেমন সুন্দর বর হয়েছে!" সুন্দরী এইবার নয়নাবরণ উন্মোচন করিল—তাকাইল, কিন্তু কোন্ দিকে তাকাইল, কেহ বুঝিতে পারিল না। বর একবার মনে করিল চারি চক্ষের মিলন হইয়াছে, আবার সন্দেহও হইতেছে। কনে সুন্দরী—নামও সুন্দরী—তাকাইল তাহাও সুন্দর; কি সুন্দর চোখ্! চক্ষু দুটী যেন জলে ভাস্‌ছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য—মনমোহন দৃষ্টি! প্রকৃত কথা সুন্দরী মায়ের অনুরোধে তাকাইতে, কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, নয়নপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া গিয়াছে। বাহকেরা কন্যা লইয়া চলিয়া গেল। শুভদৃষ্টির গোলমালের কথা বহু লোকের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গেল। এদিকে পুরুষেরা লোক জন খাওয়ান, আত্মীয়তা রক্ষা, বন্ধু বান্ধব বিদায় লইয়া সকলেই ব্যস্ত। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বর কনে লইয়া বাসর ঘরে হাস্য পরিহাসে নিযুক্ত। এই অবস্থায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। দ্বিপ্রহর আড়াই প্রহরে, আড়াই প্রহর তৃতীয় প্রহরে এবং ক্রমে তৃতীয় প্রহর চতুর্থ প্রহরে পরিণত

হইল। পূর্ব্ব দিকে সুখ-তারার উদয় দেখিয়া অনেক রঙ্গিণী বাসর ঘরের ফাঁকা রঙ্গে ভঙ্গ দিয়া নিজের নিজের ঘরে সুখের শয্যায় শয়ন করিতে অগ্রসর হইলেন। যাহাদের এতদপেক্ষা অধিক সুখের স্থান নাই, তাহারা আরও কতকক্ষণ অপেক্ষা করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাধর ও চন্দ্রনাথে।

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালেই বর কন্যা চলিয়া যাইতেছে। শ্রীধরপুর হইতে গোবিন্দগঞ্জ প্রায় দেড় প্রহরের পথ। শ্রীধরপুরের ন্যায় গোবিন্দগঞ্জও ইচ্ছামতীর তীরে। তাই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার সহিত দেনা পাওনার বিষয়, বরযাত্রীদের কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় মিটাইয়া শীঘ্র শীঘ্র বর ও কন্যা লইয়া যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। বিশেষতঃ শুভ যাত্রার সময়ও ৭ টা হইতে ৮ টার মধ্যে ছিল। তাই তাঁহারা অল্প সময় মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ বৃদ্ধ গঙ্গাধরের নিকট বসিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

গ। কেন হে ভায়া, অমন একটা সাংঘাতিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে যে? যেন একটা হাজার মণ বোঝা নামাইলে, ব্যাপার কি?

চ। এই মেয়েটার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাই ভাবিয়া মনটা কেমন অধীর হলো তাই দুঃখ হলো, শেষে ভাবিলাম 'জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ' তিনের উপর মানুষের কোন হাত নাই, তা নাহলে, অমত হলেও ত কমলকুমারকে আপনিই শেষে খুঁজিতে বলিয়াছিলেন। এখানে বি:য়র ঠিক হয়ে গেলে পরেও,

আমি মামীর অনুরোধে তাহার খোঁজ করিয়াছি—সংবাদ লইয়াছি, কিন্তু তাকে কোন মতেই পাওয়া গেল না! তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনের দুঃখের ভার হাল্‌কা করিলাম।

গ। কমলকুমার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র হইলেও, আমি অমত করিয়াছিলাম। ষোল আনা ইচ্ছা সত্বেও অসম্মত হইয়াছিলাম।

চ। কেন দাদা মশাই, ইচ্ছা সত্বেও অমত করেছিলেন কেন?

গ। ভাই! তার অনেকগুলি কারণ ছিল, তাহার মধ্যে দু তিনটী খুব গুরুতর। সে দু তিনটী কারণ না থাকিলে, অপর গুলা উপেক্ষা করিতাম।

চ। সুন্দরীর বিবাহ ত হইয়া গিয়াছে, এখনও কি সে সকল কথা বলিবার কোন বাধা আছে?

গ। বলিবার বাধা বিশেষ কিছু নাই, বলিয়া লাভও কিছু নাই। তবে অনিশ্চিত বিষয়ের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল।

চন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে অবাক হইয়া গঙ্গাধরের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—"দাদা মশাই! আপনার কথার ধরণে বিষয়টা জানিবার কৌতূহল আরও বাড়িতেছে, দোহাই আপনার, আমাকে আপনার মনের কথাটা ভাঙ্গিয়া বলুন।

গ। আমি রামেশ্বরকে তিন চারি বার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই অল্প দেখা সাক্ষাতেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, সৌজন্য ও গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার মত ধার্ম্মিক সজ্জনের বংশ রক্ষা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুন্দরীর সঙ্গে কমলকুমারের বিবাহ হইলে, দুই কারণে রামেশ্বরের বংশ রক্ষায় ব্যাঘাত পড়ে, তাই আমি ঐ কার্য্যের প্রথম প্রস্তাবেই সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও অসম্মত হই। শেষে বউমার বিশেষ পীড়াপীড়িতেই কেবল সে ছেলেটীর সন্ধান লইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু জানিতাম, তাহাকে পাওয়া যাইবে না, কারণ সে যখন আমাদের এখানে আসিয়াছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, তখন ও এখনও তাহার শনির দশা।

চ। শনির দশায় কি খোঁজ পাওয়া যায় না?

গ। শনির দশায় অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। যাহা লক্ষ্য—যাহা বাঞ্ছনীয়, শনি মানুষকে তাহা হইতে দূরে—সুদূরে লইয়া যান। তাই আমি জানিতাম,

যে, তোমরা যত চেষ্টাই কর না কেন, কমলকুমার অতি নিকটে থাকিলেও, খুঁজিয়া পাইবে না। তাই শেষে মত দিয়াছিলাম।

চ। আচ্ছা, কেমন করিয়া বংশ রক্ষার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা ছিল?

গ। সবই বল্‌তে হবে? সে সব কথা না বলাই ভাল। তাই আর বলিতে চাই না।

চ। বলুন বলুন, গুরুতর কথা হইলে, আমি তাহা গোপন রাখিব। কথনও কাহারও নিকট বলিব না।

গ। নিজেদের কথা—তাতে অদৃষ্ট-লিপি, সকল সময়ে ঠিক বুঝা যায় না, সুতরাং ঠিক বলাও যায় না, তাই এত ইতস্ততঃ। আমাদের সুন্দরীর বিবাহের দিন হইতে ত্রিরাত্রি মধ্যে তাহার বিধবা হইবার সম্ভাবনা। রামেশ্বরের একমাত্র পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া দৈবক্রমে যদি গণনার ফল ঠিক হইয়া যায়, তাহা হইলে রামেশ্বরের বংশ লোপ পায়। এই গেল আপত্তির প্রথম ও প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি সুন্দরীর শুভগ্রহ নিবন্ধন অত ত্বরায় বৈধব্যদশা না ঘটে, তাহা হইলেও তাহার সন্তান সম্ভাবনা নাই। বন্ধ্যা হইবার সম্ভাবনা—যদি সন্তান হয়,তাহা হইলে, মৃতবৎসা হইবার সম্ভাবনা। সে দোষ খণ্ডন হইলে হইতে পারে—নাও পারে। এই সকল বিষয়ে আমার বিশ্বাস অন্য লোকের চেয়ে অধিক দৃঢ়। তাই আমি প্রবলভাবে আপত্তি করিয়াছিলাম। কারণ নিজেদের একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, বা অভিপ্রায় সিদ্ধির মানসে, অন্যের সর্ব্বনাশ করা কোন মতেই উচিত নহে। অপরের অকল্যাণ করিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধি কোন মতেই ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

চ। দাদা মশাই! আপনার কথা শুনিয়া একদিকে আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইতেছে, আর একদিকে সুন্দরী ও বিধুভূষণের জন্য অত্যন্ত ভাবনা হইতেছে, কারণ আপনি যখন যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাগ্যে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। এখন উপায়?

গ। দেখ ভাই! আমি তবুও একটু অন্যায় করিছি; এই ছেলেটীর পরিণাম যে ভাল নাও হইতে পারে, আমার এই সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও ত আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম।

চ। দাদামশাই! এ ত আপনার হাত নহে। সুন্দরী বিধবা হইবে, ইহা যদি ঠিক হইল, তাহা হইলে তাহার বিবাহ নিবারণ করে কে?

গ। তবে কমলকুমারের সঙ্গে সুন্দরীর বিবাহ না দিয়া, রামেশ্বরের বংশ রক্ষা বিষয়ে সহকারিতায় আমার প্রশংসার পাত্র হইবার কি আছে? মানুষ উপলক্ষ মাত্র। নবীনকৃষ্ণের পুত্রকে এরূপ নিয়তি-বন্ধনে জড়িত করায় যদি আমাতে পাপ না স্পর্শে,তাহা হইলে কমলকুমারের সহিত বিবাহে অমত প্রকাশ করিয়া বিশেষ কিছু গুণপনার পরিচয়ও দিই নাই।

চ। একটী বিষয়ে আপনার বিশেষ নিঃস্বার্থ ভাব ও মহত্বের পরিচয় পাইতেছি। আমার খুড়া মহাশয়ের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকায়, তাঁহার বংশ রক্ষার চিন্তা, স্বার্থ-চিন্তা অপেক্ষা যে আপনার নিকট অধিকতর আদর-ণয়, ইহা ত সজ্জনের লক্ষণ—উদার ও মহানুভব ব্যক্তির লক্ষণই এইরূপ। দুঃখের বিষয় আপনাদের মত লোক সংসারে অধিক নাই এবং হইতেছেও না। আচ্ছা, আপনি এ সকল কি সত্যই বিশ্বাস করেন? আর কেমন করিয়াই বা এ সকল ঠিক ঠিক বলিতে পারেন, তাহাও বুঝি না।

গ। বিশ্বাস করি বই কি। এ সকল বিষয়ের শাস্ত্র আছে। যে ব্যক্তি সে সকল বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, সেই বেশী বিশ্বাসী, তাহার কথাও প্রায় সবই ঠিক হয়। আমার পড়া শুনা বেশী নাই, ক্ষমতাও বেশী জন্মে নাই, তাই সব কথা ঠিকও হয় না।

চ। আপনার কথা আবার ঠিক হয় না? সেই একবার একটা লোকের বিষয় বলিয়াছিলেন, 'সে সাত দিনের ভিতর মরিবে', আশ্চর্য্য! ঠিক তাই হইল।

গ। সুন্দরীর বিষয়ে আমি অনেক গুণে গেঁথে ঠিক করে রেখেছি, আমার বিশ্বাস, তাও সব ঠিক ঠিক ফলিয়া যাইবে।

চ। আমাকে বলুন না। পূর্ব্বে থেকে জেনে রাখি। কাহাকেও বলিব না।

গ। না—না, আর বলিব না। বিবাহ হয়ে গেছে, ফলাফল ত্বরায় জানিতে পারিব, সেই জন্য ঐ কথাটা বলিলাম। আর যাহা এখনও সুদূর ভবিষ্যতে লুক্কাইত, তাহা কোন বিবেচক লোকের বলা উচিত নহে। তাহা আর জানিবার প্রয়াস পাইও না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন পরিচয়ে।

পাঠক কমলকুমারকে যে অবস্থায় বজবজের কলবাড়ীতে কুলির কাজে নিযুক্ত দেখিয়া আসিয়াছ, তাহাই তাহার দুর্দ্দশার শেষ সীমা নহে—তাহাই তাহার বর্ত্তমান সুখের চরম সীমা নহে। পুরন্দর দেখিল ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে কায়ক্লেশে লজ্জা নিবারণ করিয়া—অনাবৃত দেহে বর্ষা ও শীতের সহিত সংগ্রাম করিয়া—অতি অকিঞ্চিৎকর ও সামান্য খাদ্যে দেহ ধারণ করিয়াও কমলকুমারের পৈতৃক সম্ভ্রমের অভিমান লোপ পায় নাই। তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহার অঙ্কুর সমূলে বিনষ্ট হইতে এখনও বিলম্ব আছে। এই দুরবস্থার মধ্যে অনেক সময়ে তাহার কথার ভঙ্গিমায় উচ্চাভিলাষী যুবকের আত্মাদরের আভাস পাওয়া যায়। দুঃখ কষ্টের তীব্র কষাঘাতে, ক্ষত বিক্ষত—তাহার উপর পুরন্দরের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও এই স্বাধীন প্রকৃতির যুবকের হৃদয় হইতে প্রকৃত মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের বীজ একবারে চলিয়া যায় নাই। অসীম দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িয়াও সে যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাও সংসারে অতি বিরল।

কলবাড়ীতে কমলকুমার যে ঘরে কাজ করে, সেখানকার সাহেব যখন জানিতে পারিল যে, এক ভদ্র লোকের ছেলে ইংরাজী লেখাপড়া জানিয়াও তাহার অধীনে মজুরের কাজ করে, তখন কমলকুমারের প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ

দয়ার সঞ্চার হইল। হাজিরা বাবু না থাকিলে, কমলকুমারকে ডাকিয়া কাজ করিতে বলে, সে বলিয়াছে "সুবিধা পাইলেই আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা ভদ্র কাজ দিব।" ইহাতে পুরন্দরের ঈর্ষানল তুষানলের ন্যায় ভিতরে ভিতরে বাড়িতে লাগিল।

কমলকুমার যে দিন প্রথম কাজ করিতে যায়, সেই দিন হইতে দেখিল, তাহারই সমান বয়সের একটী স্ত্রীলোক তাহার ঠিক সম্মুখের দিকে দাঁড়াইয়া কাজ করে। নাম বিলাসিনী। প্রথম দিন হইতেই সেই স্ত্রীলোক কমলকুমারকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখে। সে ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোক হইলেও—তাহার চরিত্র সর্ব্বাংশে প্রশংসার যোগ্য না হইলেও, তাহার হৃদয়ে দয়া মায়া আছে—তাহার গুণগ্রহণের ক্ষমতা আছে—ভাল মন্দ বিচার করিয়া, মন্দটা ত্যাগ করিয়া ভালটার সমাদর করিবার শক্তি ও ইচ্ছা আছে। সে লোকও মন্দ নয়, কথা বার্ত্তায় লালিত্য আছে। সে শ্যামাঙ্গী হইলেও তাহার যৌবনে উদ্ভাসিত শ্যাম দেহে সৌন্দর্য্য আছে। তাহার বিজলী লীলাক্ষেত্র নেত্র-যুগলের অপাঙ্গ দৃষ্টি সহজেই মন হরণ করে। তাহার বিবিধ গৌরবের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান জিনিস তাহার সুগঠিত মস্তকের শোভা—সুশ্যাম কেশ-দাম। সে এক বিচিত্র বস্তু, স্ত্রীলোকেও দুর্ল্লভ! স্নান ও আহারান্তে মধ্যাহ্নে, বিলাসিনী যখন তাহার অতুল সম্পদ—তরঙ্গ-লীলাশোভিত—ঘনশ্যাম কুন্তল-কলাপে পৃষ্ঠদেশ পূর্ণ করিয়া কর্ম্ম স্থানে অগ্রসর হয়, তখন প্রীতি-উচ্ছলিত—কুতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে না, এমন লোক অতি বিরল। স্ত্রীলোক আর পুরুষ, বালক কি বৃদ্ধ, সকলেরই চক্ষে সমান প্রীতিপ্রদ; তাই বিলাসিনী যখন তাহার মস্তকের মুক্ত বিলাস-ভারে পথে বাহির হয়, তখন পৃথিবী পলক-শূন্য—নীরব হাসিভরা—প্রীতিমাখা দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, আর গৌরবিনী বিলাসিনী হেলে দুলে চলে যায়। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, সেই কেশপাশের উভয় পার্শ্ব স্কন্ধ অতিক্রম করিয়া বক্ষে আসিয়া পড়ে। তাহার সম্মুখের দিকে স্তরে স্তরে নিপতিত কেশ-গুচ্ছধৃত মুখখানিকে নীলোৎপলসম সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কাহার নিকট এ দৃশ্য অধিকতর সুন্দর—অধিকতর সুখের বলিয়া বোধ হইত? কমলকুমারের নিকটই তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! কেন? সে নিজের ক্ষতি করিয়াছে—দুর্দ্দশা করিয়াছে—

সর্ব্বনাশও করিয়াছে, কিন্তু সে নীচ লোক নহে, তবে কেন তাহার নিকট বিলাসিনী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী? ইহার উত্তর সে নিজেই পরে দিয়াছে। একদিন দুদিন করিয়া প্রায় ১০।১৫ দিন চলিয়া যায়, এমন সময়ে একদিন সেই পূর্ণযৌবনা রমণী মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অনেকক্ষণ কমলকুমারের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি অমন করে আমার দিকে তাকৃয়ে থাক কেন?"

ক। (ম্লানমুখে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখাবৎ এক বিন্দু হাসিয়া বলিল) কই? না। বরং আমি এখানে আসা অবধি দেখিতেছি, প্রতিদিন যখনই তোমার দিকে তাকাই, তখনই দেখি তুমি আমার পানে তাকাইয়া আছ। অমন করিয়া কেন তাকাইয়া থাক?

যু। আমার চোখ আছে, দেখবার মত জিনিস্ সামনে পড়লেই দেখি।

ক। তুমি অমন করে তাকৃয়ে থেকো না।

যু। খুব করবো থাকৃবো, তাতে তোমার কি, আমি কি চোখ্ বুজ্যে কাজ করবো?

ক। চোখ বুজ্যে কাজ কর আর না কর, আমার দিকে অনবরত অমন করে তাকৃয়ে থাকৃবে কেন?

যু। (কমলকুমারকে দেখাইয়া) ঐ দিকে তাকৃয়ে থাকৃতে আমার খুব ভাল লাগে, তাই আমি তাকৃয়ে থাকি। তোমার ভাল না লাগে, তুমি সরে যেতে পার—অন্যের সঙ্গে কাজের জায়গা বদল করতে পার। আমার সাম্‌নে থাকৃলে, আর আমার ভাল লাগ্‌লে, আমি তাকৃয়ে থাকৃবো না ত কি করবো?

ক। আমি কি? সামান্য লোক—গরিব—দেখ্‌ছো অস্থিচর্ম্মসার—ছেঁড়া কাপড়ে—খালি পায়ে—আধপেটা খেয়ে, দিন কাটাই, তাতে দুবেলা তোমাদের সরকারের ধমক ও গালাগালি খাই। এমন অপূর্ব্ব গুণবানের উপর দয়াদৃষ্টি করিয়া কি লাভ? বেশী বাড়াবাড়ী করিও না, অকারণ নিজেরই দুঃখ কষ্ট বাড়িবে। মনে মনে বলিল "কালোয় এত ভাল! ঝাঁজাল কথাও এত মিষ্ট হয়!!"

যু। তোমার অস্থিচর্ম্মসার—তুমি গরিব! ভারি একটা নূতন খবর দিলে, না? তুমি ভদ্রলোক, লেখাপড়া জান, এমন অবস্থায় এখানে আমাদের

মাঝখানে যখন এসে পড়েছ, তখন এতেই ত সব প্রকাশ আছে। নূতন কথা কিছু বল্‌তে পার ত বল।

ক। তুমি ত বড় মজার লোক দেখ্‌ছি! নূতন কথা কি বল্‌বো?

যু। তোমার বাড়ী কোথায়—কে আছে?

ক। আমার বাড়ী———সংসারে আমার, 'আমার' বলিবার কেউ নাই। (বলিতে বলিতে সুন্দরীর কথা মনের কোণে উদয় হইল। কমলকুমার একটা বিষাদমাখা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল)।

যু। কেউ নেই? বিয়ে হয়েছে? তুমি ত কুলীন? কুলীনের ত অনেক বিয়ে হয়, না?

ক। হায় হায় 'মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা' একটা হয় না, আবার 'অনেক'। এরই উপর বিয়ে? 'নিজে শুতে জায়গা পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে'।

যু। তুমি ত বেশ লোক। আমি ভাব্‌তুম বোবা, না হয় মাকাল ফল।

ক। তোমার

যু। কেন আমার অপরাধ? বল্‌তে ভয় হয়, একটা পান দেবো?

"দাও" বলিতে বলিতে কমলকুমারের হৃদয় আর্দ্র ও নয়নদ্বয় সিক্ত হইয়াছে। কারণ অনেক দিন হইল, এমন মিষ্ট কথায় এত আদর করিয়া কেহ কিছু দেয় নাই। চতুরা ও সহৃদয়া বিলাসিনী তাহা বুঝিতে পারিল, তাই চুপ করিয়া রহিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

'পরিচয়—পলকে।'

এই ভাবে তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। পুরন্দর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, মধ্যে মধ্যে এক একবার কমলকুমারের নিকটে আসিয়া সামান্য কোন উপলক্ষ ধরিয়া দুই চারি কথা শুনাইয়া যায়। কলে অনেক স্ত্রীলোক কাজ করে, কমলকুমারকে অকারণ সর্ব্বদা ২।৪ কথা শুনাইবার উদ্দেশ্য, ঐ সকল স্ত্রীলোকের সম্মুখে নিজের প্রাধান্যের পরিচয় দেওয়া। কিন্তু ফল সর্ব্বদাই উল্টা হয়। ঐ অসহায় ভদ্র সন্তানের উপর সর্ব্বদা এইরূপ ব্যবহার করায় তাহার নিকটের সমস্ত লোকই ক্রমে পুরন্দরের উপর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে কোন কোন পুরুষ ও স্ত্রীমজুর বিরক্ত হইয়া পুরন্দরকে ২।৪ কথা শুনাইয়াও দেয়। যখন লোক শুনাইয়া দেয়,তখন এবং তাহার পরদিনটীও কমলকুমার শান্তিতে কাজ করিতে পায়। কখন কখন লোক সাহেবকে বলিয়া দিতে কমলকুমারকে পরামর্শ দেয়। পুরন্দরের এইরূপ আচরণে বিলাসিনী পুরন্দরের উপর ভিতরে ভিতরে ভয়ানক বিরক্ত—মনে মনে তাকে ঘৃণা করে, কিন্তু সাম্‌নে তাহাকে চটায় না। পুরন্দর অনেক সময়ে বিলাসিনীর নিকটে আসিয়া নানাবিধ রঙ্গ ভঙ্গে তাহার সহিত আত্মীয়তা করে এবং কমলকুমারের সম্মুখে নিজের কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু বিলাসিনী বড় বেশী সাবধান, কমলকুমারের কথা

পড়িলে আরও সাবধান হয়। একদিন পুরন্দর আসিয়া বিলাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, তোমার সাম্‌নের বামন কেমন লোক?"

বি। কি করে বল্‌বো?

পু। কেন? এত দিন সাম্‌নাসাম্‌নি কাজ কর্‌ছো, বল্‌তে পার না?

বি। সাম্‌নে কাজ করলেই কি মানুষ চেনা যায়? এত সহজ?

পু। মানুষকে জান্‌তে কদিন লাগে? এখানে যত লোক কাজ করে, তাদের কে কেমন লোক, আমি সব জানি।

বি। সরকার বাবু! অত অল্পে—অত সস্তায় যদি লোক চিনে থাকেন, তবে তাকে 'মুখ চেনা' চিনেছেন, তার বেশী জান্‌তে হলে, অনেক 'কাট খড়ের দরকার'। বড় শক্ত কথা। আচ্ছা বলুন ত আমাকে কেমন জানেন?

পু। সকলের চেয়ে তোমাকেই বেশী জানি।

বি। কি জানেন?

পু। খুব চাপা লোক। সহজে কিছু ধরাও যায় না—বুঝাও যায় না। বলনা, তোমার সাম্‌নের ঠাকুর লোক কেমন?

বি। শুনি ত খুব বড় লোকের ছেলে, ভাল লোকই হবার কথা।

পু। আলাপ পরিচয় হয়েছে?

বি। পরিচয় হয়েছে, আলাপ হয়নি।

পু। কি রকম! আগে পরিচয়, না আগে আলাপ?

বি। নিয়ম কি সকলেরই এক? মুসলমানেরা যে পাতের উল্টা দিকে খায়।

পু। তোমার ও হেঁয়ালীর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তুমি বড় শক্ত লোক।

বি। কারুর বা আলাপ আগে হয় কারুর বা পরিচয় আগে হয়।

পু। সে কি রকম?

বি। আলাপ কাকে বলেন? অনেক কথা কওয়াকেই ত আলাপ বলে? তা হয়নি। পরিচয় হয়েছে। 'পরিচয়—পলকেও হয়', আর পাঁচ জনের মুখে শুনেও পরিচয় হয়। এখানকার পাঁচ জনের মুখে ইহার বিষয়ে ভাল মন্দ সবই জেনেছি, আর আপনি যে ঐ লোকটাকে দেখ্‌তে পারেন না, তাও জেনেছি, তাঁর কারণও জান্‌তে পেরেছি।

এই কথা শুনিয়া পুরন্দরের মুখখানি চুণ হইয়া গেল। বিবর্ণ মুখে পুরন্দর বলিল, "আমি যে উহাকে দেখ্‌তে পারিনা তোমায় কে বলিল?"

বি। আপনার ভাব গতিক দেখেই তা বেশ বুঝা যায়।

পু। কারণটা কোথায় জানিলে?

বি। রসিক ঘোষের নিকট শুনেছি।

পু। সে কোথায় পাইল?

বি। তা আমি কেমন করে জান্‌বো? তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

বিলাসিনী বুঝিল কাজটা ভাল হইল না। এতে কমলকুমারেরই যন্ত্রণা বাড়িবে। কিন্তু কি করে,একটা অসাবধানতা সাম্‌লাতে আর একটা হয়ে পড়্‌লো।

পুরন্দরের মন চঞ্চল হইল। বুদ্ধি লোপ পাইল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া রসিক ঘোষের সঙ্গে ঝগড়া করিতে গেল। ভয়ও হইয়াছে। মনে মনে ভাবিতেছে সে একথা কোথায় পাইল, কেমন করিয়া পাইল, যদিই পাইল, আমার বন্ধু হইয়া, যাতে আমার বিপদের সম্ভাবনা, এমন কথা অন্যের নিকট কেন বলিল। এই অভিমানে অমাবস্যার অন্ধকারে আননাবৃত করিয়া রসিকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পথে মনে হইল, যদি কমলকুমার, রসিক ঘোষকে কিংবা বিলাসিনীকে বলিয়া থাকে। এই সন্দেহে ফিরিল, ফিরিয়া কমলকুমারের নিকট আসিয়া বলিল "ঠাকুর! তুমি কি রসিক ঘোষকে বলিয়াছ যে, আমি তোমাকে বিপদে ফেলিয়া, তোমার ভবিষ্যৎ সুখের পথে কাঁটা দিয়াছি?

ক। তুমিই দিয়াছ সত্য,একবার কেন,প্রয়োজন হইলে,শতবার—লক্ষবার বলিব। কিন্তু আমি এখানে আজ পর্য্যন্ত একথা কাহাকেও বলি নাই। আমার প্রকৃতিই সেরূপ নহে। আমি তোমাকে ঘৃণা করি সত্য, তুমি আমার বিপদ দিন দিন বাড়াইয়া দিতেছ সত্য, কিন্তু তবুও সহস্র ক্লেশের মধ্যে, আমি তোমারই অনুগ্রহে দেহ ধারণ করিতেছি, কেবল এই এক কারণে আমি তোমার কোন কথাই কোথাও বলি না—বলিবও না।

পু। তবে রসিক ঘোষ কি করে জান্‌লে?

ক। তা আমি কেমন করে জান্‌বো। মনে করে দেখ, তুমিই যদি কখন বলিয়া থাক।

পুরন্দর চলিল। ঘোষের নিকট গিয়া অতি রুক্ষ—অতি কঠোর—অতি উদ্ধত ভাবে বলিল, "তুমি বড় বেশী বেড়েছ, না? তোমাকে আমি শিগ্‌গির ছেঁটে খাটো করে দিচ্ছি থাক।" পুরন্দর এত রাগিয়াছে যে আর কিছুই বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রসিক বলিল "কি হয়েছে, এত রাগ কেন? আগে কথাটাই বল।" পুরন্দর বলিল "তোমাকে কে বলিল, আমিই কমলকুমারের সর্ব্বনাশ করেছি?" রসিক বলিল "কেন, গত রবিবার দুকুরবেলা রস খেতে বসে তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের মুখেই ত বলিয়াছ যে, তোমার স্বার্থসিদ্ধি ও আরামের পথে কমলকুমার কণ্টক হইয়া বাড়িতে-ছিল বলিয়া, তুমি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলে, আর এখন সেই ভাঙ্গা কাঁটায় কত কাজ চালাইতেছ! তুমি নিজেই ত এ সব বলেছ।" তখন পুরন্দরের চৈতন্য হইল। রবিবার মেজাজটা 'দরাজ গড়ের মাঠ' হয়েছিল। ক্রূরমতি পুরন্দরের প্রাণের সকল কথাই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। পুরন্দর ক্ষণকালের জন্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পরক্ষণে পূর্ণ উত্তেজনার সঙ্গে বলিল "আচ্ছা আমি না হয় বলিয়াছিলাম, তুমি সে কথা অন্যের নিকট বলিলে কেন?

র। কোথায় বলেছি?

পু। কেন বিলাসিনীর নিকট বলেছ।

র। কাল ঠিক এই সময়ে ঐ খানে দাঁড়্য়ে তার সঙ্গে কমলকুমারেরই কথা হচ্চিল, তাই কথায় কথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি। তাতে কি কিছু দোষ হয়েছে? তুমি যখন ঐ কথা বলেছিলে, তখন ত মজার ভাবেই বলেছিলে, কথাটা অন্যের নিকট বলায় যে দোষ হইবে, কই এরূপ ভাবত দেখাও নাই, কোথাও বলিতে নিষেধও কর নাই। কথাটা বলায় দোষ হইবে বুঝিলে, আমি ওকথা কোথাও বলিতাম না। তুমি আমার উপর মিছামিছি রাগ করিও না।

পু। লালমোহন বাবুর ঘরের কথা অন্যের নিকট বলায় আমার বিপদ আছে। কাজটা ভাল হয় নাই।

এই ঘটনার পর কমলকুমারের প্রতি পুরন্দরের অত্যাচারের প্রবৃত্তি গোপনে গোপনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মানুষ ন্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া অন্যায় আচরণের সমর্থনে আরও নূতন শতবিধ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। পুর-ন্দরের পক্ষে আবার তাহা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক।

এই ঘটনার ফলে কমলকুমারের দুঃখ দুর্দ্দশার মাত্রা আ: যাও, হইল দেখিয়া, কোমলহৃদয়া বিলাসিনী প্রাণে বড় বেদনা কুমারের বিষন্ন মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয় আর্দ্র হইল। তাহার দৌ রের দুঃখের মাত্রা পাছে আরও বাড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে অতি আজ দু দিন কাটাইতেছে। আজ সে কাতরদৃষ্টিতে কমলকুমারের ইতেছে—কিন্তু নীরব। আজ আর তাহার কাজকর্ম্ম হইতেছে না, হয় নাই, কেবল নীরব দৃষ্টিতে শত অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা ক্রমে বেলাবসানে যখন চলিয়া যাইবার মুহূর্ত্ত নিকটতর হইতে তখন বিলাসিনীর চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহার নেত্র-প্রা বেদনা ও কাতরতার পরিচায়ক অশ্রু, কণায়—কণায়—মিলিত হইতে "—নিরমল অশ্রুজলে, পাছে লোকে কিছু বলে," এই ভয়ে, সে এতক্ষণ প্রাণপ সাবধান হইতে চেষ্টা করিতেছিল। সে শিশির-সিঞ্চিত—নবপ্রস্ফুটিত—শতদল দলবেষ্টিত কমল-কান্তিপূর্ণ নয়নদ্বয়ে কমলকুমারের দৃষ্টি পড়িবামাত্র কমলকুমার অতি মিষ্ট—অতি মধুর—স্নেহপূর্ণ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া যেমন বলিল— "এত কি অন্যায় করেছ যে, সমস্ত দিনই চোরের মত জড়সড়?" অমনি সে বিন্দু—সিন্ধুতে পরিণত হইল। কমলকুমার বলিতে লাগিল, "তোমার এমন কোন অপরাধ হয় নাই—তুমি শান্ত হও, আমি রাগ করি নাই।" সে বলিল "তুমি রাগ কর নাই—বিরক্ত হও নাই, তাতেই ত আমি আরও মরমে মরিয়া যাইতেছি—তুমি রাগ করিলে, দুকথা বলিলে, আমার এত দুঃখ যন্ত্রণা থাকিত না—কমিয়া যাইত, যখন রাগ করনি—তখন একটা আব্‌দার রাখ্‌বে? কমলকুমার বলিল—"কি? বল, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।" সে বলিল, "আজ সন্ধ্যার পর যখন তোমার সুবিধা হয়, একবার আমাদের বাড়ীতে যাবে? এত চেষ্টা করে—তোমার পায়ে ধরেও ত তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারলুম না। বল—আজ একবার যাবে, বাড়ীর ভিতরে না যাও, বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে দুটা কথা কয়ে চলে আস্‌বে—বল যাবে?" কমলকুমার অচেতন পদার্থের ন্যায় স্থির—ধীর—স্পন্দরহিত ভাবে ক্ষণকাল থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"এরূপ ভাবে তোমার আমাকে ডাকা কি ভাল? আমি নানা কারণে তোমার বাড়ীর দরজা

।। এখানে এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও এক বিন্দু সুখ
মার অযাচিত ভালবাসা। সংসারের লোকের ভাগ্যে এরূপ
অনুগ্রহ লাভ অল্পই ঘটিয়া থাকে। আমি তোমার কে? আমার
। চক্ষে জল পড়ে কেন? চিরজীবনেও এ ঋণের পরিশোধ
তোমার ভালবাসা দেখিয়া মনে হয়, তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার
ন। তোমার আচরণে তুমি অন্যের চক্ষে যাহাই হও, আমার
।। সুন্দরী—প্রিয় সহচরী! মনে হয়, যেন জীবনের অনন্ত বিরামে
তমারূপে পার্শ্বে বসিয়া আছ—তোমার মিলনে শ্রম ও বিরাম উভয়ই
ঞ্চিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহাও মনে হয় যে, তুমি এ সংসারে
মার কেহ নও।"

কমলকুমার আবার বলিল "তুমি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক হইয়া আমার অভি-প্রায় বুঝিয়াও আমার দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তা ভাঙ্গিবার প্রয়াস পাইতেছ কেন?" সে বলিল "আচ্ছা তুমি সত্য সত্যই আমাদের বাড়ীর দরজার বাহিরেই দাঁড়াইয়া দুটা কথা কহিয়া চলিয়া আসিবে। আমি তোমার নিকট ইহার অধিক কিছু ভিক্ষা চাই না।" কমলকুমার বলিল "ভিক্ষা চাও না সত্য—দ্বারে পাইয়া দাবি করিলে কি করিব? তাই ভয় হয়।" সে বলিল "আমি জাতিতে ইতর—আমার আচরণও সজ্জনের মত নয়—যে ফুলে দেবসেবা হইবে, আমি কোন্ সাহসে তাহার উপর দাবি করিব—দেবসেবার নির্ম্মাল্য হইলেও বা একদিন মাথায় রাখিয়া মাথা জুড়াইতাম।" এই বলিয়া অঞ্চলে অশ্রুজল মোচন করিল ও বলিল "আমি আশা করিয়া আমাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিব।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ বড় নলী কুড়াইবার ভান করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল এবং তার পর যে অল্প সময়ের জন্য সেখানে রহিল, অন্য লোকের সহিত অন্য কথায় এমন ভাবে নিজেকে নিযুক্ত করিল যে, কমলকুমার আর একটা কথাও বলিবার অবসর পাইল না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, যে যার গৃহে চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী শ্বশুরালয়ে

বিধুভূষণের মা বহু আত্মীয়া পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে উঠাইলেন। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল—লোকজনে গৃহপূর্ণ—আত্মীয় কুটুম্বে চারিদিক জম্‌জম্ করিতেছে। বরের বড়মাসী জগদম্বা অমল ও নিমল দুই পুত্র লইয়া এবং বরের ছোটমাসী ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দাকিনী ও সুহাসিনী কন্যাদ্বয় ও নাতি নাতিনী লইয়া ভগ্নীর বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। বরের তিন পিসি অম্বিকা, আনন্দময়ী ও ভগবতী অনেকগুলি পুত্র কন্যা লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠার জ্যেষ্ঠাকন্যা সরস্বতী, মধ্যমার একমাত্র কন্যা সুশীলা ও কনিষ্ঠার কন্যাদ্বয়—ভামিনী ও দামিনী অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে মায়ের সঙ্গে মাতুলালয়ে আসিয়াছে। এরূপ আত্মীয় সমাগমে একটা বড় রঙ্গ বাধিয়াছে। বুড়ী বলিয়া ডাকিবামাত্র ৫।৬ টা ছোট মেয়ে একবারে দৌড়ায়, ন্যাড়া বলিয়া ডাকিবামাত্র ৪।৫টা ছেলে একবারে আসিয়া হাজির, খোকা খুকি বলিয়া ডাকিলে কতগুলি যে একবারে হামা দেয় ও দৌড়ায়, তাহার সংখ্যা হয় না। সে দৃশ্য দেখিতে বড়ই সুন্দর! পাড়ার মেয়ে অনেক:—বামাসুন্দরী, শ্যামাসুন্দরী; হেমাঙ্গিনী, শৈবলিনী, রঙ্গিণী, টুনী; চারুলতা, স্নেহলতা, ললিতা, শান্তা; নিহারিকা, লতিকা; মহামায়া, যোগমায়া, মায়া; মানদা, কুমদা, মোক্ষদা, প্রিয়দা; শশীমুখী, সুধামুখী; আদর, আতর, গোলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্রুর কুশুণ্ডিকার আয়োজনে ব্যস্ত। রোশনচৌকি সুমিষ্ট
ঽরী তুলিয়া মধুরালাপ করিতেছে, নহবতের সঙ্গতে প্রাণ
।লে নৃত্য করিতেছে। সকলেই বউ দেখিবার জন্য ব্যস্ত।
॥ মধ্যস্থলে সুসজ্জিত শয্যার উপর বর কন্যাকে বসান হইয়াছে।
পরিজনবর্গ আত্মীয় স্বজন ও পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক সমবেত।
্ঠাবধূ বিধুভূষণের বড় ভাইজ অগ্রসর হইয়া দেবরকে বলিলেন,
! আমরা বউ দেখ্‌বো, একবার নিজের হাতে বোয়ের ঘোমটা
।মাদিগকে বউ দেখাও।" পূর্ব্ব দিনের নানাবিধ উপহারে বিধুভূষণের
মহাশয়ের ও কর্ণদ্বয়ের কিঞ্চিৎ পীড়া হইলেও, আজ নিজের বাড়ীতে
ায়া সাহস হইল, একটু লজ্জাও হইল, নতমুখে একবিন্দু মৃদু হাসি হাসিয়া
দবর বলিল "কেন তোমার হাত নেই?"

বউ, "হ্যাঁ আছে বই কি" বলিয়া, তাঁহার শ্রীহস্তের চম্পকদলবিনিন্দিত-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেবরের নাসিকাগ্রভাগে ধরিয়া বলিলেন "দেখ দেখি আমার হাত আছে কিনা? ভাল চাওতো এই বেলা একটু বেহায়া হইয়া আস্তে আস্তে কনের মাথার কাপড়টী উঠাইয়া দিয়া কনের মান রক্ষা কর। তা নাহলে আরও অনেক দুঃখ ভোগ ভাগ্যে আছে।

বিধু। তোমাকে আমি বেশ জানি, একবার পাড়্‌তে পার্‌লে, তারপর যা ধর্‌বে তাই কর্‌য়ে নেবে। তা হবে না, আমি পার্‌বো না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমার একটু প্রয়োজন আছে।

বউ। না না, তা হবেনা। আগে বউ দেখাও, তার পরে ছেড়ে দেবো। শুনেছি বউ নাকি খুব সুন্দরী?

বিধু। দেখ্‌লেই পার কেমন হয়েছে, তোমার চেয়ে বেশী নয়।

বউ। তবে বুঝি মনের মত হয় নি? কেন বউ কি কানা, না খাঁদা? তা না হলে দেখাতে এত লজ্জা কেন?

বিধু। বউ দেখ্‌তে কি নিয়ে এসেছ বল দেখি, আমার হাতে বউ দেখ্‌তে ডবল খরচ পড়্‌বে।

বউ। আচ্ছা—আচ্ছা তোমার মেহনৎআনা একটা ডবল পয়সা দেবো, দেখাও।

বিধু। তামাসা ছাড়,আমার শরীর ভাল নয়,আমাকে ছেড়ে দাও, বাহিরে যাব।

বউও ছাড়িবে না, বিধুভূষণও নিজ হাতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি দেখাইবে না। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর বিধুভূষ- য়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু উপায় নাই,চারিদিকে স্ত্রীলোক, কোন দিকে এ ফাঁক নাই যে, সেই পথে পলায়ন করে। তাহার বাহিরে না গেলেও এইরূপে বহুক্ষণ আবদ্ধ থাকায়, তাহার শারীরিক অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পা লাগিল। শেষে আর বিলম্ব করা অসম্ভব বোধে সে স্ত্রীলোকদের মধ্য দিয়া ব পূর্ব্বক পলায়নের চেষ্টা করিল। অনেকে বাধা দিল, কিন্তু বিধুভূষণ মেয়েদে উপর দিয়াই চলিয়া গেল। বাহির বাটীতে গিয়া বাড়ীর এক ভৃত্যকে বলিল, "বাবাকে শিগ্‌গির ডেকে দে। আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্চে, আর একগাড়ু জল দে।" বিধুভূষণ পাইখানায় গিয়া আর উঠিতে পারে না। নবীন- কৃষ্ণ পুত্রের অসুখের সংবাদ পাইয়া আসিয়া, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বড় ব্যস্ত হইলেন। চাকরটা আসিয়া বলিল, ছোট বাবু পাইখানায় গিয়া- ছেন। বিধুভূষণের বাহির হইতে বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া,নবীনকৃষ্ণ একজন ভৃত্যকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে বলিলেন। ভৃত্য অগ্রসর হইয়া দেখে ছোট বাবুর উঠিবার শক্তি নাই। গাড়ুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছেন, ললাটে ও বক্ষে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়াছে। পুরাতন ভৃত্য গোবিন্দ অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। বিধুভূষণের অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ অগ্র- সর হইয়া ছোট বাবুকে ধরিল, বহু কষ্টে উঠাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল। বিধুভূষণ বলিল, "আগে আমার জন্য,যেখানে হউক,একটা বিছানা করিতে বল। আমি উঠিলে একবারে শুইব, আর বসিতে পারিব না।" গোবিন্দ অন্য একটা চাকরকে ডাকিয়া বলিল "বাড়ীর ভিতর ছোট বাবুর ঘরে শিগ্‌গির একটা বিছানা করিতে বল" এই সংবাদে চারিদিকে একটা ভয় ও বিষণ্ণতা ছড়াইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আনন্দ কোলাহল নীরব নিরানন্দে পরিণত হইল। ভৃত্য গোবিন্দ বিধুভূষণকে কোলে লইয়াছে, আর নবীনকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া- ছেন। পশ্চাতে অনেক লোক, মুখে কথা নাই, যেন কোন জাদুকর মন্ত্রবলে সহসা সকলের বাক্‌শক্তি হরণ করিয়াছে। চারিদিকের লোকের মুখ

বোধ হইতেছে—বিপদ—বিপদ—বিপদ। বিধুভূষণকে লইয়া বাড়ীর প্রবেশ করিতে না করিতে বিধুভূষণের মা সংবাদ পাইয়া পুত্রকে আসিতেছিলেন। মনের উৎকণ্ঠায়, সত্বর পদে অগ্রসর হইতে, হওয়াতে, তিনি রকের উপর হইতে প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অচেতন। কে কাকে দেখিবে। গোবিন্দ পুরাতন সেই একা কেবল সকলদিক রক্ষা করিতেছে। গোবিন্দ সেজ ডাকিয়া চুপে চুপে বলিল "দৌড়ে যাও, গিয়ে ডাক্তার বাবু যেমন স্থায় যেথানে থাকেন, সেই অবস্থায় সেইখান হইতে ডাকিয়া আন।" মেজ বুকে ডাকিয়া বলিল "আগে মাকে দেখ।" বড় বাবুকে বলিল "কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে থাক" সকলকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া নিজে বিধুভূষণের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। শৈশবে বিধুভূষণকে গোবিন্দই কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, বাল্যকালে কোলে করিয়া পাঠশালায় লইয়া গিয়াছে, এবং সেথান হইতে বাড়ী আনিয়াছে। পিতামাতা ভাই ভগ্নী অপেক্ষা বিধুভূষণ গোবিন্দকে বেশী চেনে, গোবিন্দও সর্ব্বাপেক্ষা ছোট বাবুকেই অধিক ভালবাসে। উভয়ের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অপেক্ষা আত্মীয়তার সম্বন্ধই প্রবল। এক কথায় বিধুভূষণ গোবিন্দের—গোবিন্দ বিধুভূষণের।

ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া নবীনকৃষ্ণ বলিলেন "ডাক্তার বাবু! একি সর্ব্বনাশ হইতে বসিল! আজ কোথায় রাম রাজা হবে, এ বনবাস কেন? এমন কেন হইল? আমিত কথনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই।

ডা-বা। ভয় কি? এত ব্যস্ত হইবেন না। আপনি ব্যস্ত হইলে আর সকলকে শান্ত করবে কে? একটু অসুখ হয়েছে সেরে যাবে।

ন-কৃ। আমি অনেক দেখেছি, এ সারবার অসুখ নয়।

ডা-বা। আপনি প্রবীণ ও বিজ্ঞ হয়ে এত অসাবধান হইতেছেন কেন?

ন-কৃ। কি জানি আমার মনে হচ্চে, এবার একে রক্ষা করা ভার!

ডা-বা। রোগীর সম্মুখে বসিয়া কি এই কথা বলিয়া রোগীকে আরও ভয় দেখান ভাল?

গোবিন্দ বলিল "দেখুন, বড় বেশী ঘাম হচ্চে। আপনি ওঁকে ছেড়ে একবার এদিকে দেখুন।"

ডাক্তার বাবু গোবিন্দকে ... "গোবিন্দ বল ত কি রকম হয়েছে। গোবিন্দ একে একে যার প... ... বুঝাইয়া বলিল। তখন ডাক্তার বাবু রোগীর নিকটস্থ হই... ...ত দেখিলেন, জিব দেখিলেন, চোখের পাতা টানিয়া দেখিলেন, ... ও পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তিনি একটা ঔষধের ব... ...ন। ঔষধ খাইবার পূর্ব্বেই আর একবার ভেদ হইল। ডাক্তার বাবু ... দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা চাকর সংবাদ আনিল, "মা ঠাকরুণ পড়ে যেয়ে বড় আঘাত পেয়েছেন, এখনও ভালরূপ চৈতন্য হয় নাই, আপনি একবার দেখ্‌বেন আসুন। ডাকিবা মাত্র ডাক্তার বাবু উঠিলেন। এই সংবাদে নবীনকৃষ্ণও ডাক্তারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু গোবিন্দ গেল না। সে গিন্নীকে মায়ের মত ভক্তি করে, কিন্তু উঠিল না, সে বিধুভূষণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। অনিমেষ দৃষ্টিতে রোগীর ভাবভঙ্গি, চোখের চাউনি, মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল। আর সে কি চায়, তার কখন কি দরকার হয়, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। গোবিন্দ বুঝিয়াছে, "বিপদ বড় বেশী" ডাক্তার বুঝিয়াছেন "বড় খারাপ রকমের কলেরা হয়েছে। গিন্নীকে দেখিয়া ডাক্তার ফিরিবার সময়ে আবার বিধুভূষণের ঘরে আসিয়া রোগীর অবস্থা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এসেই যা দেখেছিলাম এখন তার চেয়ে একটু ভাল।" আর নবীনকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন আপনি ব্যস্ত হইয়া রোগীর সাম্‌নে কোন কথাই বল্‌বেন না। তাতে সুস্থ লোকেরও ভয় হয়। আপনি বরং ঠাক্‌রুণটীর কাছে গিয়ে বসুন, এখানে একা গোবিন্দই যথেষ্ট, আর কাহারও থাক্‌বার দরকার নাই। আপনি মাঝে মাঝে এক একবার এসে দেখে গেলেই হবে।" নবীনকৃষ্ণ বলিলেন, "আচ্ছা আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। আমার থাকায় আপনাদের বিশেষ আপত্তি হয়, আমি নাহয় পাশের ঘরে গিয়া বসিতেছি। কিন্তু বাবু, আপনি যাইতে পাইবেন না।" ডাক্তার বাবু বলিলেন "আমার জন্য যে অনেক লোক বসিয়া রহিয়াছে, আমি যত শীঘ্র পারি কয়েকটা নিতান্ত দরকারি যায়গায় দেখে আসি। বেশী বিলম্ব করিব না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরিব। নবীনকৃষ্ণ বলিলেন, "না, তা হবে না। আপনি যেতে পাবেন না। অনেক সময়ে অনেক অনুরোধ রাখিয়াছেন, আজকার এ অনুরোধও রাখিতে হইবে। আপনি

বিধুর কাছে বসিয়া থাকুন। যত টাকা পেলে আপনি খুসি হন, তাহাই দিব।” ডাক্তার বাবু বলিলেন, “টাকা বড় জিনিস—লোভের জিনিস হইলেও, টাকাই সব নয়। টাকা ছাড়া আরও কিছু আছে। সেটা আত্মীয়তা। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার নিকট অনেক টাকা লইয়াছি, কিন্তু তাতে আমাকে আপনার দিকে বেশী টানে নাই। টানিয়াছে আপনার আত্মীয়তায়—আপনার ভালবাসায় আমাকে আপনার অধীন করিয়াছে, আপনার অকৃত্রিম স্নেহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াই এত কাল এখানে পড়িয়া আছি, আমি আমার বাড়ী ও আপনার বাড়ীতে প্রভেদ দেখি না। এ আমার নিজের বাড়ী,কিন্তু এমন প্রয়োজন হইতে পারে, যে, নিজের বাড়ীর রোগী ফেলিয়াও স্থান বিশেষে যাইতে হয়। এমন দুএক স্থানে না গেলেই নয়। আপনি অনুমতি করুন, আমি যাব আর আস্‌বো।” নবীনকৃষ্ণ বলিলেন, “আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও, কথায় কখনও আপনাকে এঁটে উঠ্‌তে পারি নি, আপনার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই করুন। দেখিবেন যেন আমার সর্ব্বনাশ না হয়।” ডাক্তারবাবু বলিলেন, “কেন, আপনিই ত কত সময়ে বলে থাকেন যে, ভাল মন্দ হওয়ায় কাহারও হাত নাই। বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহস্র চেষ্টা করিয়াও ফল হইবে না। চিকিৎসা ও ঔষধ উপলক্ষ মাত্র।”

এইরূপ কথায় বার্ত্তায় ডাক্তার বাবু নবীনকৃষ্ণকে নিযুক্ত রাখিতে প্রয়াস পাইতেছেন, এমন সময়ে নবীনকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র বিভূতিভূষণ দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, “মায়ের অসুখ ক্রমশঃ বাড়িতেছে,মেজদাদা ডাক্তার বাবুকে আর একবার নিয়ে যেতে বল্লেন।” এই সংবাদ শুনিয়া নবীনকৃষ্ণ আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দকে বিধুভূষণের নিকটে রাখিয়া সকলেই বাড়ীর গিন্নীর চৈতন্যোদয় ও সুস্থতা সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। চিত্তচাঞ্চল্য নিবন্ধন ডাক্তার বাবু পূর্ব্বে গিন্নীর পীড়া ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন দেখিয়া ভাল বোধ করিলেন না। অত্যধিক উৎসাহের মাঝখানে—আনন্দকর ব্যাপারের ভিতরে, সহসা এই বিপদ সংঘটনে মনটা একবারে দমিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার মানসিক উত্তেজনা বশত প্রবল শোণিত স্রোতঃ মাথায় উঠিয়াছে, তাহার উপর, উপর হইতে নীচে পতনে শরীরের নানা স্থানে বিশেষতঃ মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে সমস্ত উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার

বাবু গিন্নীর ঔষধের ব্যবস্থা করিতে করিতে, বিধুভূষণের পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া আবার সেখানে দৌড়িলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল, বাহির বাটীতে গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের অনেকে ডাক্তার বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বাড়ীর উভয় রোগীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানের লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে শুনিয়া, ক্ষণকালের জন্য দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। একটু ভাবিয়া বলিয়া দিলেন, "সকলকে একটু অপেক্ষা করিতে বল।"

ডাক্তার বাবু সত্বর পদে বিধুভূষণের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে বসিয়া, রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া নূতন ঔষধ দিলেন; পরে ক্ষণকালের জন্য বাহির বাটীতে গেলেন। যাঁহারা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বক্তব্য শুনিয়া কাহারও কাহারও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কাহারও কাহারও বাটীতে গিয়া রোগীকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক; কোন্ সময়ে যাইবেন, তাহা বলিয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। নবীনকৃষ্ণের গৃহিণীর জীবন সংশয় বোধে সে দিকে বেশী ভরাভর না দিয়া, বিধুভূষণকে বাঁচাইবার জন্য ডাক্তার বাবু বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই নবীনকৃষ্ণের গৃহিণী বহু আত্মীয়স্বজনপরিবেষ্টিত হইয়া স্বামী, পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী,দৌহিত্র দৌহিত্রী, প্রভৃতির সমক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিলেন। দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সমারোহে তাঁহার হৃদয় মন প্রফুল্ল ও প্রীতিপূর্ণ থাকায়,সকলের নিষেধ সত্ত্বেও,অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াছেন,আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বাবধান ও সেবায় অপরিমিত উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইয়াছেন, অতিথি অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিতগণের প্রতি যত্নের ত্রুটি না হয়, সে পক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বৃহৎ কর্ম্মোপলক্ষে কর্ত্তার ও নিজের যে সকল আত্মীয়স্বজন সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি একত্র হওয়ায় সংখ্যায় অনেক হইয়াছে,তাহাদের কে কি খায়, কাহার জন্য কি প্রয়োজন, যথা সময়ে যাহাকে যাহা দেওয়া আবশ্যক,এ সকল সংবাদই একাকী রাখিয়াছেন এবং একাকী সমস্ত সম্পন্নও করিয়াছেন। আজ তাঁহার অন্তর্ধানে গৃহিণীপনা গ্রাম

হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ঐ গ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিয়া বধূরা তাঁহার অনুসরণ করিত। কন্যাগণকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময়ে জননীরা নবীনকৃষ্ণের গৃহিণীর উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিতেন। আজ গৃহে গৃহে সকলের মুখে নূতন বউটার নিন্দা, আর নবীনকৃষ্ণের গৃহিণী অন্নপূর্ণার প্রশংসা।

নূতন বউটার অপরাধ, সে গৃহে পদার্পণ করিতে না করিতে, শাশুড়ীকে খাইল, স্বামীটা শুষছে, বোধ হয়, তাকেও সাবাড় করবে। সকলেরই মুখে এক কথা "বাঁড়ুয্যে বাড়ীর সবই এতদিন ভাল ছিল, এই বউটা আসিয়া ভাঙ্গন ধরল, আর ওদের ভাল হবে না।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

"বিলাসিনীর দ্বারে।"

কমলকুমার কলবাড়ী হইতে বাহির হইয়া, অন্য দিন পাঁচজনের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যায়, আজ একাকী চলিয়াছে। তাহার মন চঞ্চল, বুদ্ধির স্থিরতা নাই, সে কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। এইরূপ অনিশ্চয়তার দোলায় দুলিতে দুলিতে কমলকুমার বাসায় আসিল, রন্ধনাদির আয়োজন করিল, পাককার্য্য সমাপন হইলে, সকলকে আহার করাইল। আহারে বসিয়া একজন বলিল, "ঠাকুর কি করেছ? ডালে নুন্ দাও নাই?" আর একজন বলিল, "বেশ, বেশ! তরকারিটা যে নুনে পুড়'য়েছ? আজ এমন কেন হলো? তোমার হাতে ত এ রকম হয় না।" কমলকুমার কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান। যাহা হউক, প্রভুরা কোন মতে মেখেচুকে অন্নগুলি উদরস্থ করিলেন। নিজে যখন আহার করিতে বসিল, তখন আট্‌টা বাজিল, শুনিয়া সে বুঝিল, তাহার মনের অবস্থা ভাল নয়, আর অলক্ষিত ভাবে তাহার মনের উপর বিলাসিনীর অনুরোধ ও অশ্রুজল জয়লাভ করিয়াছে, তাহা না হইলে এত শীঘ্র রন্ধনকার্য্য শেষ হইবে কেন? আহারান্তে কমলকুমার মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বাহির হইল। কিন্তু বিলাসিনীর গৃহে যাইবে কি না, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। যাওয়া না যাওয়ার বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, নিজের ইচ্ছা এবং প্রিয়জনের অনুরোধ এই উভয়ের সংগ্রামে জয় পরাজয়

নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বেই, কমলকুমারের চরণ দুখানি, সিরাজউদ্দৌলার আশ্রয়-স্থল মিরজাফরের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক হইল। কমলকুমার যখন স্থির বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন দেখিল, সে বিলাসিনীর দ্বারে দণ্ডায়মান! অথবা বিলাসিনীর দ্বারে পৌঁছিয়া তাহার বুদ্ধি স্থিরতা লাভ করিল!! তাহার দ্বারই তাহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় বিদূরীত করিল!!!

কমলকুমার অগ্রসর হইয়া দেখে বিলাসিনী বহুক্ষণ হইতেই দ্বারে দণ্ডায়মানা। সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, কমলকুমারও অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে—অতি নিকটে দাঁড়াইল। কিন্তু উভয়েই যেন চির অপরিচিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কেহই কথা কয় না। বিলাসিনীর গৃহে তাহার জননী আছে। কমলকুমারের আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত মা ও মেয়েতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সহসা কথা বন্ধ হওয়ায় তাহার মা দুই তিনবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই যার সঙ্গে দেখা কর্‌বি বলে দাঁড়য়ে ছিলি, সে কি এসেছে? কোন উত্তর নাই। শেষে মা একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, দুজনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোন কথাই নাই। মা ভাবিল, আমাকে দেখেই বুঝি চুপ করিয়াছে। এই ভাবিয়া দূরে গেল, গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, নীরবে স্পন্দরহিত ভাবে দুজনেই দাঁড়াইয়া। ভাবিল এ কেমন হইল! মেয়েটা কি পাগল হয়েছে? তৎক্ষণাৎ মনে হইল, মেয়ে যে বলেছিল লোকটী বড় লাজুক্, আস্‌বা মাত্র তুমি তোমার ঘরে যেও। স্মরণ হইবা মাত্র বিলাসিনীর মা উদ্বিগ্ন-চিত্তে নিজের ঘরে গিয়া বসিল—পরে শয়ন করিল—ক্রমে ঘুমাইল।

বহুক্ষণ দুইজনে নীরবে নিকটে নিকটে দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিল, কেহই কথা কহিল না। কতক্ষণ যে এই ভাবে কাটিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই, তবে বহুক্ষণ যে কাটিয়াছে তাহা ঠিক, কারণ সে দিন কৃষ্ণা পঞ্চমী, দশদণ্ড রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হইতেছে, রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, নবোদিত চন্দ্রালোকে বিলাসিনী দেখিল, কমলকুমার স্থির—ধীরভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার মনে হইল যেন সেই নবীন যুবক অনন্তকাল ধরিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে, তাহার বোধ হইল, কলবাড়ীর সেই যুবকমজুর তাহার জীবনের পরম সম্পদ—তাহার গৃহদ্বার আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে কি একটা অলৌকিক সৌন্দর্য্য—কি একটা লোক-বিরল বিশেষত্ব আছে, যাহা মানব-সংসারে আর

কোথাও সে দেখে নাই, সেই মহামূল্য বস্তুর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিতে—তাহারই সমাদরে স্নিগ্ধ হইতে—প্রাণ জুড়াইতে বিলাসিনীর প্রাণটা হালুচালু করে। যখন মনে হইল, ইহার আপাদমস্তক সমস্তটা আমার হইলেই আমি ধন্য হই, জীবন ধারণ সার্থক হয়, তখনই ইচ্ছা হইল, বলে, "তুমি আমার—আমার সর্ব্বস্ব ধন—আমার ঘরে এস।" কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দ্বার অতিক্রম করিতে অনুরোধ করিবে না। তখন আর সে কমলকুমারের মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না। তাহার চির নৃত্যশীল লোচনদ্বয় মুদিত করিল—ঝর ঝর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। দুই হাতে নিজের মুখখানি আবৃত করিল—হৃদয়ের যাতনা অসহ্য হওয়ায় দাঁড়ান অসম্ভব বোধে কমলকুমারের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। কমলকুমারও বসিল। বসিয়া বলিল, "ছি! তোমার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের এত ব্যস্ত—এত ব্যাকুল—এত অধীর হওয়া কি ভাল?" এই কথা বলিতে না বলিতে,সে অশ্রুপ্লাবিত মুখের আবরণ সরাইয়া ফেলিল। সে অনুরাগ উচ্ছলিত—প্রেমোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে কি একটা কি, পবিত্র সুন্দর জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল,যাহা কমলকুমার সহ্য করিতে পারিতেছে না, অথচ সে শোভা হইতে চক্ষুও ফিরাইতে পারিতেছে না। সে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, অথচ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বদ্ধ দৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। বিলাসিনী উদ্ধতা ফণিনীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, মরাল গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া, কটাক্ষনিপুণ নয়নদ্বয় হইতে ঝলকে ঝলকে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া বলিল, "পুরুষ স্পর্শমণি—অমূল্য ধন, কখন অস্পৃশ্য বা পতিত হয় না। স্ত্রীলোক যত ভাল হউক, সামান্য দোষে ঘৃণিত—পরিত্যক্ত—পদদলিত।" বলিতে বলিতে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। কমলকুমার বলিল, তুমি কেন এরূপ ভাবিতেছ? তোমাকে ত আমি অনাদর করিনা।

বিলা। (কাঁদিতে কাঁদিতে কমলকুমারের পায়ে ধরিয়া) "তবে আমাকে রক্ষা কর, তোমার যে রাঙ্গা পায়ে জীবন বিক্রয় করেছি—কেন করেছি জানি না—এই রাঙ্গা পায়ে—এইখানে একটু স্থান দাও।

কমলকুমার তাহার অশ্রুসিক্ত প্রেমানুরঞ্জিত মুখ-কমল নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অতি যত্নে—অতি স্নেহভরে—সোহাগ করে—তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, আদর করিয়া, বলিল "এখন হয়েছে?" কমলকুমারের বুকে মাথা রাখিতে

পাইয়া বিলাসিনীর আপাদ মস্তক এক অব্যক্ত—অপার্থিব সুখের হিল্লোলে ভাসিয়া গেল, তাহার সমগ্র শরীরে রোমাঞ্চ হইল, সে আর কখনও এরূপ সমাদর-সুখসিঞ্চিত হয় নাই। গায়ে কাঁটা দিয়াছে দেখিয়া, কমলকুমার আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। তখন সে রমণী হৃতচৈতন্য হইয়া কমলকুমারের সাহায্যে কমলকুমারের ক্রোড়ে সুখে—পরম সুখে শায়িত, বহুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্যোদয়ে কমলকুমার আবার বলিল "এখন হয়েছে ?"

বি। (অতি ক্ষীণস্বরে) কি 'হয়েছে' ? কিছুই ত জানি না, কখনও জানিতাম না এমন একটা সুখের এক কণা যেন আমার উপরে কে ছড়াইয়া দিল; সমস্ত শরীর যেন সেই কণার ভারে অবশ হইয়া পড়িল—আর যেন গায়ে কাঁটা দিল, গায়ে কি কাঁটা দিয়েছিল ?

ক। হাঁ দিয়েছিল। আমি নিজ হাতে তাহাদিগকে তাড়াইতে গেলাম, কিন্তু তাহারা শেষে আমাকেই ধরিয়া বসিল। বলিতে আমার ভয় হইতেছে, পাছে আবার সেই রকম হয়। সে অবস্থায় সুখ আছে, কিন্তু আমি আর তা চাই না। দেখ রাত অনেক হয়েছে, তুমি ঘরে যাও, আমিও বাসায় যাই।

বি। এই অবস্থায় আমাকে এইখানে ফেলে রেখে যেতে চাও ? যাও।

ক। এই উঞ্ছবৃত্তির দিনে—এই দুঃখ যন্ত্রণার দিনে—তোমার হাসিভরা মুখই আমার একমাত্র সুখ, তোমাকে দেখিতে পাই, তাই কাজে আসি, বিশ্বাস কর না ?

বি। না—বিশ্বাস করি না।

তা—হলে তুমি কি আমার এমন দশা করতে পারতে ?

তা—হলে তুমি কি আমার বাড়ীর দরজায় এসে বসে থাকতে ?

তা—হলে তুমি কি এত সাধ্য সাধনায়ও আমার উপর বিরূপ থাকতে ?

তা—হলে তুমি আমার বুকের ধন, আমার বুকেই থাকতে।

ক। আমি তোমাকে—বড়ই বেশী—আদরের পাত্রী মনে করি, কিন্তু আর বাড়াবাড়ি ভাল না। তোমার অনুরোধ—তোমার আব্দার এড়াইতে পারবো না বলেই, ভয়ে দূরে দূরে থাকি—সাবধান হইয়া চলি—তা না হলে, সত্যই কি আজ তোমার দরজায় বসে তুমি চক্ষের জল ফেলিতেছ, আর আমি বসে বসে দেখছি, আমি এতটাই নির্ম্মম ? এমন নিষ্ঠুর—কঠোর কেন ভাবিতেছ ?

বি। তোমাকে কোন কথা বলা আমার মুখে শোভা পায় না, বলিতেও চাই না। তবে পুরুষ কঠোর বইকি—বড় শক্ত—স্ত্রীলোকে পারে না।

ক। আমাকে দেখে তোমার সেইরূপই মনে হয়। কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর। আমি ত তোমাকে বলেছি, আমি আমার নহি—আমি অন্যের—আমি যাঁহার তাঁহাকে যদি কখনও পাই, তবেই এ জীবন ধারণ স্বার্থক হইবে—নতুবা এই অধোগতির সোজা পথই আমার নিয়তি।

বি। তবে আমিই কি তোমার অধোগতির সোজা পথ? তবে তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পার নাই, আর শত চেষ্টা করিয়াও তুমি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবেও না। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব—যাও তুমি বাসায় যাও, আমিও ঘরে যাই।

দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইল—উভয়েই যেন উভয়ের অপরিচিত, এমন ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুজনেই নতমস্তকে পরস্পরের চরণের শক্তির পরীক্ষা করিতে লাগিল। কাহার পাদুখানি স্ববশ—স্বাধীন—গতিশীল,তাহারই পরীক্ষা লইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে একটা প্রতিযোগীতার ভাব দাঁড়াইল।

বি। যাও না।

ক। ছেড়ে দাও না।

বি। কে আমি ত ধরিনি, ছাড়াই আছ।

ক। না ধরাই আছি—পা তুলিতে পারিতেছি না—যেন কিছুতে বাঁধা।

বি। তোমার ভুল। অনেকক্ষণ বসে ছিলে, পায়ে বোধ হয় ঝিঁঝিঁ ধরেছে। একটু নাড়া চাড়া দাও, এখনই সেরে যাবে।

ক। ঝিঁঝিঁ ধরা কাকে বলে আমি জানি না, না?

বি। তবে আর কি? আমি ধরিনি—বল ত তোমায় না হয় একটু এগ্‌য়ে দিয়ে আসি।

"তোমাকে আর কষ্ট পেতে হবে না,তুমি ঘরে যাও" এই বলিয়া কমলকুমার পলায়ন করিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ অপরিতৃপ্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা-পরিচালিত—পলক-রহিত দৃষ্টিতে সে সেই পলায়নতৎপর প্রিয়জনের দ্রুত পাদ-বিক্ষেপের দিকে চাহিয়া রহিল। অদৃশ্য হইলে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শূন্যহৃদয়মন লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল—দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিল—

ভাল লাগিল না, উঠিয়া বসিল—ভাল লাগিল না, দাঁড়াইল—তাও ভাল লাগিল না, পুনরায় দ্বার খুলিল—উঠানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোতি—ক্ষয়প্রাপ্ত চাঁদের মুখখানি দেখিতে লাগিল—ভাল লাগিতেছে দেখিয়া, বিরক্ত হইল—চিরজীবনের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য, আজ যেখানে এক কণা প্রকৃত সুখ ভোগ করিয়াছে,সেইখানে গেল—শূন্য স্থান দেখিয়া নয়নপ্রান্তে ক্লান্ত অশ্রুকণা দেখা দিল—যেখানে দুজনে বসিয়াছিল—যেখানে কমলকুমারের ক্রোড়ে শয়ন করিতে পাইয়াছিল, সেই স্থানটাই কেবল সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, প্রাণের কাতরতার ভারে—হৃদয়ের মহাশূন্যতায় বেচারা এলোথেলো হইয়া সেই স্থানটীকে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছে—এমন সময়ে তাহার মা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌ছিস বল তো?" মেয়ের মুখে আর কথা নাই, মাটীর গড়া মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল! চক্ষের জল সামলাইতে পারিল না! মা বলিল, "চখে জল কেন—কি হয়েছে বল? আজ আমাকে বল্‌তেই হবে। আজ ৩।৪ মাস ধরে তোর কি হয়েছে? এমনটা ত ছিল না!"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গণনার ফলে।

সন ১২৭৯ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ সুন্দরীর বিবাহ হয়—পরদিন ১৬ই প্রাতঃকালে সুন্দরী বধূরূপে নবীনকৃষ্ণের গৃহে পদার্পণ করে। সেই দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে মানসিক উত্তেজনা-জাত মূর্চ্ছারোগে নবীনকৃষ্ণের স্ত্রী লোকান্তরিত হন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইচ্ছামতী-তীরে তাঁহার সৎকার সমাধা হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রাণভূষণ স্নানান্তে জননীর এক খণ্ড অস্থি ভাগীরথী-নীরে অর্পণ মানসে গৃহে আনিয়া খিড়কীর বাগানে এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া দেন। সে আজ দুই মাসের কথা। সুন্দরীর এই দুই মাস কি ভাবে কাটিয়াছে, সে বালিকা নিজে তাহা বলিতে পারে না—অন্যেও তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না। এই দুই মাসের মধ্যে তাহার দিবারাত্রির ভেদ জ্ঞান ছিল না—আহার ও উপবাসের জ্ঞান ছিল না—নিদ্রা ও জাগরণের জ্ঞান ছিল না। সে বিবাহিত কি কুমারী সে তাহা ভাবিত না। সে পিত্রালয়ে কি শ্বশুরালয়ে তাহার সে চিন্তাও ছিল না—সে সংসারে কি পরলোকে তাহাও সে ভাল বুঝিত না। প্রাণহীন গতিশীল জড়ের ন্যায় এক বিচিত্র দৃশ্য!

নবীনকৃষ্ণের গৃহে পদার্পণ করার দিন হইতে সুন্দরী সকলের বিষ নয়নে পড়িয়াছে। কেহই তাহাকে দেখিতে পারে না। কেবল শ্বশুর নবীনকৃষ্ণ সুন্দরীকে নিজ কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি যতই

জানিতে পারিতেছেন যে,বাড়ীর সকলেই তাহার উপর নারাজ—তাঁহার স্নেহের ধারা ততই প্রবলবেগে তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে। কেন এরূপ হইতেছে? বাটীর সকলের অত্যাচার ও বিরূপ ভাবই কি এরূপ ঘটনার কারণ? না, আর কিছু আছে? আরও কিছু আছে। শুভক্ষণ বলিয়া একটা কিছু আছে, তাহার বলে অনেক জিনিস ফলে। সুন্দরী যে সময়ে নবীনকৃষ্ণের গৃহে পদার্পণ করে, যখন সকলে অতিমাত্র ব্যাকুল হয়ে তাহার মুখখানি দেখিতে অগ্রসর, সে সময়টা সুন্দরীর জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত নহে—যাহারা নিজগুণে ভাল দেখিল, তাহারা ভালবাসিল—যাহারা মন্দ দেখিল,যাহারা অপছন্দের ভাব লইয়া দেখিল, তাহারা চির শত্রু হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাটীর সকলেরই কু-নজরে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর গিন্নীর মৃত্যু ও বিধুভূষণের দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগ, তাহার প্রতি অপ্রীতি বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু বিধুভূষণের দুরারোগ্য রোগ ভোগে ও তাহার জননীর মৃত্যুতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ ও ক্ষতি কাহার? নবীনকৃষ্ণের। সেই নবীনকৃষ্ণ কি গুণে পুত্রবধূটীর উপর এরূপ স্নেহবান? সে কালের আদর্শ হিন্দু গৃহস্থের লক্ষণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নবীনকৃষ্ণে বিদ্যমান। তিনি দীর্ঘকাল সংসারে সুখে বাস করিয়াছেন, সুতরাং প্রবীণ বয়সে পত্নীবিয়োগ তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইলেও সে জন্য অধীর নহেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাহার আরোগ্য লাভের জন্য যথাসাধ্য যত্ন, চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তাহার ভাল মন্দ হইলে, তিনি শোকের উপর শোক-শেলে আহত হইয়া ভগ্নহৃদয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন। কিন্তু তবুও কর্ত্তব্যবিমুখ হইবেন না এবং যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে ধর্ম্মসঙ্গত হয় ও ভাল দেখায়, তিনি সেইরূপই করিতে অভ্যস্ত। কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সুন্দরীর প্রতি অল্প সময় মধ্যে তাঁহার স্নেহাধিক্যের গূঢ় কারণ এই যে, তিনি যখন পুত্রের বিবাহের জন্য স্বয়ং পাত্রী দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন সুন্দরীকে দেখিয়া কেবল যে তাঁহার পছন্দ হইয়াছিল, তাহা নহে, সেই প্রথম দর্শনে তাহার প্রতি তাঁহার পিতৃস্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার কন্যা ও বধূগণের কেহই তাঁহার এরূপ সু-নজরে পড়ে নাই। এই জন্য তিনি সুন্দরীতে পুত্রবধূ ও কন্যা উভয় ভাবই অনুভব করিয়া থাকেন। এরূপ স্নেহের প্রসর দিন দিন বৃদ্ধি হইবার অন্যান্য কারণও আছে; তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

বিধুভূষণ কলেরার করাল গ্রাস হইতে সুচিকিৎসার প্রভাবে অব্যাহতি পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার দেহের দক্ষিণদিকটা আপাদমস্তক অবশ হইয়া গিয়াছে এবং সেই বিবাহের পরদিন হইতে সমান ভাবে শয্যাগত রহিয়াছে। তাহার বিবাহ আজ পর্য্যন্ত অঙ্গহীন। বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কুশণ্ডিকা হয় নাই—পাকস্পর্শও হয় নাই। দুই মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। এখনও বিধুভূষণ আরোগ্য হইল না—উপস্থিত পীড়ায় আরোগ্যের সম্ভাবনাও অল্প দেখিয়া, ডাক্তার বাবু একদিন নবীনকৃষ্ণকে বলিলেন, "আপনি বিধুভূষণকে একবার কলিকাতায় লইয়া গিয়া, কোন উপযুক্ত চিকিৎসককে দেখাইলে ভাল হয়। অনেক দিন হইল। এরূপ ভাবে আর অধিক বিলম্ব করিতে আমি পরামর্শ দিই না।"

ডাক্তারের পরামর্শে নবীনকৃষ্ণ চিকিৎসার্থে পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

নবীনকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রাণভূষণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগীর সেবার জন্য সঙ্গে কে যাবে? কন্যা ও বধূগণের কেহই যাইতে তত সম্মত নহেন শুনিয়া, নবীনকৃষ্ণ ক্ষুন্ন হইলেন। একে একে সকলকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই প্রসন্নচিত্তে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। তখন বৃদ্ধ দুঃখ করিয়া বলিলেন "সেবার জন্য সঙ্গে যাইবার লোক যে ছিল, সে চলে গেছে, এখন ছেলের কেন, আমারই ভাগ্যে যে শেষ কি আছে, কে বলিতে পারে? হয়ত গোবিন্দই আমার শেষ সম্বল।" এই কথায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষুন্ন ও লজ্জিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন "তোমাদের এরূপ আচরণে বাবার মনে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, কখনই এরূপ হইতে দেওয়া উচিত নহে। শত অসুবিধা হইলেও তোমাদের যাওয়া কর্ত্তব্য। দেখ কে যেতে পার।" নবীনকৃষ্ণ বলিলেন "বল-পূর্ব্বক বাধ্য করিয়া কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাই না—না হয়, গোবিন্দ আছে, একাকী ছেলে নিয়ে যাব।" এই বলিয়া নবীনকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্র-বধূকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মী! তুমি আমার বাড়ীতে আসিয়া অবধি দুঃখে কাল কাটাইতেছ। এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ গৃহে তোমার সুখোদয় হয় নাই। তুমি বালিকা, ইচ্ছা ছিল, এটা তোমার শ্বশুর বাড়ী বলিয়া বুঝিতে দিব না। তুমি পিতামাতার এক মেয়ে। এরূপ যত্নে রাখিব, যে,

ঘর ছেড়ে ঘরে এসেছ বলে মনে করিবে; এই সাধ ছিল, কিন্তু বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন। এখানে পরের গৃহে অপরিচিতার ন্যায় পড়িয়া আছ। তোমাকে উপযুক্ত যত্ন ও স্নেহে লালন পালন করিবার লোক তুমি আসিতে না আসিতে চলিয়া গেল। তুমি দুঃখিনী ও মন্দভাগিনী, কিন্তু তুমি সৎ ও শান্ত। তোমার মা অতি কাতরতা জানাইয়া তোমাকে পাঠাইতে বলিয়াছেন—তোমার ঠাকুর-দাদা তোমাকে নিতে কতবার লোক পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তুমি যাও নাই। কেবল তাই নয়, প্রয়োজন মত তোমাকে যখন যা বলেছি তুমি তাহাই করেছ। তুমি বালিকা হইয়া,নববিবাহিতা বধূ হইয়া,এ গৃহের কেহ না হইয়াও তুমি যাহা করিয়াছ তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তুমি কেবল সুন্দরী নও, মা তুমি গুণবতী সুন্দরী। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার চিকিৎসার জন্য যদি কলিকাতায় যাই, তুমি কি সঙ্গে যেতে পারবে? সুন্দরী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়াছিল, শ্বশুরের মিষ্ট কথা ও স্নেহ মমতায় আর্দ্র হইয়া অশ্রুপাত করিতেছিল, এখন ইঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া শ্বশুরের রায়ে সায় দিয়া চলিয়া গেল। তখন নবীনকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, যাকে তোমরা দুবেলা দূর ছাই করিতেছ, সেই পরের মেয়েটা ঠাকুরদাদা ও মায়ের উপরোধ এড়াইয়া যা করিতে পারে, তোমাদের খেয়ে দেয়ে তোমাদের ঘরে যারা এত বড় হলো তারা সেটুকুও পারে না। এই কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অগ্রসর হইয়া কর্তার পায়ে ধরিয়া বলিলেন,"আমাকে যাহা হুকুম করিবেন,আমি তাই করিব। আর লজ্জা দিবেন না।" তখন নবীনকৃষ্ণ বলিলেন "বড় মা! এত কাল এক সংসারে একত্রে বাস করে যদি আজ এই কাজের জন্য হুকুম করিতেই হইল, তবে আর শ্বশুরে ও হাকিমে প্রভেদ কি? হাকিমে হুকুম করে, শ্বশুরে ইচ্ছা করে। আমার ইচ্ছা বুঝিয়া সেই মত কাজ করিতে অগ্রসর হইলেই ঠিক হইত। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ছোট বউমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে পার।"

নবীনকৃষ্ণ বিধুভূষণকে লইয়া সুদিন দেখিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সঙ্গে গেল ভৃত্য গোবিন্দ, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রাণভূষণ। সম্মুখে মাঘীপূর্ণিমায় ত্রাণভূষণ জননীর অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য যাইতেছেন। সে কার্য্য সমাধা করিয়া পরে ২।৪ দিন পিতার নিকট থাকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়া বাড়ী আসিবেন। এবং পিতার আদেশমত বাড়ীর কাজকর্ম্ম চালাইবেন। তিনি বাড়ী ফিরিলে পর, মধ্যম ও তৃতীয় পুত্র কর্ম্মস্থানে যাইবেন।

কলিকাতায় কুমারটুলীতে নবীনকৃষ্ণের অনেক পরিচিত লোক কর্ম্ম কাজ ও ব্যবসায় সূত্রে বাস করেন। তাহাদের নিকটে একটী বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতা অবস্থান কালে সপ্তাহে তিন দিন তাঁহাকে টাকীর বাবুদের বরাহনগরের বাটীতে উপস্থিত হইতে ও বিষয়কর্ম্ম দেখিতে হয়। কলিকাতার মেডিকেল কালেজের জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসকের উপর বিধুভূষণের চিকিৎসার ভার দিলেন। ডাক্তার সাহেব এক এক করিয়া অনেক বার আসিলেন, অনেক টাকাও লইলেন। ঔষধ পত্রের ব্যবস্থাও অনেক করিলেন, কিন্তু বিধুভূষণের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শে ডাক্তার ছাড়িয়া কবিরাজের চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইল। নিকটেই গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাস। তাঁহাকেই আনিয়া দেখান হইল। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা ও চিকিৎসার ক্রম শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "অনেক বিলম্ব হইয়াছে, রোগীর অবস্থাও তত আশাপ্রদ নহে। তবে স্থির ভাবে কিছু দিন অপেক্ষা করিলে, কিরূপ হয়, বলিতে পারি না। কিন্তু এ অবস্থায় আরাম হইবেই, আমি এরূপ বলিতে পারি না।"

নবীনকৃষ্ণ সকলের পরামর্শ মত কবিরাজী চিকিৎসার উপর নির্ভর করিলেন। কবিরাজ মহাশয় এক সপ্তাহের মত মাখিবার তৈল ও খাইবার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। তৃতীয় দিবসে রোগীর অবস্থা জানাইতে বলিয়া গেলেন।

জলের মত অর্থ ব্যয় হইতেছে। নবীনকৃষ্ণ তাহাতে কৃপণ, বা কাতর নহেন। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ রন্ধনাদি কার্য্য ও রোগীর পথ্যের ব্যবস্থার ভার লইয়াছেন। গোবিন্দ হাট বাজার সমস্তই করে। তাহার বিশেষ কাজ ঔষধের অনুপান ইত্যাদি সংগ্রহ করা। ঠিক সময়ে ঔষধ খাওয়ানটা তাহার বিশেষ কাজ। সুন্দরী বিধুভূষণের সেবায় নিযুক্ত। আশ্চর্য্য এই যে এই অপরিচিত স্বামীর সেবায়, সে বালিকা যে ভাবে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। মলমূত্র পরিষ্কার করা, নিকটে বসিয়া বাতাস করা, জল দেওয়া, আহার করান ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য সে নিজে করে—করে সমস্তই—যাহা করে, তাহা সন্তুষ্ট

ঘর ছেড়ে ঘর করিয়া থাকে—কিন্তু কাহারও সঙ্গে একটী কথা কয় না। তাহার চলা বাদ সাধিরা—তাহার কাজ কর্ম্ম—তাহার ভাব গতিক, দেখিলে বোধ হইবে যে, সে উপায় যেন কলের পুতুলের মত অন্য কাহারও হাতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহার জীবন আছে, বা, সে কথা কহিতে পারে,তাহাকে দেখিলে তাহা বোধ হয় না। জীবিতের লক্ষণ যাহা, তাহা তাহাতে নাই। এখনকার সুন্দরীতে কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, প্রেম নাই; তাহাতে সজ্জনতা আছে, প্রফুল্লতা নাই; তাহাতে কাজ করিবার শক্তি আছে,পূর্ব্বের সে ব্যক্তি নাই; তাহাতে অশ্রুজল ও দীর্ঘনিশ্বাস আছে, হাসি নাই, বাল্য উচ্ছ্বাস নাই। এইরূপ আত্মবিস্মৃত, কর্ম্মনিরত, সুন্দরীকে এক দিন বিধুভূষণ একাকী পাইয়া ডাকিল। ডাকিবামাত্র সুন্দরী নিকটে আসিল। বিধুভূষণ তাহাকে নিকটে বসিতে বলিল। সে বসিল। বিধুভূষণ বলিল, "দেখ, আমি বুঝিতে পারিতেছি,আমার দিন ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। আমি চির জীবনের জন্য তোমাকে দুঃখিনী করিয়া চলিলাম। তোমার মত সুশীলা ও সুন্দরী স্ত্রী সংসারে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে—যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে সংসারে সুখী হয়, সুখের সংসার গড়িয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পায়। আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। আমার বাবা বড় ভাল লোক। তোমার আচরণে তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট। তুমি তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শমত চলিবে, তাহা হইলেও নামে বিবাহ হইয়া পরে, শতবিধ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও একবিন্দু সুখ সময়ে সময়ে অনুভব করিতে পাইবে। আমি ত চলিলাম, কিন্তু তোমার পরিণাম ভাবিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত একদিনও তোমাকে ভাল করিয়া দেখি নাই,আজ একবার তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কও,আমি তোমার কথা শুনিয়া ও তোমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া মরি।" এই কয়টী কথা সুন্দরীর প্রাণ স্পর্শ করিল,তাহার লোচনদ্বয় আর্দ্র হইল। তাকাইতে বলায় সে ম্লানমুখে,অশ্রুপূর্ণ নয়নে,একটীবার বিধুভূষণের দিকে তাকাইল। তখন বিধুভূষণ অতি মিষ্ট—অতি কাতর স্বরে বলিল, "বাবার কথামত চলিও, তোমার ভাল হবে,কেমন, চল্‌বে তো" ? সুন্দরী অতি স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিল "হ্যাঁ, চল্‌বো।" এমন সময়ে নবীনকৃষ্ণ কবিরাজের বাড়ী হইতে আসিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া বিধুভূষণকে দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেরূপ একবার উজ্জ্বল হয়—ঘর আলো করে, বিধুভূষণের মুখে

.এখানি একটা উজ্জ্বলতা, তেমনি একটা ঘর আলো করা সৌন্দর্য্য দেখিয়া চকিত ও ভীত হইলেন—পুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ বাবা" বিধুভূষণ বলিল,"অনেক দিনের পর,বাবা আজ একটু ভাল বোধ হচ্চে।" নবীনকৃষ্ণ পুত্রের নিকটে গিয়া গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন—একটু আদরও করিলেন। বউটীকেও আদর করিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী! দেখ, বিধাতা যদি দয়া করে তোমার মুখ রক্ষা করেন। তুমি, অনেক খেটেছ, অনেক করেছ, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।" সুন্দরী শ্বশুরকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়ে সুন্দরীর পিতামহ গঙ্গাধর নাতিনী ও নাত্জামাইকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সুন্দরী ইতিপূর্ব্বে কখনও একদিনের জন্য জননী ও ঠাকুরদাদাকে ছাড়িয়া থাকে নাই। বিবাহের দিন হইতে এই ৩।৪ মাস মাকে ছাড়িয়া,দাদামশাইকে ছাড়িয়া,শ্বশুর গৃহে বাস করিয়াছে। সুন্দরী সেখানে গঙ্গাধরের পৌত্রীর ন্যায়,মায়ের একমাত্র মেয়ের মত, আদর ও যত্নে বাস করে নাই। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সকল কাজই করিয়াছে। দাসীপনা করিয়াছে 'এটা করিব,ওটা করিব না' এরূপ ভাবে কাজ করে নাই। শ্বশুরের মিষ্ট কথা ও আদর যত্নে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমানে পরিচারিকার ন্যায় সকলের, বিশেষ ভাবে রোগীর সেবা করিয়াছে,কিন্তু এই দীর্ঘকাল অপরিচিতের ন্যায় খাটিয়াছে, মূকের ন্যায় কাল কাটাইয়াছে, আজ ঠাকুরদাদাকে দেখিয়া নিজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িল—তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—গঙ্গাধরের স্নেহ অসীম, তাতে একমাত্র পৌত্রী—প্রাণতুল্য স্নেহের পাত্রী—তাহাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন—তাহার অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিয়াছে। নাতিনীর মাথায় হাত দিয়া গণ্ড স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছিস্?" সুন্দরী শ্রাবণের ধারাসিক্ত হইয়া অবশ শরীরে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। গঙ্গাধরকে দেখিয়া নবীনকৃষ্ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, অগ্রসর হইলেন, উভয়ে অভিবাদন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। বিধুভূষণের রোগ ও চিকিৎসার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া এবং বিধুভূষণকে দেখিয়া গঙ্গাধর এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, এত দিনে গণনার ফল ফলিতে চলিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন পরীক্ষাতে।

কমলকুমার পরদিন যথা সময়ে কর্ম্মস্থানে গেল—কাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু হাজিরার সময় অতীত হইয়া গেল, তথনও বিলাসিনী আসিল না দেখিয়া, কমলকুমারের মনে কেমন একটা অশান্তির সূত্রপাত হইল। যত বেলা হইতে লাগিল, ততই তাহার মন অধিকতর চঞ্চল হইতে লাগিল। ক্রমে বেলা ৯টা বাজিল, কমলকুমার বাসায় চলিল। পথে কত শত চিন্তা মনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কোনটাই স্থির ভাবে কমলকুমারের মনের উপর বসিতে পাইতেছে না। এইরূপ উদ্বিগ্ন চিত্তে বাসায় আসিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। পূর্ব্ব রাত্রের তিরস্কারের জন্য একটু সাবধান হইতে প্রয়াস পাইল—কিন্তু তাতে বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল, গত রাত্রির ব্যাপার, সেই [illegible] পারে. নিজের কর্ত্তব্যের দৃঢ়তানিবন্ধন নিষ্ঠুরতা, স্মরণ করিতে হৃদয়ে কে[illegible]কটা ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাই অবিচ্ছেদে চিন্তার গতি বিলাসিনীর দিকে[illegible]ত-নিয়ত তাহাকে স্মরণ করিতে—নানা মতে তাহাকে সোহাগ ভরে আদ[illegible] —তাহার মনক্ষুণ্ণতা দূর করিতে, হৃদয়ে কেমন একটা আগ্রহের সঞ্চার হ[illegible]ছে। রন্ধনাদি কার্য্যে যতই অধিকতর মনোযোগ দিতে চেষ্টা করিতেছে, বি[illegible]সিনীর চিন্তা ততই প্রবল ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছে

"সে কাজে আসে নাই কেন?" এই উপলক্ষ করিয়া তখনই একবার তাহাকে দেখিয়া আসে, কিন্তু সে অনেক পথ—ছুটে গেলেও যেতে আস্‌তে একটী ঘণ্টারও অধিক লাগিবে, তাহা হইলে আর কাহারও খাওয়া হয় না। কাজেই যাইতে পারিল না। এই ভাবে নিজের হৃদয় মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে, পাকাদি সমাপন করিল। স্নান করিয়া সকলের আহারের আয়োজন করিল। সকলকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। মনের আশা এই যে, গিয়া দেখিবে বিলাসিনী নটার সময়ে একবারে নেয়ে খেয়ে কাজে আসিয়াছে। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, গিয়া দেখিল তাহার সম্মুখের স্থান শূন্য। "আজ সমস্ত দিন তাহাকে দেখিতে পাইবে না" এই চিন্তায় তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বিলাসিনীর পাড়ার অপর একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাহার অসুখ হইয়াছে, তাই আসে নাই। এ সংবাদে তাহার হৃদয় শান্ত হইবার নহে। কমলকুমার মনে মনে ভাবিল কি কুকর্ম্মই করেছি—"এই অধোগতির সোজা পথই আমার নিয়তি" আমি একথা যে তাকে লক্ষ্য করিয়া বলি নাই, তাহা তখন কেন বলিলাম না। তাহার নিকট হইতে তখন চলিয়া আসিবার জন্য ঐ কথাটা বলিয়া ফেলিলাম—সে যে আমার লক্ষ্যস্থল ছিল না, আমার বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই, আমি যে ঐ কথা বলিয়াছিলাম, এ কথা আমি তাকে কেন বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না! এই বলিয়া অভিমান ভরে নিজের কাজের যায়গায় বসিয়া পড়িল। বসিলে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। বসিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল—নিজের উপর রাগ করিয়া গালে মুখে চড়াইল—কলের লৌহদণ্ডে মাথা খুঁড়িল। তাহার এখনও কাজের সময় হয় নাই, তাই বসিয়া খানিকটা নীরবে রোদন করিল। বিলাসিনীর পাড়ার স্ত্রীলোকটী তাহা জানিতে পারিয়াছে, তাই একটু অগ্রসর হইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "আমি সব দেখিছি, বলে দেবোকোন্।" কমলকুমার যেন শুনিয়াও শুনিল না। সে দিন আর তাহার কাজ কর্ম্ম হইল না, কোন রকমে রোজ বজায় রাখিল।

পুরন্দর এত দিন লোক-মুখে শুনিত এবং দৈবাৎ আভাস ইঙ্গিতে ইহাদের আত্মীয়তার ছিটে ফোটা দেখিতে পাইত। তাহার কারণ এই যে কমলকুমার ও বিলাসিনী দুজনেই পুরন্দরের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত, তবুও নিস্তার পাইত না। আজ কিন্তু কমলকুমারের অবস্থা দেখিয়া

পুরন্দর সমস্তটাই বুঝিয়াছে। তাই বার বার আসিয়া ঐ বিষয়ের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। বিরূপ ব্যক্তির বিদ্রূপ কত তিক্ত,ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহা বুঝিবে না। লোক সব সহ্য করিতে পারে, শত্রুর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতে ও বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু বিরূপের বিদ্রূপের তিক্ততার ঝাল—ঝালের ঘনত্ব—জীবনব্যাপী, তাহা সহজে যায় না। শৈল-শিখর-নিঃসৃত প্রবল বারিধারা পাতে, সুকঠিন পর্ব্বত-দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিরূপ ব্যক্তির জিহ্বাগ্রভাগ-নিঃসৃত বিদ্রূপের বিষময় দাগের উপর, তাহার জীবনব্যাপী অনুশোচনার ধারা নিপতিত হইলেও সে দাগ মিলায় না—তাহার কটুত্ব দূর হয় না। সে দাগ বড়ই কঠিন! পুরন্দর কমলকুমারের উপর তদপেক্ষা শত গুণে অধিক বিরূপ—তাই কঠিন—কঠিন কটু হইলে যাহা হয়, কমলকুমারের পক্ষে পুরন্দর তাহাই। সেই কঠিন প্রকৃতি ও কটু হৃদয় পুরন্দরের আত্মীয়তামাখা উপহাস 'মিছরির ছুরি!' আজ সমস্ত দিন এই মিছরির ছুরিতে কমলকুমার ক্ষত বিক্ষত হইয়া,অশ্রু-প্লাবিত হাত দুখানি খাটাইয়া বহু ক্লেশে রোজ বজায় করিল। সন্ধ্যার সময়ে কমলকুমারের আর পুরন্দরের বাসায় যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। দুটী কারণ উপস্থিত—একটী বিলাসিনীর সংবাদ পাইবার জন্য ব্যাকুলতা—অপরটী নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ণ, ইতর প্রকৃতি পুরন্দরের অনুগ্রহভাজন হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে আর তাহার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু নিরুপায়,কোথায় যায়, এইরূপ যাতনাজড়িত অবশ হৃদয়ে —অলস পাদবিক্ষেপে, ধীরে ধীরে বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বড় রাস্তার উপর পশ্চাতে, অতি নিকটে সহসা কি একটা বৃহৎ জিনিসের পতন শব্দে চমকিত হইয়া, যেমন সত্বরপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে যাইবে, অমনি স্তূপিকৃত ইষ্টকরাশির উপর বেগে পতিত হইল। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায় মুখ, মাথা ও বুক রক্ষা করিতে গিয়া হাতে এবং পায়ে গুরুতর আঘাত লাগিল। বাম হাঁটুর আঘাত আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পথের লোক যাহারা চিনিত,তাহাদের কেহ কেহ ধরিয়া তুলিল, কেহ কেহ বা দয়া করিয়া বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। পালমহাশয় বলিয়া বাসার এক প্রাচীন লোক কমলকুমারকে খুব ভালবাসিতেন। তিনিও কলে কর্ম্ম করেন—জাতিতে সদ্‌গোপ, কলে কর্ম্মকারের কাজ করেন, বেতন পান বাসার সকলের চেয়ে বেশী,বয়সেও সকলের চেয়ে বড়,তাই সকলেই তাঁকে পালমহাশয় বলিয়া ডাকিত। তিনিই অগ্রসর হইয়া কমলকুমারের হাত

ধরিয়া আনিয়া বসাইলেন। জল আনিয়া ক্ষত স্থান সকল ধুইয়া দিলেন। অসাবধানতার জন্য আত্মীয়ের ন্যায় অনেক তিরস্কারও করিলেন। পুরন্দরের উপহাসের মাত্রা একটু বাড়িতেছে দেখিয়া,পালমহাশয় সরকার বাবুকে বিলক্ষণ দু দশ কথা শুনাইয়া দিলেন। কমলকুমারের স্বপক্ষে কেহ কিছু বলিলে, তাহার তাহা সহ্য হইত না; তাই সে আরও বিরক্ত হইল, কিন্তু তখন চুপ করিয়া রহিল। পালমহাশয় সেকালের লোক, কমলকুমার ব্রাহ্মণ বলিয়া, লেখা পড়া জানে বলিয়া, লোকও ভাল বলিয়া, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ ছিল। তাই সে এতদিন ঐ স্থানে কর্ম্ম করিতে এবং ঐ বাসায় বাস করিতে পারিয়াছে। আজ সুযোগ পাইলেই পুরন্দর চিম্‌টি কাটা কথায় মনের ঝাল ঝাড়িতেছে, আর আজ তাহার আচরণে কমলকুমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল "পারি ত আজই—এই রাত্রিতে কোথাও চলিয়া যাইব, নিতান্ত না পারি কাল কলে কাজ করিতে যাইব, আর ফিরিব না—এ বাসায় আর আসিব না—যদি এইখানেই থাকি তবে অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিব—ক্লেশ এর চেয়েও বেশী হয়, সহ্য করিব, কিন্তু এখানে আর থাকিব না।"

পালমহাশয় ও রসিক ঘোষ দুজনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। দুজনে পরামর্শ করিয়া কমলকুমারকে বলিল যে, এরূপ অসুস্থ অবস্থায় তাহার ঐরূপ ভাবে চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। কমলকুমার বুঝিল না, কিন্তু যখন দেখিল পাল-মহাশয় ক্ষুণ্ণ হইতেছেন, তখন চুপ করিয়া রহিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া আহারাদি বিষয়ে এই ব্রাহ্মণের সাহায্য পাইয়া পরে আজ তাহার এইরূপ অসমর্থতা ও অসুস্থতার সময়ে চলিয়া যাইতে দেওয়া অন্যায় ও অধর্ম্ম বোধে তাহা নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু পুরন্দরের ভাব ভিন্নরূপ—সে বলিতেছে "কোথায় যাবে? যাক্ না—অনেক আপনার লোক আছে কিনা—পড়ে থাক্‌লে দেখ্‌বে কে?" এই অসুস্থতার সময়ে তাহার কথা গুলি যেন "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।" অসহ্য হওয়াতে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সে সেই রাত্রিতেই সকলের অজ্ঞাতসারে বিদায় হইল। "যা হবার তাই হবে।" এইরূপ হৃদয়ের ভাবে অনির্দ্দিষ্ট পথে বাহির হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নদী-তীরে।

বিলাসিনী, স্নেহপ্রাণা জননীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া নিজের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থার ঠিক ছবিখানি মাকে দেখাইল। কন্যাগত প্রাণা বৃদ্ধা মাতা বুদ্ধিমতী ও সহৃদয়া। বেচারা গভীর দুঃখের পরিচায়ক শতধারা প্লাবিত চক্ষু মুছিয়া স্নেহভরে একমাত্র কন্যার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক বলিল—"মা! তোকে সুখী করবার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করিছি, কিন্তু পারি নি। যখন সে তোকে একটা বুড়ো বরে বিবাহ দিয়েছিল, তখন তাহার পায়ে ধরে কেঁদে বলেছিলুম "এমন কাজ করো না।" শুনিল না, টাকার লোভে ও বুদ্ধির দোষে তাহাই করিল, ফলও হাতে হাতে ফলিল। আমার যা আছে সব দিয়ে, আমার জান্‌টা দিয়েও যদি একটা ভাল মানুষের হাতে তোকে দিতে পার্‌তুম, তা হলেও মনটায় একটু সুখ থাক্‌তো—প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হতো—তা তুই বড় হয়েছিস্—আমি বেঁচে থেকে, যদি চখের জল ফেল্‌তে দেখি,তা হলে দুঃখ রাখ্‌বার ঠাঁই থাক্‌বে না।

রাত্রিশেষে শয়ন করিয়া বিলাসিনী বহুক্ষণ অশ্রুপাত করিয়া উপাধানসিক্ত করিল ও শেষে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জননীর আর নিদ্রা হইল না। মা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সাবধানে অন্যান্য কাজ সারিতে লাগিল। কন্যাকে জাগাইল না। বিলাসিনী বেলা ৮।৯ টা পর্য্যন্ত ঘুমাইল। জাগিয়া দেখিল অনেক বেলা হইয়াছে—সে দিন কাজে যাইবার আর সময় নাই, গেলও

না। পাড়ার একজনকে বলিয়া দিল, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তবে বলো যে তার অসুখ হয়েছে।

কিন্তু যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই একটা অনির্দ্দিষ্ট কারণসম্ভূত অব্যক্ত যাতনা বিলাসিনীর সমগ্র হৃদয় মনকে অধিকার করিল। কেন এমন হইতেছে, তাহার কারণ ঠিক অনুভব করিতে—ধরিতে পারিতেছে না। অথচ কারণটা প্রাণের অতি নিকটে—বুদ্ধি বিবেচনার ধারে ধারে যেন ঘুরিতেছে—ধরা দেয় দেয়—দেয় না। কমলকুমারই যে এই দারুণ যাতনার কারণ, তাহা ঠিক, কিন্তু সে যাতনার কারণ কিসে হইল? তাহাতেই বিলাসিনীর সংসার—তাহার জীবন—তাহার যৌবন, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিতেছে; তাহার আগমনে—তাহার উপস্থিতিতে হৃদয়-পারাবারে সুখ উছলিয়া উঠে—তাহার লোকবিরল সৌন্দর্য্যভরা, শোভনদৃশ্য মুখখানি সুখপ্রদ—সে হাসি-মাখা চোখে চাহিয়া থাকা—সে মুখের রাগ রাগ—ভার ভার ভাব—তাহার সে মিষ্ট কথা—তাহার সে রাগের ভরে তিরস্কার আমার জীবনের সুখের অনন্ত ভাণ্ডার; কিন্তু তাতে কষ্ট পাইবার কি আছে? এতদিন ত তাহার নিকটে এবং তাহা হইতে দূরে, উভয় অবস্থাতেই সুখ—সুখে শান্তি—শান্তিতে আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। আজ কেন এমন হইতেছে, নূতন এমন কি হলো যাতে বানের জলের মত যাতনা বাড়িয়া যাইতেছে।

কমলকুমার বিলাসিনীর চক্ষে নিখুঁত—নির্ম্মল—পরম সুন্দর পুরুষ, সে তাহাতে দোষ দেখে না—দেখিতে পায় না—দেখিতে চায়ও না। তাই তাহার নিজের উপস্থিত যন্ত্রণার কারণ ধরিতে পারিতেছে না। মধ্যাহ্ন সূর্য্য ক্রমে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল। বেলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন চারিদিকে একটা ক্লান্তি ও অবসন্নতার ভাব ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তীক্ষ্ণতেজ মার্ত্তণ্ড যেমন ক্রমে শান্ত—ক্লান্ত—ম্লান; ও তৎপরে যান যান হইয়া আসিতেছেন, বিলাসিনীর হৃদয়াকাশের দুঃখমাখা সুখের আলোটুকুও, কি যেন এক গভীর বিষাদ মেঘের ঘন আবরণে আবৃত হইতেছে বলিয়া, ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর, তাই তাহারও প্রাণটা যেন আনচান্ করিতেছে। এক একবার যেন প্রাণটা বাহিরায় বলিয়াই মনে হই-তেছে। ইচ্ছা একবার কমলকুমারের সঙ্গে দেখা করে, কিন্তু সে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, তাই সেই অনির্দ্দিষ্ট কারণ-

সম্ভূত যাতনার জ্বালা জুড়াইবার মানসে বিলাসিনী উদাস পাদবিক্ষেপে—অলস ভাবে, বজবজের নিবিড় বনময় দুর্গ প্রাচীরের সম্মুখের নদীতীরে অগ্রসর হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী সকল লোকের নিকট গড়ের ঐ বনভূমি কি এক বিষাদমাখা উপকথার ভয়াবহ অবরণে আবৃত যে, কেহ কথনও ভ্রমক্রমে তাহার নিকটস্থ হয় না। বিলাসিনীও অতি শৈশব কাল হইতে ঐ গড়ে নবাবের সৈন্যের সহিত ইংরাজ সৈন্যের যুদ্ধের গল্প শুনিয়াছে, বাঙ্গালার রাজার বিরুদ্ধে বাদসাহের সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহ ও সেই সকল ঘটনা সূত্রে কত শত লোকের প্রাণ নাশের বিবরণ শুনিয়া আসিতেছে, প্রতিদিন ঐ গড়ে সেই সকল মরা মানুষের হাহাকার ও রজনীর নিবিড় অন্ধকারে অসংখ্য ভূত প্রেতের পিপাসার আর্ত্তনাদ শুনার কিম্বদন্তী স্মরণ হইলেই সে দিকে তাকাইতে তাহার সাহস হয় না,তাহার ত্রিসীমানায় পা দিতে প্রাণের নিভৃত কক্ষে ত্রাসের সঞ্চার হয়, সে দিক দিয়া কাহাকেও আসিতে দেখিলে, মানবমূর্ত্তিতে উপদেবতার আবির্ভাব বলিয়া তাহার মনে সংশয় জন্মায়। বিলাসিনীর শৈশব জ্ঞানের সহিত এইরূপ বিবিধ বিচিত্র কল্পনা মিশিয়া আছে বলিয়া, সে ভ্রমক্রমেও কখন সে দিকে, বা সে দিকের নূতন পথে পা দেয় না। আজ চিত্তচাঞ্চল্য নিবন্ধন আত্মবিস্মৃত, তাই অবাধে—নিরুদ্বেগে সেই পথে—বহুবিধ জীব জন্তু, দেবতা উপদেবতার আবাসভূমি গড়ের পথে, অগ্রসর হইল। আত্মহারা বিলাসিনী কি যাতনার তাড়নায় যে অতি সহজে সেই চির অনভ্যস্ত ভয়ঙ্কর পথে অগ্রসর হইল তাহা তাহার বোধাতীত—তাহার ইষ্ট দেবতারও জ্ঞানের অতীত!

যখন বিলাসিনী গড়ের বনভূমি পশ্চাতে রাখিয়া নদী-সৈকতে উপস্থিত হইল, তখন অংশুমালী নিজ রশ্মি-রেখা মাত্র পশ্চাতে রাখিয়া লোকান্তরের নিদ্রাভঙ্গে ব্যাপৃত হইয়াছেন। সুপ্রসারিত গঙ্গার কুলপ্লাবিনী তরঙ্গ-কল্লোল কাতর কণ্ঠে বিদায় সঙ্গীত গাহিতেছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার প্রত্যেক তরঙ্গ-লীলায় যে বিচিত্র শোভা ফুটাইয়া বাহবা দিয়াছে,তাহার লীলার পর্দ্দায় পর্দ্দায় যে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার বিম্বে বিম্বে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষণস্থায়ী সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে,সে চলিয়া গিয়াছে। বিষাদময়ী তরঙ্গিনীর শোক-ভার বৃদ্ধি করিতেই যেন শ্মশান-ভস্মের মধ্য হইতে শেষ অগ্নিকণার ন্যায় লোকলোচনের বিয়োগবার্ত্তার পরিচায়ক অংশু-রেখার আভাস মাত্র দৃষ্টিগোচর

হইতেছে। যেন কে ছিল—চলিয়া গিয়াছে। বিরহবিধুরা—শোকাতুরা কল্লোলিনী নিজ বৈধব্য স্মরণ করিয়া যখন ললাটের সিন্দূরের শেষ রেখা মুছিয়া ফেলিতেছে, তপস্যার চিরসহচরী সর্ব্বরীর অঞ্চলাশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া যখন অনন্ত পারাবারে তনুত্যাগের আয়োজন করিতেছে, তখন সেই বিরহ-বিষাদের মাঝারে—সেই বিদায় সঙ্গীতের মাঝারে—দগ্ধহৃদয়া বিষাদিনী বিলাসিনী বিশ্রাম ভিখারিণী হইয়া শৈল-সুতার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আঁধারে আঁধার—বিরহে বিরহ—হৃদয়ের হাহাকারে হাহাকার মিশিয়া গেল। বিলাসিনী একাকিনী ছিল—এখন সঙ্গিনী জুটিল। বিজ্ঞানপ্রতিপাদিত জড়, ইচ্ছা ও শক্তিসম্পন্ন জীবের সঙ্গী হইবে কি প্রকারে? জড়ের হৃদয়ে কি কখন মানবহৃদয়-পারাবারে উত্থিত শত শত আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে? বিজ্ঞান বলিবে, না পারে না; জ্ঞান বলিবে, অনুভূতি বলিবে,ভুক্তভোগী বলিবে,হাঁ এরূপ হইতে পারে। আজ অশিক্ষিতা গ্রাম্যবালা সাগরাভিগামিনী তটিনী-তটে পদার্পণ করিতে না করিতে বুঝিল,অতি সুন্দর ভাবে অনুভব করিল,যে তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার,নীরবে বসিয়া প্রাণের কথা বলিবার সঙ্গী পাইল; সে হৃদয়ভরা আঁধার—সে সর্ব্বগ্রাসী অভাব—সে দশ-দিক-পরিব্যাপ্ত প্রাণের শূন্যতায় সমবেদনার দৃষ্টিপাত করিবার—দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার সঙ্গী পাইল; তাহার প্রাণের মর্ম্মস্থানের ক্ষত ধুইয়া দিবার লোক পাইল। যে অভাবে পূর্ব্ব দিনের সুধাসিক্ত চন্দ্রালোক হলাহলে পরিণত হইয়াছিল, আজ তাহারই পূরণে তাহার প্রাণ জুড়াইল। তাপে যেমন পোড়ার জ্বালা যায়, তেমনি বেদনায় বেদনা দূর হয়। বিজনে পরিত্যক্তা বিহঙ্গিনীর কাতর কাকলীর ন্যায়, কাতর কল্লোলে নিনাদিত—উচ্ছলিত সলিল রাশির বিষাদ-গীতি বিলাসিনীর প্রাণে সুধা সিঞ্চন করিল—সাদরসম্ভাষণে আসন গ্রহণ করিতে বলিল—নিজের অপার দুঃখের কথা বলিয়া অনাথিনী অতিথির হৃদয়-ভার দূর করিল।

ক্ষণকাল সেই স্রোতস্বিনী-শিয়রে উপবেশন করিয়া সে হৃদয় জুড়াইল, বুঝিল জড়ে জীবন আছে, দয়া মায়া আছে, সমবেদনা আছে, সুখ দিবার শক্তি আছে—ইচ্ছাও আছে; তখন সে তাহার হৃদয়ের জ্বালা,প্রাণের অশান্তির প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল জড়ে যাহা আছে—এই তটিনী-তট যাহা দিতে চাহিতেছে—আমার প্রাণের দেবতা, আমার জীবন সর্ব্বস্ব আমাকে তাহা দিতে

চাহিতেছেন না। "এই অধোগতির প্রশস্ত পথই আমার নিয়তি" বলিয়া আমার স্বর্গ-সুখমাখা আকুলতার মাথায় বজ্রাঘাত করিলেন। বিধাতা তোমার মনে কি এই ছিল? যদি এই হবে, তবে এ হতভাগিনীকে এ জীবনব্যাপী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা অনাথিনীকে 'শাকের ক্ষেত কেন দেখাইলে?' অন্ধ ছিলাম বেশ, চক্ষু ফুটাইলে কেন? সাদা চখে সাদাসিধা জগৎ দেখিতাম বেশ, কিন্তু এ পোড়া চক্ষে কি ছাই রং ঢালিয়া দিলে, এখন প্রাণ যে যায়, যে দিকে তাকাই সেই দিকেই সেই সুন্দর মূর্ত্তি—সেই অনুপম শোভা—সেই মধুর হাসিভরা মুখ! এ কি! এই আঁধারেও সেই! এই কলকলধ্বনি তাঁহারই কণ্ঠস্বরের আভাস দিতেছে!! আমি কি পাগল হইলাম? না সত্যই সকলে মিলিয়া সেই সরল সুজনেরই কথা বলিয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছে?

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গ-দ্বারে।

বজবজের দুর্গ বহু পুরাতন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ মানসিংহ বঙ্গ জয়ের সময়ে বজবজের দুর্গে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সে সময়ে গড় সুরক্ষিত ও বাসোপযোগী ছিল। ইহার পরেও অনেক দিন এই দুর্গের অবস্থা ভালই ছিল। বোধ হয় মুসলমান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইংরাজের প্রভুশক্তির সূত্রপাতে কলিকাতায় নূতন দুর্গ প্রস্তুত হওয়াতে, বজবজের দুর্গ উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ করে, ও পরে একবারে পরিত্যক্ত হয়। সে আজ প্রায় দেড়শত বৎসরের কথা। বিগত দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বের দেড় শত বৎসরে,বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চল জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের লীলাভূমি যশোহর এক্ষণে সুন্দরবনের বনভূমি। সেই বিজন অরণ্যানীর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, কিঞ্চিদ্দূরে, অপেক্ষাকৃত হীনবৃত্তি ও দুর্দ্দশাপন্ন জনগণের বাসস্থানের অনতিদূরে, অধুনা বনভূমিতে পরিণত উপর্য্যুক্ত গড় অবস্থিত। গড়ের বহির্ভাগে যে সকল গৃহাদি ছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায়, কোথাও সামান্য ইষ্টকস্তূপে পরিণত,কোথাও বা,গৃহ বিশেষের ভগ্নাংশের উপর অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ সকলের শ্রীবৃদ্ধিলাভ অতীত শোভা ও গৌরবের চিহ্ন গোপন করিতেছে। গড়ের স্থানে স্থানে প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে, ঐ ভগ্নাংশের মধ্য দিয়া গড়ের ভিতর তাকাইতে ভয় হয়। উন্নত মস্তক বিবিধ বৃক্ষের তলদেশ ঘন নিবিড় লতা-গুল্মে

সমাচ্ছন্ন। দূর হইতে দিবাভাগেও অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। সে স্থানের পত্র পতনে ব্যাঘ্র ভীতি, লতার নৃত্যে সর্প সমাগম কল্পনাই সর্ব্বাগ্রে লোকের মনে উদয় হয়; আর বায়ুবিতাড়িত বৃক্ষে বৃক্ষে আলিঙ্গন, শাখায় শাখায় মিলিত নৃত্য,পাতায় পাতায় প্রীতির আদান প্রদান দেখিলে, মানুষ সহজেই উপদেবতার আবির্ভাব কল্পনায়, দূরে—সুদূরে পলায়ন করে।

নির্ভীকহৃদয় কমলকুমার এই সকল উপদেবতা ও উপদ্রবের উপকথা শুনিয়াও কখন ভীত হয় নাই। অবসর পাইলেই সেই পরিত্যক্ত বনভূমি পরিবেষ্টিত গড়ের নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিত। সেখানকার সমস্তই তাহার জানা ছিল। আজ দারুণ আঘাতে আহত হইয়া, পুরন্দরের বিষময় টিট্‌কিরি অসহ্য বোধ হওয়াতে,পালমহাশয় ও রসিক ঘোষের নিষেধ সত্বেও সে পুরন্দরের বাসা ত্যাগ করিল। যখন সে, বাসা ত্যাগ করিয়া পথে পদার্পণ করিল, তখন রাত্রি দশটা। অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। কোথায় যাইবে স্থিরতা নাই। কিন্তু তাহার মনে, গড়ের নিকটস্থ এক পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহের কথা, অলক্ষিত ভাবে. উদয় হইয়াছে। সেই গৃহে রাত্রিযাপন মানসে গড়ের দিকে অগ্রসর হইল। অনেকটা পথ। তাহাতে আহত, ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতসিক্ত চরণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে অনেক সময় লাগিল। পথেই চন্দ্রোদয় হইল। বহু কষ্টে—বহুক্ষণে, সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া সেই ভগ্ন গৃহের সমীপে উপস্থিত হইল, কিন্তু ভগ্নদ্বারে সে গৃহে রাত্রিকালে প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছে না। কিন্তু আর দাঁড়াইতেও পারিতেছে না। পতনে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তাহার উপর এত পথ চলায় ক্ষতস্থান হইতে প্রবলবেগে শোণিত নির্গত হইতেছে। শোণিতের প্রবল ধারা দেখিয়া তাহার বোধ হইতেছে, একটা শিরা, হয় গুরুতররূপে আঘাতিত, না হয়, সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—শরীরও ক্রমে অবশ হইয়া আসিতেছে। নিরুপায় হইয়া, ভাগ্যে ভর দিয়া, যুবক সেই মুক্তদ্বারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রাণ ভয়ে পলায়ন-পর দুএকটী ক্ষুদ্র জীবের সঞ্চারণ শব্দে কমলকুমারের প্রাণে ভয় হইল, কিন্তু আর ভাবিবার বা সাবধান হইবার অবসর নাই। কত জীবের মলমূত্রপূর্ণ সেই অপরিষ্কার গৃহতলে উপবেশন ও ক্রমে শয়ন করিতে বাধ্য হইল। ক্লান্তি-কাতর কণ্ঠস্বরে সে নিস্তব্ধ বনখণ্ড ধীরে ধীরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিক্ষিপ্ত দুইখানি ইষ্টক বহুকষ্টে একত্র করিয়া তদুপরি মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল। শয়ন করিয়া স্থির চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিল "এই শুইলাম,মরিব সেও ভাল, তবুও আর পুরন্দরের অনুগ্রহভাজন হইব না—এ নির্জ্জন বনে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মরিব, সংসার হইতে মুছিয়া যাইব—ঘৃণিত অধমদের কৃপাপাত্র হইয়া থাকা অপেক্ষা. আমার চিহ্নমাত্র থাকিবেনা, সেও ভাল, শতগুণে—সহস্রগুণে ভাল। ভগবান! দয়া করিয়া আমাকে গ্রহণ কর, আমি আর আমার এ সাধের পৃথিবীতে বাস করিতে চাই না।" বলিতে বলিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। নিজ কর্ম্মদোষ স্মরণ হেতু তাহার অনুতাপমাখা কাতর বিলাপধ্বনি যখন রজনীর স্নিগ্ধ সমীরের মৃদু হিল্লোলে মিশিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার শেষ শব্দকণা একজনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সে কে? সে পাগলিনী বিলাসিনী। যে, আজ জল কল্লোলে, বায়ু হিল্লোলে কমলকুমারের কণ্ঠস্বর কল্পনা করিয়াছে, তাহার কর্ণে কি সেই স্বরের ইঙ্গিতানুভূতির ভুল হইতে পারে? ভয়ে ও সন্দেহে বিলাসিনী বৃক্ষবৎ স্থির—তাহার মনে হইল "আমি কোথায়? এ যে গড়ের মাঠ, এ যে ভূতের আড্ডা, আমিই বা এখানে কেন? আর আমার হৃদয় দেবতার কাতর কণ্ঠস্বর এত রাত্রিতে এখানে কেন শুনিব?" কি করিবে, ক্ষণকাল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই লোকালয়ের গন্ধ পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন—"লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে, কি প্রাণের মমতা ছাড়িয়া, শব্দ সঙ্কেতে অগ্রসর হইয়া দেখিবে?" ঐ যে আবার—"হা ভগবান" সেই স্বর—সেই শব্দ বলিয়াই ত বোধ হয়। সে দিশাহারা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল"মা গো—কি করবো,কোথায় যাবো গা? মরি আর বাঁচি,ভাগ্যে যা থাকে এগ্‌য়ে দেখি।" এমন সময়ে পশ্চাতে দূরে শুনিল "মা তুই কোথায়? আমি যে তোকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে পড়িছি।" বিলাসিনী পশ্চাতে লোকালয়ের দিকে, জননীর কণ্ঠস্বর,আর সম্মুখে—গড়ের দ্বারে—ভগ্নগৃহে কমলকুমারের কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিজেকে উপদেবতা পরিবেষ্টিত বলিয়াই স্থির করিল এবং ভয়ে বিহ্বল হইয়া অজ্ঞাতসারে "আমি এখানে" বলিতে বলিতে বৃক্ষতলে পতিত হইল, আর তাহার কোন জ্ঞানই রহিল না।

বিলাসিনীর বৃদ্ধা জননী কন্যার কথা শুনিয়া ও পতন-শব্দ ধরিয়া,ভয়ে ভয়ে

প্রাণের দায়ে, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। বহুকষ্টে যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কন্যা ভূ-শয্যায় শায়িত ও সংজ্ঞাবিরহিত। কিন্তু সে অবস্থায় কন্যাকে ফেলিয়া আর কোথাও যাইতে পারে না। বৃদ্ধা সেইখানেই বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল—অঞ্চলে মুখখানি মুছাইয়া দিয়া,অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল। ক্ষণকালের যৎসামান্য শুশ্রূষাতেই কন্যার চেতনা হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জননীর ক্রোড়ে শায়িত দেখিয়া বলিল "মা আমরা এ কোথায় ?" মা, সহস্র বিরক্ত হইলেও, কন্যাকে তখন কিছুই বলিল না। নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া বলিল "মা তুমি আমার কোলে শুয়ে আছ।" তখন মেয়ের সাহস হইল,বলিল "মা সন্ধ্যাবেলা শরীর মন দুই খুব খারাপ বোধ হ'লো ব'লে, গঙ্গার ধারে যে দিক্‌টায় ভয়ে কেউ যায় না—যেখানটায় কেউ বসে না, সেইখান্‌টায় গিয়ে বসেছিলুম। তার পর অন্ধকারে আর পথ খুঁজে না পেয়ে অনেক ঘুরিছি। কোথা দিয়ে গিয়েছিলুম, আর কোন্ পথে ফিরবো, কিছুই ঠিক করতে না পেরে অনেকক্ষণ সেই নদীর কিনারায় বসে রইলুম। শেষে বড় ভয় হলো, তাই পালাতে গিয়ে এইখানে এসে পড়িছি। এখানে এসে পথ ঠিক পেয়ে বাড়ী যাবো এমন সময়ে ————"

মা। (সভয়ে) এমন সময়ে কি ?

বি। কি যেন কি একটা—ঐ শোন—শোন ("হায়! কত পাপ করিছি") ও কার গলার স্বর !

মা। এইখানে একটা বেহ্মদত্তি আছে,সেইটা মাঝে মাঝে ঐ রকম করে। তুই উঠ্‌তে পার্‌বি ? চল্ দেখি শিগ্‌গির উঠে বাড়ী যাই। এসব জায়গা ভাল নয়। ওঠ্—ওঠ্—শিগ্‌গির ওঠ্। সর্ব্বনাশী আজ কি বিপদেই ফেল্লি। ওঠ্—ওঠ্।

বি। মা, ও যেন মানুষের গলার স্বর বলে বোধ হয় না ?

মা। মানুষের মত হবে নাত কি গরুর মত হবে ? বামন মরে বেহ্মদত্তি হয়। তুই চল্।

বি। না মা—ও যেন——

মা। ও যেন কি ?

বি। ও যেন কোন জানা লোকের গলার স্বর বলিয়া বোধ হয়।

মা। তোর যেমন কথা। এই রাত্তিরে, এ বনে, জানা লোকের গলার শব্দ কোথা থেকে আস্‌বে?

বি। কি জানি? আমার মনে হচ্চে যেন——

মা। যেন কে?

বি। সেই যে লোকটী—কাল——

মা। (আরও বিরক্ত হইয়া) তোর মুণ্ডপাত হয়েছে,তা নাহলে, যে মেয়ে সন্ধ্যের পর ঘরের বাহির হয় না,ভয়ে জড়সড়,সে আজ সমস্ত রাত্তির গড়ের বনে, নদীর ধারে বসে থাকৃতে সাহস করে! তুই কি সত্যি সত্যিই পাগল হলি? তোকে নিয়ে আমি কি করবো বল দেখি? বিলাসিনীকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মা বলিল, এখন ওঠ্ চল্ বাড়ী যাই। আর এমন করে এখানে বসে থেকে কি হবে?

বিলাসিনী জননীর আদেশমত উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতে, আবার সেই কণ্ঠস্বর! কি বলে শুনিবার জন্ত বিলাসিনী দাঁড়াইল, ভয়ে অভিভূত জননীও কন্যার খাতিরে দাঁড়াইল। উভয়েই শুনিল, "রাম রাম, এমন নরাধমের হাতে পড়েছি। নারায়ণ! এ বিপদে রক্ষা কর।" এইবার বিলাসিনীর একটু সাহস বাড়িল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা! ভূতে কি রাম নাম করে?" এইবার মায়ের চমক্ ভাঙ্গিল। বুদ্ধিমতী জননী বলিল, "শুনিছি ভূতে রাম নাম করে না—রাম নামে ভূত পালায়।" মেয়ে বলিল, তাহলে এ শব্দ ভূতের কেমন করে হবে?

মা একটু থতমত খাইয়া বলিল, "হোক, না হয় মানুষেরই গলার স্বর, তাই বলে কি ঐদিকে ঐ বাঘ ভাল্লুকের মুখে যেতে হবে নাকি?" এই বলিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। মেয়ে নিরুত্তরে মায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মা সহসা দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল "তুই কি ঐ ভাঙ্গা ঘরে গিয়ে একবার দেখে আস্‌তে চাস্? তবে চল্।" কন্যা নিরুত্তরে জননীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। তখন পরীক্ষা করিলে, দেখা যাইত, বিলাসিনীর বুকের ভিতর 'ধড়াস্ ধড়াস্' করিতেছিল। স্থানটা সর্ব্বপ্রকারে বিপদবেষ্টিত হইলেও সেখানে তাহার বর্ত্তমান জীবনের সুখ ও শান্তির অবলম্বনটুকু বিপদে পতিত বলিয়া তাহার বিশ্বাস। তাই জননীর এই অনুগ্রহ প্রদর্শনে,তাহার

প্রাণে এক দিকে ভয়,অন্য দিকে আনন্দ—এক দিকে সে ভয়ে জড়সড়,অন্য দিকে উৎসাহে অগ্রসর। দীপশিখার আলোক-স্তম্ভের মধ্যে লুক্কাইত অর্দ্ধদগ্ধ কৃষ্ণাভ বর্ত্তিকার ন্যায়, তাহার প্রাণের ভিতর এই ভয়ে পশ্চাৎপদ ও উৎসাহে অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তির মাঝখানে সংশয়-অন্ধকার লুকাইয়া উঁকি মারিতেছে। অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস ভয়ের স্থান অধিকার করিল—প্রবল আগ্রহে অগ্রসর হওয়ার পরিচালক আনন্দ ক্রমে সংশয়ের ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। এখন কেহ বিলাসিনীকে দেখিলে, দেখিত, সেই কুসংস্কারাপন্না গ্রাম্য যুবতীর মুখে সাহস ও সংশয়ে সংগ্রাম চলিয়াছে। "প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে যাচ্চি, পাবো ত?" ইহাই তাহার ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে। আরও অগ্রসর হইয়া দেখে, সেই ভগ্নগৃহের চারিপার্শ্বে ইষ্টকস্তূপ, মা অগ্রে, মেয়ে পশ্চাতে, ধীরে—ধীরে গৃহের নিকটে উপস্থিত হইল। মা কন্যাকে লইয়া পশ্চিমদিকের ইষ্টক-রাশির উপর উঠিয়া, চুপে চুপে বলিল, "দ্যাখ্‌ দেখি, ঘরে কেউ আছে কি না?" বিলাসিনী বলিল "ছাতের ফাঁক দিয়ে ঘরে চাঁদের আলো পড়েছে, তাতে একটা মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো?" মা বলিল "কর্‌।"

এমন সময়ে ঘরের ভিতর হইতে আবার পূর্ব্ববৎ কাতর স্বরে "ভগবান্‌! এতই কি অপরাধ করিছি! আমাকে একবারে ত্যাগ কর্‌লে?" বিলাসিনী বলিল, "তারই গলা! চল আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে দেখি, আর এখান থেকে চেঁচ্‌য়ে ডাকাডাকির দরকার নেই। ঘরে যখন মানুষ আছে তখন আর অন্য ভয় নেই।" মা বলিল "তবে চল্‌।"

নিতান্ত ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়াও কন্যাগতপ্রাণা জননী, কন্যার সকল দৌরাত্ম্যই সহ্য করিয়া থাকে। মায়ের সেই দুর্ব্বলতার ফলে, আজ রাত্রি আড়াই প্রহরের সময়ে মা ও মেয়েতে মিলিত হ'য়ে গড়ের বনবেষ্টিত ঐ ভগ্ন গৃহে আসিয়া উপস্থিত। মা মেয়েকে চুপে চুপে বলিল "তুই এইখানে দাঁড়া, আমি যাই, গিয়ে দেখে আসি, সত্যিই মানুষ কি না, তার পর তোকে নিয়ে যাব।" মেয়ে বলিল "তা হবে না, যদি মানুষ নাই হয়, আর তুমি যদি নাই ফের—তাহ'লে—না মা, তা হবে না। মরি দুজনেই একবারে মরবো, তোমাকে একা ছেড়ে দেবো না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।" মা বলিল "চল্‌।"

মা ও মেয়েতে গৃহদ্বার অতিক্রম করিতে না করিতে, ভিতরে একটা বিকট শব্দ হইল। মানসিক ও শারীরিক বিবিধ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত ব্যক্তির জীবনের শেষ আর্ত্তনাদের ন্যায়, একটা মর্ম্মভেদী চিৎকার শুনিয়া বিলাসিনী ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পরক্ষণেই সাহসে ভর করিয়া মাকে বলিল, "মা, সেই লোকই বটে। ভয় পে'ও না, এস" বলিয়া বিলাসিনী অগ্রসর হইয়া সেই আবর্জ্জনা রাশির উপর উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্টক উপাধান হইতে কমলকুমারের মাথা নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। তুলিয়া লইতে কমলকুমারের মুখখানি ছাদের ছিদ্র-প্রবিষ্ট চন্দ্রালোকে আলোকিত হইল। বিলাসিনী আত্মহারা হইয়া একটীবার সে মুখখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া বলিল, "মা দেখ—দেখ, চখের জলে সব ভিজে গেছে। ওমা একি! এ সমস্ত কাপড় যে ভিজে, এত কি চখের জল?" বিলাসিনীর মা তখন কমলকুমারকে ধরিয়া আলোয় সরাইয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধা একটীবার ক্ষীণদৃষ্টিতে কমলকুমারের মুখের দিকে তাকাইল—সঙ্গে সঙ্গে স্নেহেরও সঞ্চার হইল। পায়ে হাত দিয়া ধরিতে, বাম পা খানির সমস্তই কেমন ভিজে, ভিজে আঠার মত কি হাতে লাগাতে ভয় হইল, বৃদ্ধা বলিল, "কেমন কেমন বোধ হচ্ছে," আলোয় সরাইয়া দেখে বাম হাঁটু হইতে উপরে ও নীচে অনেক দূর খুব ফুলিয়াছে। আর চারিদিক ভিজে দেখে মেয়েকে বলিল "দেখ্ দেখি এ কি?" মেয়ে বলিল "সর্ব্বনাশ এ যে রক্ত—এই এত রক্ত—তবে কি কিছুতে ধরে এনে এখানে ফেলে রেখে গেছে? কি ভয়ানক! কাপড়ের অর্দ্ধেক যে রক্তে ভিজে গেছে!" মা ও মেয়েতে যখন কমলকুমারের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলা কওয়া করিতেছে, তাহার পূর্ব্বে কমলকুমার বহু শোণিত পাতে, দুর্ব্বল ও অবশ হইয়া পড়ে, তাই আপনা আপনি তাহার মুখে কাতরোক্তি বাহির হইতেছিল, এবং উভয়ের গৃহ প্রবেশে হিংস্র জন্তু সমাগম কল্পনায় সে, প্রাণভয়ে বিকট চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে, চৈতন্যবিরহিত জড়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। দিনের আলোকে দেখিলে বোধ হইত মৃত্যুর লক্ষণই যেন বিদ্যমান।

বিলাসিনী রাত্রি জাগরণ ও অনাহারে বনভ্রমণ ক্লেশ ভুলিয়া গেল। দুঃখিনী নিজ অঞ্চলে কমলকুমারের অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছাইয়া দিল। মৃদু—স্নিগ্ধ—ক্ষীণ চন্দ্রালোকে পলকরহিত দৃষ্টিতে বিলাসিনী সেই মুদ্রিত নেত্র ও অশ্রু-সিক্ত মুখ-

খানি দেখিতে লাগিল—দেখিয়া তার আর সাধ মিটে না, দেখিতে দেখিতে স্থান সময়, দুঃখ ক্লেশ, সর্ব্বোপরি জননীর উপস্থিতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। সুখে—পরম সুখে কমলকুমারের দীর্ঘ দেহের যতটা সম্ভব নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া বসিয়া রহিল। এই বিপদের দিনে, তাহার দেবতার সেবিকারূপে নিকটে বসিতে পাইয়াছে, ইহাতেই সুখ—পরম সুখ—পরম তৃপ্তি—নিজের হৃদয়ের ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছে। জননী কতবার কত কি জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহার উত্তর পায় নাই। উত্তর না পাইয়া মাও আর কিছু বলে নাই। বৃদ্ধা অনেক ঔষধ পত্র জানে। কিন্তু রাত্রিতে ত আর কোন উপায় হইবে না, কাজেই রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ সমানে সেইখানে বসিয়া কাটাইল। সেইখানে বসিয়া কমলকুমারের পরিধেয়ের কিয়-দংশ দিয়া যথাসম্ভব সেই ক্ষত স্থান আস্তে আস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিল। প্রভাতের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া, ঔষধের জন্য বিলাসিনীর মা, কন্যাকে ক্ষণকালের জন্য রাখিয়া চলিয়া গেল। এইভাবে দুঃখিনী বিলাসিনীর বিপদ-পূর্ণ বিষাদময়ী যামিনী সুখের সুপ্রভাতে পরিণত হইল। সুখের সুপ্রভাতই বটে, কারণ পশ্চিমদিকের ভগ্ন বাতায়ন পথে-প্রবিষ্ট ক্ষীণ জ্যোৎস্না গা ঢাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ব্বদিকের ভগ্নদ্বারে প্রবিষ্ট ঊষার আলোক কমলকুমারের মুদ্রিত নেত্র ফুটাইল। কমলকুমার বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে বিলাসিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া—তাকাইয়া—তাকাইয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল "একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না সত্য সত্যই তোমার কোলে আমার মাথা রহিয়াছে?" বহুদূরে আকাশ-প্রান্তে লম্বমান ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের অন্তরালে লুক্কাইত ক্ষীণাভ ক্ষণপ্রভার ইঙ্গিতসম হাসি-বিন্দুতে অধর-প্রান্ত ঈষৎ ফুটাইয়া একটীবার বিলাসিনী তাকাইল—কিন্তু কিছুই বলিল না। তখন কমলকুমার আবার বলিল—এ বিজন বনে—মানুষের অগম্য এ পথে—তুমি কি করে এলে? আর কেমন করেই বা জান্‌লে যে আমি এখানে আছি? বিলাসিনী বলিল "সেই রাত্রি হইতে যন্ত্রণায় ছট ফট কর্‌তেছিলুম, তাই বিধাতা দয়া করে কাল রাত্রিতে এই পথে আমাকে এনেছিলেন।"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন কুটীরে।

বিলাসিনী বলিল "তোমার এমন দশা কে কর্‌লে?" কমলকুমার বলিল, "আমি নিজেই করেছি।" বিলাসিনী বলিল "কেন?" কমলকুমার বলিল "আমিও সেই যে চলে গেলুম, তারপর থেকে এ পর্য্যন্ত যে কিভাবে কেটেছে, তা বুঝাইবার নহে।" যারপর যা ঘটে ছিল, কমলকুমার সমস্ত বলিয়া শেষে যখন রক্তাক্ত কলেবরে ঐ ঘরে আসিয়া শয়ন করিবার আয়োজন বর্ণন করিতে লাগিল, তখন বিলাসিনী চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, "এমন বিপদে পড়ে, এত কষ্ট পেয়েও কি আমাদের বাড়ীতে যেতে, কি সংবাদ দিতে ইচ্ছা হ'লো না? তবে আর আমার উপর তোমার অনুগ্রহ কোথায়?"

ক। এরূপ অবস্থায় তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে—তোমার মাকে বিপন্ন ও বিব্রত করা ভাল মনে করি নাই।

বি। বিপন্ন ও বিব্রত কম কর্‌লে কি? এই বনেও ত আস্‌তে হ'লো!

ক। এলে কেন? তোমাকে ত কেউ পায় ধ'রে আনে নি? আমি ত মর্‌বো বলে এখানে এসিছি।

বি। পোড়া কপাল আমার! আমি কি তাই বল্লুম? আমার কথার এর চেয়ে ভাল অর্থ বুঝি হ'লো না? আমি বল্‌ছিলুম এই যে, তুমি এমন অবস্থায় যেখানে পড়ে থাক্‌বে, আমাকে সেইখানেই যেতে হবে—তোমার জন্ত

জল ও জঙ্গল বিচার থাকবে না—তুমি যেখানে থাকবে, সেখানে যেতে মরবার ভয়ও করি না।

ক। আমার আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। অনাহারে ও এইরূপ অত্যাচারে জীবনটা শেষ করবো ব'লেই এই বনে—এই ঘরে এসে পড়িছি। ইচ্ছা,আর উঠ্‌বো না। তুমি চলে যাও—এখানে থেকো না।

বি। (বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিয়া) তুমি আমার প্রতি এতটাই বিরূপ জেনেও, বিধাতা কেন যে তোমাকে আমার জীবনসর্ব্বস্ব করিলেন—বুঝি না। তুমি আমাকে চাও না, তবুও কেন যে আমি তোমাকে জীবনের দেবতা করিলাম, জানি না।

ক। তুমি দুঃখিনী, আরও দুঃখ পাবে ব'লেই এই দশা। আমি অনেক পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছিলুম "আমি তোমার পক্ষে———।"

বি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা আমার মনে আছে। তা জেনেও যখন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি—তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করেছি—তখন তাহার ফলে আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটুক। আমি অবাধে তাহাই সহ্য করিব।

ক। সত্য সত্য বলতো, এ বনে এ রাত্রিতে কেমন করে আমাকে খুঁজে বাহির করলে—আর কেনই বা খুঁজতে এলে?

বি। আমি সব বলবো, আগে তুমি বল, যে, আমার অনুরোধ রাখ্‌বে?

ক। (বুঝিতে পারিলেও বলিল) কি বল, আগে শুনি, তারপর বুঝিয়া উত্তর দিব।

বি। না—তুমি আগে বল, কথা রাখ্‌বে?

ক। তুমি ত জান, আমি একগুঁয়ে লোক। ঝোঁক না হ'লে কোন কাজই করি না। আর যদি কোন কাজে ঝোঁক হয়, তবে পৃথিবীর সমস্ত লোকে বাধা দিলেও তা করিতে পারি—ভয় পাই না—গোপনও করি না। তাই বলি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লাভ কি? আগে কথাটা বল।

বি। এ অবস্থায় এখানে আশা ভাল হয় নাই, আর থাকাও ভাল নয়।

ক। কোথায় যাব?

বি। আমাদের বাড়ীতে চল। কোন অসুবিধা হবে না। মা তোমাকে খুব যত্ন করবেন। অত রাত্রিতে খুঁজে খুঁজে এখানে এসে এই ঘরে তোমার

সেবা করেছেন, আর চক্ষের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তোমার বিষয়ে কত কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। যেন কত কালের পরিচিত আপনার জনের ন্যায় তোমায় যত্ন করিতে লাগিলেন। আমার ঘরে চল।

মা ও মেয়ের এইরূপ অনুগ্রহ ও স্নেহমমতার প্রবল নিদর্শন সকল অলক্ষিত ভাবে কমলকুমারের মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল। এখন বিলাসিনীর কথায়, কমলকুমারের বাহিরের দৃঢ়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কমলকুমার অজস্র-ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল—বিলাসিনী তাহার অর্দ্ধসিক্ত অঞ্চলে অতি যত্নে—অতি আদরে কমলকুমারের মুখ মুছাইয়া দিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আমার জন্ম সার্থক হয়েছে। বড় হ'য়ে ভাব্‌তুম এম্‌নি করে আদর করে—আমার আপনারজনকে আমার কোলে শোয়াইয়া—এম্‌নি করে আদর করে, আমার সেই কল্পনায় গড়া চাঁদমুখ মুছাইয়া দিয়া—এম্‌নি করে পলকহীন চ'খে তাকৃয়ে থাক্‌বো। আমার সে সাধ মিটেছে। এ জীবনে আর কিছু সুখ হয়, ভালই, না হয়, এই সুখটুকু স্মরণ করিয়া জীবন যাপন করিব। আজ যদি সত্যি সত্যিই তোমার একটা ভাল মন্দ হয়, আমি আমাকে বিধবা মনে করিয়া, জীবনব্যাপী শত দুঃখের ভিতরেও—সুখে—পরম সুখে, বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিব।"

কমলকুমার দেখিল এই পল্লীগ্রামবাসিনী কুসংস্কারাপন্না যুবতী সামান্য লোক নহে। রেণু পরিমাণ ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশালদেহ বটবৃক্ষের বৃদ্ধির ন্যায় ঐ ক্ষুদ্রকায়া শ্যামাঙ্গী রমণী-হৃদয়ের প্রেমের অঙ্কুর, স্নেহের জলসিঞ্চনে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে—সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষের নবপল্লবিত কোমল শাখা, পর্ণকুটীর হইতে প্রসারিত হইয়া গড়ের বনভূমি অধিকার করিয়াছে—শ্রান্ত বিপন্ন পথিককে ক্রোড়ে স্থান দিয়া সুদুর্ল্লভ প্রেমপাশে বাঁধিয়াছে,তাই কমলকুমার অবাক হইয়া ক্ষণকাল বিলাসিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া—তাকাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "এ জীবন দান করিলেও তোমার ঋণের পরিশোধ হইবে না। আমাকে নিয়ে তোমার যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু যদি বাঁচি দয়া করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহায়তা করিও।" বিলাসিনীর হরিষে বিষাদ ঘটিল। কথার পূর্ব্বভাগে আত্মসমর্পণে ও শেষভাগে আত্মরক্ষার আব্‌দারে হৃদয়টা আনন্দে উথলিয়া উঠিতে না উঠিতে,দমিয়া গেল! দুঃখে ও অভিমানে চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া অশ্রুধারা

প্রবাহিত হইল। খুব খানিকটা কাঁদিয়া শেষে কমলকুমারের সাধ্য সাধনা ও পীড়াপীড়িতে শান্ত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এই অবস্থায় এই খানেই থাক্‌বে না আমাদের ঘরে যাবে? তোমার ইচ্ছা হ'লে তুমি এইখানেই থাক্‌তে পার, আমি এই ঘর পরিষ্কার করিয়া এইখানেই খাট বিছানা আনিয়া তোমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে এবং প্রতিদিন দুই বেলা দাসীর ন্যায় তোমার সমস্ত কাজ করিয়া দিতে সম্মত আছি। আমি করিব—আমার মাও করিবেন। ইচ্ছা হয় এইখানে থাক, আর ইচ্ছা হয়—দয়া হয়, আমাদের ঘরে চল। আমি আর তোমার উপর আব্‌দার চালাব না—দৌরাত্ম্য কর্‌ব না—আমাকে যাহা হুকুম কর্‌বে, মাইনেকরা চাক্‌রাণীর মত সব কর্‌বো—তাতেও আমার সুখ আছে। কেবল দয়া করে চিরজীবনধরে সেইটুকু কর্‌তে দিলেই ধন্য হইব—বাঁচিয়া যাইব। আর যদি নিকটে থাক্‌তে পাই, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার সহায়তা কর্‌তে চেষ্টা করে, সংসারের কাছে পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিতে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌বো।

ক। আমি ত বলেছি, আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আমাকে যেখানে যে অবস্থায় ইচ্ছা লইয়া রাখ, আমার আপত্তি নাই।

বি। তবে মা আসিলে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে বলি?

ক। বল। কিন্তু একটা কথা আছে। আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলে অনেকে অনেক কথা বলিবে। বিনা অপরাধে কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া কি লাভ?

বি। তা বলে বলুক। সকল কাজেরই ভাল মন্দ দুদিক আছে। তোমাকে বাড়ী না নিয়ে গিয়ে এখানে রেখে, সেবা শুশ্রূষা করিলেও ত আমার দুর্ণাম রটিবে। তুলনায় ঘরে যাওয়াই ভাল ও নিরাপদ।

কমলকুমার বহুক্ষণ ধরিয়া বিলাসিনীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাহার সেবায় ও প্রিয়প্রসঙ্গে শরীরের গ্লানি ও মনের ক্লেশ অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছে, তাই একটু রঙ্গরসের সুরে—প্রীতির ইঙ্গিতে নয়ন-প্রান্তর উজ্জ্বল করিয়া—অধর-ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত করিয়া বলিল "সে কি! জাতও যাবে, পেটও ভর্‌বে না; সংসারের কাছে পাষাণীর পরিচয়ও দিবে, আবার কলঙ্কিনী নামও কিনিবে? এটা ত ভাই বুদ্ধির কাজ নয়। আমার জন্য তুমি সবই করিতে পার—আর এ অবস্থায় তোমার জন্য আমার কি কিছুই করিবার নাই?"

বি। "অবস্থার বেলায় ব্যবস্থা নাই"। কিছু করিবার থাকে, পরে করিও। আমি দুঃখিনী ভিখারিণী, এখন তোমার দাসীপনা করি, যদি কখনও বড় লোক হও, আমাকে মাহিনা হিসাবে কিছু টাকা ধরিয়া দিও, তা হ'লেই শোধ যাবে। বলিতে বলিতে বিলাসিনীর নয়ন-প্রান্ত সিক্ত হইল।

এমন সময়ে বিলাসিনীর মা, কমলকুমারের জন্য বেশ সুন্দর পরিষ্কার কাপড়, ক্ষতস্থান ও তাহার চারিদিক ধৌত করিবার জন্য জল, ধৌত করিয়া শোণিত-পাত নিবারণের ঔষধ এবং অন্যান্য আহত ও বেদনাযুক্ত স্থানের যন্ত্রণা ও ফুলা নিবারণের উপযোগী ঔষধ এবং কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। গরিব ও সামান্য ঘরের মেয়ে হইলেও, বৃদ্ধা সংসারের অনেক দেখিয়াছে, অনেক জানা শোনা আছে, লোকও খুব গোছাল ও নিপুণা, তাই একবারে এত গুলি জিনিস যোগাড় করিয়া লইয়া আসিল। বৃদ্ধাকে আসিতে দেখিয়া কমলকুমার অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। বিলাসিনী উঠিয়া অগ্রসর হইয়া মায়ের হাত হইতে এক একটা করিয়া কতক দ্রব্য নামাইল। কমলকুমার বৃদ্ধাকে কখন দেখে নাই, বৃদ্ধাও তাহাকে কখনও দেখে নাই এই প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাৎ বলিয়া কমলকুমার একটু জড়সড় হইলেও, বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া কমলকুমারের চিবুক ধারণপূর্ব্বক বলিল "এই যে আমার বাবা উঠে বসেছে।" কমলকুমার বিস্ময়ে অভিভূত হইল, মনে হইল তাহার মা যেন পরলোকের আবরণ ভেদ করিয়া পুত্রের পরিচর্য্যার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে কমলকুমার বিস্মৃতপ্রায় মাতৃকণ্ঠস্বর অনুভব করিয়া অবাক হইয়া ক্ষণকাল বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া—তাকাইয়া বলিল "আমার মা গিয়ে অবধি এমন মিষ্ট কথা ত শুনি নাই।" তুমি কি এর (বিলাসিনীকে দেখাইয়া) মা, না তুমি আমার মা? বৃদ্ধা বলিল "আমি তোমারও মা, ওরও মা।" বিলাসিনী কেমন থতমত খেয়ে এতক্ষণ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মায়ের ব্যবহার দেখিয়া ভাবিতেছিল "হায়! আমার এমন মা, এমন মা যার আছে, তার আবার অভাব কি, আর তার ভাবনাই বা কি?" এমন সময়ে বৃদ্ধা মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল "দাঁড়্য়ে দেখ্‌ছিস্ কি? এই জল নিয়ে, মুখ ধুইয়ে দে, নিজে মুখ ধো, এই খাবার এনিছি, আগে আমার বাবাকে খাইয়ে দে, তারপর নিজে খা। আমি ততক্ষণ পা ধুয়ে ওষুধ দিয়ে পা বেঁধে দিই।"

মা। (ঔষধ দিতে দিতে বলিল) বাবা এমন কাজ কি করে? এই বনে বাঘের মুখে,অত রাত্তিরে কোন্ সাহসে এলে? আর কেনই বা এলে? সংসারে তোমার আর কেউ নেই, তুমি বাঁচলে, বাপের নাম থাক্‌বে, এমন কাজ কি কর্‌তে আছে বাবা?

ক। (নিজের দুর্দ্দশার প্রতি কটাক্ষ করিয়া) এমন অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। এখানে মরতেই এসেছিলুম। তোমরা মায়ে ঝিয়ে আমার মরণে বাদ সাধ্‌লে।

মা। ছি—ছি! বেটাছেলে, আজ অবস্থা খারাপ, কাল আবার ভাল হবে। তুমি ত আর মেয়েছেলে নও, যে চিরদিন আমার এই মাটির ভাঁড়ের মত মাটি হয়ে থাক্‌বে। দুদিন পরে তোমার ভাল হবে—তুমি রাজা হবে।

ক। আর ভাল হয়েছে। "যে মূলো বাড়ে, তার পত্তনেই চেনা যায়।" আমার যা হবে, এই বয়সে, এখানকার কল বাড়ীতেই তার সূত্রপাত।

মা। না বাবা, দুঃখ করোনা, ভাল হবে—ভাল হবে। এখন কি কর্‌বো বলো দেখি? এ অবস্থায় এখানে কোন মতেই থাকা উচিত নয়। এ বনের মধ্যে প্রাণের ভয়, দিনে রেতে সমান, তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাই?

ক। আমি ওকে তাই বলিছি, কিন্তু তাও কি ভাল? লোকে ত মন্দ বল্‌বে?

মা। উপায় কি? এখানে ছুটাছুটী করাও ত দোষের কাজ,তার পর নানা রকমে ভয়েরও কথা। সব দিক দেখিলে আমাদের বাড়ীই ভাল।

ক। আমি ওকে আপনার জন মনে করি, অত্যন্ত ভালও বাসি, সুতরাং যাতে ওর প্রতি লোকে অকারণ দোষারোপ কর্‌তে পারে, আমার সে বিষয়ে ত সাবধান হওয়া উচিত? আমার কি, আমি পুরুষমানুষ আজ যদি লোকে মন্দ বলে, কাল আবার ভাল হ'লে লোকে ভাল বল্‌বে, কিন্তু মেয়েমানুষের ত আর তা হয়'না।

মা। বা! বাবা ত আমার বেশ ছেলে। তাহলে এখন উপায়? কি কর্‌বো বল?

ক। বাড়ীর কাছে, পড়া ঘর কি বাড়ী নেই? যেখানে ২।১০ দিন থেকে আরাম হয়ে উঠ্‌তে পারি?

বি। মা! এখান থেকে বাড়ী যেতে পথের ধারেই ত একখানা ঘর পড়ে আছে। সে দিকে বড় কেউ আসেও না। আর আমাদেরও কাছে হবে। সেই ঘরে কি থাক্‌বার যোগাড় করা যায়?

মা। ঠিক বলেছিস্। তুই আর একটু এইখানে বস্ আমি আর একবার গিয়ে দেখে আসি।

বি। সে ঘর বেশ ভাল আছে, দেখ্‌তে হবে না। আমি বরং আগে গিয়ে সেই ঘর পরিষ্কার করে বিছানা করিগে, তুমি আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে এস। কিন্তু সাবধান। পা নাড়্‌তে চাড়্‌তে রক্ত না বেরোয়। পা খুব ফুলেওছে। ঐ পা নিয়ে খুব ভোগাবে।

মা। তবে তুই এই গুলা নিয়ে যা। আমি ততক্ষণ আমার ছেলের কাপড় খানা বদ্‌লে দিই।

বিলাসিনী দ্রব্যাদি লইয়া সত্বরপদে চলিয়া গেল। বাড়ী পৌঁছিয়া গৃহ-মার্জ্জনী ও শয্যাদি লইয়া সেই খালি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। কতকগুলা লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খাওয়া দাওয়ার চিহ্ন উনান, হাঁড়ি ও মাল্‌সা ইত্যাদি পড়িয়াছিল। অতি অল্প সময় মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া এক ধারের কতকটা স্থান গোময় দ্বারা শুদ্ধ ও শয়নোপযোগী করিয়া লইয়া,তথায় দুই তিন পুরু হোগলা পাতিয়া,তাহার উপর শয্যা প্রস্তুত করিল। তার পরে গৃহের অন্যান্য অংশ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কমলকুমার শোণিতাক্ত পাদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে যখন সেই গৃহে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বিলাসিনী প্রায় সমস্ত ঘর-খানি পরিষ্কার করিয়াছে। বাহিরে নিকটে রাশীকৃত জঞ্জাল,ইট ও হাঁড়ি মালসা প্রভৃতি দেখিয়া কমলকুমার মনে মনে বিলাসিনীর প্রতি শত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল "এ কি করেছ?" বিলাসিনী তাহার সেই "স্ত্রীলোকেও দুর্ল্লভ" কুন্তল-কলাপের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়াছে। গৃহ মার্জ্জনকালে উত্থিত ধূলি-রাশীতে তাহার কেশভার ধূসরিত হইয়াছে। বিলাসিনীর বহু ক্লেশে প্রস্তুত শয্যাতে কমলকুমারকে শয়ন করাইয়া বৃদ্ধা পুনরায় তাহার বাম পায়ের ক্ষত স্থানে ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দিল, এবং যথাসম্ভব সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জাগ্রত-স্বপ্নে।

কমলকুমার এখন কলবাড়ীতে কাজ করে না। সেই দীর্ঘকালব্যাপী রোগ-শয্যা হইতে, বিলাসিনী ও তাহার জননীর অক্লান্ত পরিচর্য্যার গুণে, উঠিয়া, বিলাসিনীর পরামর্শে সেই ভগ্ন কুটীরে বাস করিয়া নিকটবর্ত্তী পল্লিতে এক পাঠশালা করে। প্রাতঃকালে বাজারের এক ব্যবসায়ীর পুত্রকে ইংরাজী পড়াইয়া ৩ টাকা পাইত, আর পাঠশালায় ১৫।২০টী ছেলে পড়াইয়া ৪।৫ টাকা পাইত। এই সদুপায়ে সজ্জনের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের পথ-প্রদর্শিকা ও পরামর্শদাত্রীর ঋণ পরিশোধার্থে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে তাহাকে ক্ষণকাল সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা দেয়। এই ভাবে সুখে ও শান্তিতে এক বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল অতীত হইয়াছে।

সন ১২৮১ সালের পৌষ মাস অতীত প্রায়। আর ২।১ দিন মাত্র বাকি আছে। এমন সময়ে কমলকুমার একদিন অপরাহ্ণে বজবজের গড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছে, সম্মুখ দিয়া অসংখ্য নৌকা যাত্রী লইয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। কমলকুমার ভাবিল সাগর-স্নানের আর বেশী বিলম্ব নাই। এই চিন্তার সহিত তাহার জীবনের এক বৃহৎ ঘটনা সংসৃষ্ট। পৌষ সংক্রান্তির দিন সূর্য্যোদয়ে পুণ্যক্ষণে কমলকুমারের জননীর স্বর্গলাভ হইয়াছিল। সে আজ সাত বৎসরের কথা। দ্বাদশবর্ষীয় বালক মাতৃহীন হইয়া বহুবিধ দুঃখ কষ্ট ও বিপদের

মধ্যে জীবনের সাত বৎসর কাল কাটাইয়াছে। কমলকুমার সংসারে ১৯টী বৎসর কাটাইয়া দুইএর কোঠায় পা দিয়াছে। একাহার ও অনাহার ও অন্য নানাবিধ অত্যাচারে শরীরের যৌবনসুলভ কান্তি ও সময়োপযোগী দৃঢ়তা তাদৃশ বর্দ্ধিত হয় নাই। কিন্তু তথাপি দেখিতে সুপুরুষ, দাড়ি গোঁফের রেখা দিয়াছে মাত্র। যুবক কমলকুমার একখানি অল্প মূল্যের বিলাতী শীতবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া লোকালয়ের অনতিদূরে—গঙ্গার তীরে বসিয়া পিতামাতার অপরিমেয় স্নেহ, গভীর কল্যাণ কামনা ও সর্ব্বদা সদুপদেশ দান স্মরণ করিয়া ও সেই সঙ্গে নিজের বর্ত্তমান উদ্দেশ্যহীন ও দীনভাবে জীবনযাপন চিন্তা করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন সময়ে তীরবেগে পরিচালিত একখানি নৌকার উপর দৃষ্টি পতিত হওয়াতে,সহসা যেন বোধ হইল, কমলকুমারের পিতা মাতা উভয়েই সেই নৌকা বক্ষে একত্র দাঁড়াইয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক পুত্রকে ডাকিলেন। ইঙ্গিতে যেন তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে বলিয়া গেলেন। কমলকুমার আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—অমনি পিতা মাতার বিমল দেবমূর্ত্তিসহ সেই বেগগামী নৌকাখানি অদৃশ্য হইল! সত্য সত্যই একখানি নৌকা তীরবেগে ধাবিত বলিয়া অদৃশ্য হইল, কি কমলকুমারের কল্পিত নৌকা শূন্যে মিশিয়া গেল, সে তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না; কিন্তু এখনও তাহার বোধ হইতেছে যে, কে যেন তাহাকে "চলে আয়—চলে আয়" বলিয়া ডাকিতেছে। সে প্রথমে একটু ভয় পাইল, পরে বসিয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিল। আজ তার জন্মভূমি, জেঠাইমায়ের ভালবাসা, ছোট ভাইটীর মৃত্যু ও শশ্মান-দৃশ্য, জননীর মৃত্যু এ সকলই একে একে প্রাণের মাঝে উদয় হইতেছে—আর সেই অসহায় যুবক একাকী বসিয়া অতি কাতর ভাবে রোদন করিতেছে।

বিলাসিনী সন্ধ্যার পূর্ব্বে কমলকুমারের আহারের আয়োজন করিয়া দিতে আসিয়া তাহাকে না দেখিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। শেষে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া দিয়া,কমলকুমারের ঘরের দরজাটী বন্ধ করিয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, কিন্তু বাড়ী যাইতে তাহার মন সরিতেছে না। দ্বার বন্ধ করিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। পরে কি ভাবিতে ভাবিতে, বাড়ীর দিকে না গিয়া গঙ্গার ধারে চলিল। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চলিতে চলিতে, কমল-

কুমার যেখানে বসিয়া আছে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলকুমারকে দেখিয়া বলিল "এ কি! যা ভাব্‌লুম তাই হ'লো! অন্য দিন তোমাকে দেখ্‌তে না পেলে, সব যোগাড় করে রেখে বাড়ী যাই, মনে কোন। খট্‌কা লাগে না। আজ সব ঠিক করে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। শেষে বাড়ী যেতে উদ্যত হয়ে ঘর ছেড়ে বাহিরে দাঁড়ালুম। মন সরিল না।• শেষে কেন জানি না এক পা দুপা করিয়া এই পথে——।"

ক। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কি রেখেছ, একবারে গ্রাস করেছ,তাই আমার চলা ফেরা, ভাব গতিক, কাজ কর্ম্ম ও মনের মতলব সবই বুঝিতে পার।

বি। তোমার কথা ভার ভার কেন? কেঁদেছ?

ক। আমি ভাবছিলুম, এখান থেকে আমার ঘরে না গিয়ে, একবারে তোমাদের বাড়ীতে একটা পরামর্শ করিতে যাইব। তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে, ব'সো।

বি। (নিকটে বসিয়া) কি বল, আমার ভয় হচ্চে, কি জানি কি বলে বোস্‌বে। এই দুই বৎসরে যেমন শত প্রকারে সুখী করেছ, তেমনি জ্বালাতনও করেছ। আবার কি একটা নূতন কথা বলে বোস্‌বে তার ঠিক কি?

ক। তোমাকে জ্বালাতন করেছি—তোমাকে যাতে আর জ্বল্‌তে না হয়, তারই উপায় করবো ভাবছি।

বি। আমার ভাঙ্গা কপাল। সে আর বেশী কথা কি? তা না হ'লে বেচে বেচে কথার দোষটুকুই কেবল ধরবে কেন?

ক। কথার ভালটুকু ত ভালই—সে স্বাভাবিক—আত্মীয় স্থলে সে কথার আবার দাম কি?

বি। আত্মীয় স্থলে কথার দোষটাই বা কেন নিক্তির ওজনে মেপে নেবে? তুমি বড় কথার দোষ ধর, কই আমি ত কখন তোমার কথার ছল ধরিয়া ঝগড়া করি না! কিন্তু তাই বা বলি কেন? তুমি দেবতা আমি মানুষ—তুমি ব্রাহ্মণ আমি শুদ্রা—তুমি প্রভু আমি দাসী—তুমি পুরুষ আমি স্ত্রী-লোক; তোমার মুখে যাহা শোভা পায়, আমার মুখে তা সাজে না। আকাশের চাঁদে আর পুকুরের কুমুদে, ভাব থাকলেও, যে দূরতা—তোমার আমার মধ্যে সেই দূরতা; নলিনী সরোবরে—আর আকাশে দিবাকরে যে আত্মীয়তা,

তোমাতে আমাতেও সেই আত্মীয়তা—তুমিও আমার তেম্‌নি সখা! আমি ভাবি তুমি আমার, তুমিও ভাব আমি তোমার, কিন্তু এত কাল কাছে কাছে থেকেও পরস্পর আকাশ পাতাল দূরে—"সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি মুঠমহাত ফারাক।" কেমন না? কমলকুমার বলিল "তুমিই কি কম? আজ যে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতিয়াছেন দেখ্‌ছি! সেই জন্যেই ত মেয়েদের লেখা পড়া শেখায় না।" এই বলিয়া সাদরে স্নেহভরে নিকটে উপবিষ্টা বিলাসিনীর দুই গালে দুটী ছোট ছোট চড় মারিয়া বলিল, যা বলিব, চুপ করে মার্‌টী খেয়ে শোন! আজ সাত বৎসর হইল, আমার মায়ের, আর ৯ বৎসর হইল বাবার মৃত্যু হয়েছে। আজ ছয় বৎসর হইল কাহারও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হয় না। পরশ্ব দিন সংক্রান্তি, অনেক লোক সাগরে নাইতে যাচ্চে। আমি আজ শেষ রাত্রিতে যাত্রা করিলে, কাল রাত্রিতে পৌছিব। এখান থেকে রাত্রিতে অনেক লোক যাবে, সেই সঙ্গে যাব। সাগরে স্নান করিয়া সেইখানেই বাপ মায়ের উদ্দেশে এক একটী পিণ্ডদানও করিব। বিলাসিনী বলিল "কাজটা খুবই ভাল, কিন্তু কি জানি, আমার মনটা সায় দিচ্চে না। কেন জানি না, কথাটা শুনেই যেন ভয় হচ্চে। মনে হচ্চে যেন তুমি গেলে আর ফিরবে না।" কমলকুমার বলিল "কেন, এমন মনে হবে! আমি ত আর পুরন্দরের তাঁবেদারি করিনা যে যন্ত্রণার ভয়ে পালাইব। তোমার পরামর্শে আমার এত সুখ সুবিধা হইল, তবুও কেন আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাব—এত অবিশ্বাস কর?" বিলাসিনী বলিল "আমি তোমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবিশ্বাস করিনা। আমার কেবল মনে হইতেছে যে, কোন দৈব বিপাকে পড়িয়া আমি তোমাকে হারাইব। না—তা হবেনা—আমার ভাব্‌তেও ভয় হয়। না—না, তোমার যাওয়া হবে না।" কমলকুমার বলিল "তোমার কোন ভয় নাই—ভাবনা নাই, আমি ঠিক ফিরে আস্‌বো। আমি নিশ্চয়ই যাইব।"

বিলাসিনী বুঝিল, বাধা দিলে আরও জেদ্ বাড়িয়া যাইবে। তাই বলিল, "আচ্ছা যাও, আপত্তি নাই। বেশ সাবধানে কাজ সারিয়া চলিয়া আসিবে। তবে চল এখন যাই। শিগ্‌গির খেয়েদেয়ে নেবে, আর মায়ের সঙ্গে দেখা করবে তো?" কমলকুমার বলিল "চল যাই।" দুজনেই উঠিল। যে যার আপন আপন চিন্তা-রথে আরোহণ করিয়া বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাগরের পথে।

উত্তুরে হাওয়া পাইয়া, পাইল তুলিয়া দিয়া, কত নৌকা যে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। ক্রমে বামে ডায়মণ্ডহারবার ও দক্ষিণে গেঁওখালি পশ্চাতে রাখিয়া নৌকা সকল সাগরাভিমুখে চলিল। প্রাতঃ-সমীরণ-ভরে, স্ফীত বক্ষে, যেন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, নৌকা সব চলিয়াছে। যতই অগ্রসর হইতেছে ততই নদীর পরপার দূর হইতে সুদূরে গিয়া পড়িতেছে। ক্রমে অপর পারের গাছপালা, বন উপবন ও জনপদ আর কিছুই দেখা যায় না। অপর পার ক্রমশঃ একটী কাল রেখা মাত্রে পরিণত হইল। মাথার উপর আকাশ—নিম্নে বহুবিস্তৃত জলরাশি—পাইল ভরে দ্রুতগতিশীল নৌকাগুলিকে যেন অনন্ত আকাশে উড্ডীন সামুদ্রিক পক্ষীর দল বলিয়া বোধ হইতেছে। ক্রমে যতই অগ্রসর হইতেছে, চারিদিকের দৃশ্য ততই কমলকুমারের প্রাণে ভয়বিস্ময়বিজড়িত কৌতূহল জাগাইয়া তুলিতেছে।

তাহার মনে হইল, ছেলেবেলা পড়িয়াছিল, পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ জল, আর একভাগ স্থল, তাহা ঠিক। পৃথিবীর সমগ্র জলরাশির তুলনায় কমলকুমারের সম্মুখস্থ অকূল জলস্রোতঃ যে কত ক্ষুদ্র, তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, ইহাতেই জলের পরিমাণ স্থলের দ্বিগুণ ধারণা হইবার কারণ এই যে,

সে ইতিপূর্ব্বে কখন এক সময়ে এতটা স্থল বা জল একবারে দৃষ্টিগোচর করে নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, সম্মুখে ততদূরই জল—জল তাহার কৌতূহল বৃদ্ধি করিতেছে, আর সুপণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় মূর্খ সঙ্গিদিগকে কত নূতন তত্ত্ব শিখাইতেছে।

পথে একস্থানে নৌকা লাগাইয়া আহারাদির আয়োজন করিল। যেখানে অনেক লোক নৌকা লাগাইয়া আহারাদির আয়োজন করিতেছে, কমলকুমার সেইখানেই একটু দূরে এক টুক্‌রা পরিষ্কার জমির উপর আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। সঙ্গে বিলাসিনী ও তাহার মা। বৃদ্ধা বসিয়া সাগরের পথের গল্প করিতেছে। বৃদ্ধা আরও দুই বার ঐ পথে আসিয়াছে ইহার কারণ এই যে, সাগর স্নানের নিয়ম এই, একবার গেলে তিনবার যাইতে হয়। যেখানে আহারাদির আয়োজন করিল, তাহার নিকটে গাছপালা কিছুই নাই, বহুদূর পর্য্যন্ত কেবল সৈকতভূমি ধূ ধূ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটী ক্ষুদ্র ঝোপ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধা বলিল আমাদের শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেয়েদেয়ে নৌকায় উঠ্‌তে হবে। আর একটু পরে ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়লে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সাগরে পৌঁছিবে। তাহলে আর কোন কষ্ট হবে না।" বৃদ্ধা পূর্ব্ব দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল "ঐ যে দূরে কাল দাগের মত বন দেখা যাইতেছে ওকেই সুন্দর বন বলে, কখন কখন ঐ বন হইতে বাঘ বাহির হইয়া এই মাঠে চরা করে! বাঘ বাহির হয় শুনিয়া, কমলকুমার ও বিলাসিনী ভয়ে জড়সড়, মুখে কথা সরে না। বিলাসিনী শুষ্কতালু হইয়া বলিল "মা, এখন যদি হঠাৎ বাঘ আসে, তাহলে কি হবে?"

বৃ। আমরা সব ফেলে রেখে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌বো।

বি। এই সব খাবার ফেলে রেখে?

বৃ। কত লোক রাঁধতে রাঁধতে, খেতে খেতে পাল্‌য়ে যায়। আহা! সেবার একদল যাত্রী নৌকায় উঠ্‌ছে,এমন সময়ে বাঘ বাহির হয়েছে, সকলেই তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠ্‌তেছে একজন কিছুই জানতে না পেরে পেছনে পড়ে আছে, কি একটা পড়ে আছে দেখে যেমন আন্‌তে যাবে, অমনই সেই প্রকাণ্ড বাঘটা তাকে মুখে করে নিয়ে পালালো। "কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কি হ'লো—হায় হায়" শব্দে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল।

বি। সর্ব্বনাশ! তুমি ডাঙ্গায় উঠ্‌বার আগে একথা বল্লেন! কেন? এখন কি আর পেটে ভাত যাবে?

ক। (হাসিতে হাসিতে বলিল) তোমার যদি এত ভয়, তবে যাও না—নৌকায় গিয়ে ব'সো। আমি তোমার ভাত নৌকায় দিয়ে আস্‌বো। বাঘে খায় আমাদের খাবে। বুড়ো মা নিয়ে আর কতকাল 'বোসে থাক্‌বে? না হয় বাঘের মুখেই দিয়ে যাবে? কোন ঝন্‌ঝট থাক্‌বে না।

বি। ও কিও, অমন সর্ব্বনেশে কথা ব'লো না। আমার আর কে আছে? আমার মা আমার 'সাত রাজার ধন—এক মাণিক'! না—না, আমার মা-টী, বাপ্‌রে, আমার মাকে মর্‌তে দেবো না। আমরা, মা ও মেয়েতে একসঙ্গে মর্‌বো। সে বেশ হবে, কেউ কারু জন্যে কাঁদ্‌বে না, সে বেশ। (মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কেমন? দুজনে এক সঙ্গে মর্‌বো?

বৃ। বাপ্‌রে, অমন কথা কি বল্‌তে আছে, আমি কথা কইতে কইতে, তোর কোলে শুয়ে মর্‌বো, আর আমার বাবা আমার কাছে বোসে থাক্‌বে।

বি। না, মা, তোমাকে মর্‌তে দেবো না।

বৃ। তবে এক কাজ করিস্, আমি মলে, দশরথের মত তেলের কলসীতে ডুব্‌য়ে রেখে দিস্। আর রোজ সকালে উঠে এক একবার দেখিস্।

ক। বাঘ বেরিয়েছে বলে বোধ হয়।

বি। সর্ব্বনাশ! কিসে বুঝলে?

ক। বাঘের গায়ের বোট্‌কা গন্ধ বেরিয়েছে।

বি। বাঘের গায়ের বোটকা গন্ধ কি রকম,কেমন করে বুঝ্‌বে? কোথায়, কবে, কি ক'রে বাঘের কাছে গেলে?

ক। কেন আমি ছোট বেলায় বারাকপুরের চিড়িয়া খানায় বাঘ ভাল্লুক অনেক দেখিছি।

বি। মা, তা'হলে কি হবে? চল নৌকায় যাই।

ক। তাই যাও, আমি সব নিয়ে যাচ্চি।

বি। মা, চলো—মা, শিগ্‌গির চলো।

বৃ। তুই কেবল তোর মা নিয়েই ব্যস্ত, আর ঐ পরের ছেলেটা বুঝি আমাদের কেউ নয়?

বি। ও যে তোমার বেটা ছেলে।

বৃ। বাঘের মুখে আবার বেটাছেলে আর মেয়েছেলে কি ?

ক। বিপদের সময়ে 'চাচা আপনা বাঁচা'। যায় যাক্ পরের উপর দিয়েই যাক্। (বিলাসিনীর দিকে তাকাইয়া) মা আর মেয়ে বাঁচ্‌লেই হলো,কেমন ?

বি। আমি কি তাই বল্লুম ? আমার সকল কথাই কি ঐ রকমে ঘুরিয়ে নেওয়া, আর ঝগড়া করা:তোমার অভ্যাস।

বৃ। কেন মা, ঝগড়া কর ? এখন তোমারই বেশী দোষ। তুমি একটী বারও আমার ছেলের বিপদের কথা ভাবনি—বলোওনি।

ক। হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, আনন্দে—উৎসাহে করতালি দিয়া বলিল "যা! হাইকোর্টের বিচারে তোমার মকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্। এর আপিল নেই, এখন কাঁদ।

বি। (কল্পিত ক্রোধে মুখ ভার করিয়া মাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল) নেযাক্ তোমাকেও বাঘে নিয়ে যাক্।

ক। "তোমাকেও" ধরে নিয়ে যাক্, এ কথার মানে কি ? 'ও'টা কেন ?

বৃ। মা ! আবার ঠক্‌লে ? ঐ এক 'ও'তে ওকেও জড়ালে !

বি। আমার মুখে আগুন, যা বল্‌ছি তাতেই দোষ ! নেযায় নেযাক্, আর কিছু ব'লবোও না—ক'র্‌বোও না।

ক। তাত বটেই,বাঘে ধর্‌তে এলেও কিছু বল্‌বেও না,আর নিয়ে গেলেও কিছু কর্‌বেও না। সেত জানা কথা। এ আর নূতন কি ?

বিলাসিনী আর একটী কথাও কহিল না। তাহার মাও হাস্‌তে লাগ্‌লো। কমলকুমারের ত হাসির ফোয়ারা উঠিয়াছে। কমলকুমার থেকে থেকে এক একবার যেমন হাসিতেছে, বিলাসিনীর রাগের মাত্রা ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তাহাকে খাওয়ান ভার হইয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণাভ বদনমণ্ডল অনুরাগের রাগে, আরো কালো হইল। সে মুখ অন্ধকার করিয়া নত দৃষ্টিতে বসিয়া নয়নাসারে সৈকত সিক্ত করিতে লাগিল। মা কত সাধ্য সাধনা করিল, মন উঠিল না। মা বিরক্ত হইল। কমল-কুমারের জিত, কাজেই তাহার মেজাজ দরাজ, সেও সাধ্য সাধনা করিল হার মানিল। শেষে মা যখন আপন মনে নত দৃষ্টিতে কি কাজে ব্যস্ত, সেই সুযোগে

শ্রীমান, শ্রীমতীর মান ভঞ্জনে অগ্রসর, কাণেকাণে কি কথা বলিয়া কোঁচার কাপড় গলায় দিয়া হাত জোড় করিতে না করিতে বিলাসিনীর ঘন মেঘাবৃত আননাকাশে-দামিনী লীলার অনুপম শোভা ফুটিয়া উঠিল। কমলকুমার বলিল "সেটা আমার হার, এইটা আমার জিত। ভাতগুলিও কাঁদ্‌ছে, এখন রাগটা এক পাশে সরিয়ে রেখে, ভাত কয়টী খেয়ে তাদিগকে ঠাণ্ডা কর, আর তোমার সরকার বাবুর বামন ঠাকুরকেও ছুটী দাও। এখনও রাগ পূর্ণ মাত্রায় অনুরাগে পরিণত হইতেছেনা দেখিয়া, কমলকুমার বলিল "বাকি টুকুও কি কর্‌তে হবে না কি? অনুরাগিনী বিলাসিনী মধুমিষ্ট দৃষ্টিতে কমলকুমারের দিকে তাকাইয়া এবং ইঙ্গিতে মাকে দেখাইয়া বলিল "ছি! কি কর?" কমলকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল "বলি বাকিটুকু মুখে বলিলেই হবে, না হাতে কলমে শ্রীচরণ কমলেষু পাঠ লিখিতে হইবে? এইবার বিলাসিনী কল্পিত কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিকৃত মুখ-ভঙ্গিমায় উপহাস করিয়া মায়ের ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিল। উঠিয়া মায়ের নিকটে গিয়া মায়ের হাত হইতে পাতা লইয়া নিজেই ভাত খাইবার যায়গা করিতে লাগিল। মা বলিল "মাঝে মাঝে তোর ঘাড়ে ভূত চাপে, না? নিজে দোষ কর্‌লি আবার নিজেই ঝগড়া করে কাঁদ্‌তে বস্‌লি।" কমলকুমার তিন জনেরই ভাত বাড়িল। তিন জনেই আহার করিতে বসিল। সকলের আগে কমলকুমারের আহার হইয়া গেল। কমলকুমার উঠিয়া "ঐ গো—বাঘ আসিতেছে"—বলিয়াই ছুট্। বিলাসিনী চমকিত হইয়া চারিদিকে তাকাইতে গিয়া বিষম খাইল। পরে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, দেখ দেখি তুমি আদর দিয়ে দৌরাত্ম্যটা কত বাড়াইয়া দিলে। বড় দুষ্টু—বড় ঝগ্‌ড়াটে। মা বলিল, তুই কি কম! যেমন ও তেমনি তুই। দুই সমান—কেউ কম নয়।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাগর-সঙ্গমে।

যে স্থানে ভাগীরথী-সলিল-ধারা বারিধি-বক্ষে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই পুণ্যসঙ্গমে পৌষ সংক্রান্তির সুপ্রভাতে অসংখ্য নরনারীর জনতার মধ্যে কমল-কুমার স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য সমাপন করিল। বিলাসিনী এবং তাহার মাও যথাবিধি স্নানান্তে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয় করিল। অসংখ্য লোক। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ স্নানান্তে দলে দলে পূজা আহ্নিকে ব্যস্ত। আশ্চর্য্য এই যে, এই অল্প সময়ের জন্য, এত লোকের জনতা, এত হাট বাজার, সহসা এত দ্রব্যাদির আম্‌দানি ও ক্রয় বিক্রয় এক বিচিত্র দৃশ্য বলিয়া মনে হয়।

যে উদাসভাব বজবজের গঙ্গাতীরে কমলকুমারের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, যাহার স্পর্শমাত্রে,হৃদয়ে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিয়োগচিন্তা প্রবল হইয়া-ছিল, যে চিন্তাসূত্রে কমলকুমার পিতামাতার বাহু প্রসারণপূর্ব্বক আহ্বান দর্শন, ও "চলে আয় চলে আয়" শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল,যে আহ্বানের শক্তিসূত্রে আজ কমলকুমার সাগরে আসিয়া উপস্থিত, সেই শক্তিই কমলকুমারের অবলম্বনহীন হৃদয়ের মহাশূন্যতায় আসন পাতিয়াছে, অজ্ঞাতসারে সেই শক্তিই তাহার পরি-চালকরূপে কার্য্য করিতেছে। আজ সত্য সত্যই কমলকুমারের সুপ্রভাত। সে নিদ্রাভঙ্গে চক্ষু চাহিয়া দেখিল,চারিদিক সুপ্রসন্ন—সুন্দর—মনোহর। আজ তাহার সংসার-সুখপ্রিয় হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয় সুধাসিঞ্চিত বলিয়া বোধ হইতেছে—আজকার

প্রাতরুত্থান তাহার হৃদয়ে এক অলৌকিক কৌতূহল ফুটাইয়া তুলিতেছে। তাই কমলকুমারের নিকট সমগ্র দৃশ্যটী আরও সুন্দরতর শ্রী ধারণ করিয়াছে। কমলকুমার অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিল সম্মুখে অনন্ত জলরাশি! ধীর প্রকৃতি—স্থির বুদ্ধি—প্রবীণ ব্যক্তির ধীরে অগ্রগমনের ন্যায়, রত্নাকর অতি গম্ভীর ভাবে তুফানরহিত সুবৃহৎ তরঙ্গের পর তরঙ্গে বাহু প্রসারিয়া বেলাভূমি আলিঙ্গন করিতেছে। চঞ্চলতা নাই, ব্যস্ততা নাই, সময়ের ব্যবধানে ব্যভিচার নাই, যেন কোন মহাকবির রচিত কাব্য-রস-লীলা বিতরণে নিয়ত নিযুক্ত, সে কার্য্যে বিরাম বা বিরতি নাই, ছন্দঃপাত নাই, সে অদ্ভুত শৃঙ্খলা, গাম্ভীর্য্য ও নিষ্ঠার সম্মিলন দর্শনে কমলকুমারের প্রাণে এক নূতন পবিত্রভাবের সৃষ্টি হইতেছে! ইহার উপর পূর্ব্ব গগনে জলরাশির মধ্য হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছে দেখিয়া,তাহার বোধ হইতেছে, যেন,জলে কেহ আগুন লাগাইয়া দিয়াছে—যেন তরল অনল-রাশি তরঙ্গ তুলিয়া ঐ অসংখ্য নরনারীকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে, কিন্তু পুণ্যসলিলা ভাগীরথী-নীরে আসিয়াই যেন আপনাআপনি নির্ব্বাপিত হইতেছে। আত্মবিস্মৃত কমলকুমার সহসা বলিয়া ফেলিল "একি ভেল্‌কী?" এই সুকৌশলময় শোভা ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশে সাগর-সঙ্গম ধার্ম্মিকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব, কবির প্রাণে গভীর সৌন্দর্য্যের ভাব এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের প্রাণে ভয়বিহ্বলতামাখা গাম্ভীর্য্যের উদয় করিতেছে, ইহার উপর প্রত্যেক ব্যক্তির পৌষের শীতল সমীর-কম্পিত স্নান জন্য শতবিধ ক্লেশস্বীকার দর্শনে অতি মূঢ়ের প্রাণেও ধর্ম্মধনের প্রতি একটা অতি গভীর অনুরাগের উদয় করিয়া দেয়—কমলকুমার স্বাভাবিকই সৎ ও ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ের লোক, এখানকার বহুবিধ অনুকূলতায় তাহার প্রাণের নিভৃত কক্ষে অলক্ষিতভাবে লুকাইত অবলম্বনহীন উদাসভাব সুন্দররূপে জাগিয়া উঠিতেছে। চিত্রকর যেমন চিত্রকার্য্যের সুবিধা ও চিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে শুভ্র বর্ণের জমি প্রস্তুত করিয়া লয়—সেইরূপ, যেন কোন মহাশক্তিশালী পুরুষের হাত দূর হইতে অলক্ষিত ভাবে কমলকুমারের হৃদয়ের আবর্জ্জনা রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার হৃদয়ের উপর শূন্যতার রং ফলাইতেছে, যেন কোন উচ্চতর চিত্র অঙ্কনের উপযোগী শুভ্রোজ্জল জমি প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়পরিচালিত কোন অলক্ষিত শক্তি কমলকুমারের হৃদয়ের অবলম্বনহীন উদাস ভাব বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। তাই আজ

যাহা দেখিতেছে, তাহারই পশ্চাতে আরও নূতন কিছু দেখিবার, নূতন কিছু জানিবার এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ের শূন্যতা দূর করিবার লালসা বৃদ্ধি পাইতেছে। কমলকুমার নিজের কাজ সারিয়া কৌতূহলপরিচালিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মণ্ডলী ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। দূর হইতে দূরে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিল, এক স্থানে কতকগুলি সন্ন্যাসী স্নানান্তে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যস্ত। তাঁহাদের আকার ইঙ্গিত, ভাব ভক্তি, কমলকুমারের নিকট ভাল লাগিল। একে একে ঐরূপ ধর্ম্মনিরত বহু লোকের মুখাবলোকন করিতে করিতে সহসা কমলকুমার একজনকে দেখিয়া চমকিত হইল। বোধ হইল যেন তাঁহাকে কোথাও দেখিয়াছে—ক্রমে তাহার মনে হইতে লাগিল যে, ঐ মুখ যেন প্রিয় ও পরিচিত—কিন্তু কি সূত্রে প্রিয় বা কোথায় কি অবস্থায় পরিচিত, তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছে না। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। শেষে নিরাশ হইয়া অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যায়, এমন সময়ে সেই পক্ক কেশ, অলক্তাভ-মোদনকান্তি, সবল ও সুস্থ দেহ সন্ন্যাসীর পূজান্তে ধ্যান ভঙ্গ হইল। সেই প্রীতিমাখা—প্রসন্নদৃষ্টি সাধু, চক্ষু চাহিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে কমলকুমারের বিস্ময়-বিষাদমাখা শূন্যদৃষ্টি মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন; তাকাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত হইলেন। সাধুর হাসিতে তাঁহার সৌম্যোজ্জ্বল বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল—যেন গোপনে গোপনে কাহাকে কি বলিয়া প্রফুল্ল দৃষ্টিতে কমলকুমারকে ইঙ্গিতে অগ্রসর হইতে ও নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন।

কোমল-মধুর দৃষ্টিপাত ও সস্নেহ ইঙ্গিত আহ্বানে কমলকুমার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা সত্রাস আকর্ষণ অনুভব করিল—সসঙ্কোচ অগ্রগমনে আপনা-আপনি তাহার প্রাণে সম্ভ্রমের সঞ্চার হইল। সে নত অথচ আবদ্ধ দৃষ্টিতে সেই যোগীবরের দিকে সভয়ে তাকাইতে তাকাইতে নিকটস্থ হইল ও বিনীত ভাবে প্রণত হইয়া উপযুক্তরূপ দূরে উপবেশন করিল।

স। বৎস! তোমার কুশল ত?

ক। আজ্ঞা আপনার আশীর্ব্বাদে এ হতভাগার আপাততঃ মঙ্গল।

স। গত পরশ্ব কত রাত্রিতে যাত্রা করেছিলে?

ক। আজ্ঞা রাত্রি ১০৷১১টার সময় নৌকা ছেড়েছিলুম। (মনে মনে

ভাবিল আমি পরশু যাত্রা করিছি, উনি কি করে জান্‌লেন! ভাবিতে ভয়ও হইল)।

স। পথে কোন ক্লেশ হয় নাই ত?

ক। আজ্ঞা না।

স। তুমি ভয়ে জড় সড় হইতেছ কেন?

ক। আজ্ঞা এরূপ সাধুসজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে কখনও পড়ি নাই, তাই অনভ্যাসবশতঃ ঐরূপ হইতেছে।

স। তোমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কোথায়?

ক। (ভয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তে, শুষ্কতালু হইয়া) আজ্ঞা তাঁহারা ঠিক এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন জানিনা, তবে আসিবার সময়ে তাঁহাদিগকে স্নান করিয়া উঠিতে দেখিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু সে আর ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছে না।

স। বাবা, তুমি এত ভীত ও নিজেকে ততোধিক বিপন্ন বলিয়া মনে করিতেছ কেন?

ক। আপনার অনুমতি হইলে, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

স। কর।

ক। আমি যে পরশু যাত্রা করিছি, আর সঙ্গে যে লোক আছে, এ দুটা বিষয় কেমন করিয়া নিশ্চয়রূপে জানিলেন?

স। (সহাস্যবদনে বাম দিকে তাকাইয়া ডাকিলেন) সুব্রত?

সু। আজ্ঞা মহারাজ!

স। বালককে বল, আমরা ইহাকে কোথায় দেখিয়া আসিয়াছি।

সু। মহারাজ, বজবজে দেখিয়া আসিয়াছি।

ক। (রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া বলিল) প্রভু! আমার ভাবনা বাড়িয়া যাইতেছে। আমায় ক্ষমা করুন এবং ত্বরায় আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করুন, নতুবা আমার চিত্তবৈকল্য ও সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গবিকার উপস্থিত হইতেছে। আপনাকে প্রথম দেখিয়াই পরিচিত আত্মীয়ের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইয়াছে, কিন্তু আপনি আমার কেহ হন কিনা, এবং কবে কোথায় দেখিয়াছি, কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। বহু চেষ্টা করিয়াও এখনও স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

স। ভয় কি বৎস! আমি তোমার পিতার গুরুপুত্র। তোমার পিতামাতার স্বর্গারোহণের পর একবার মাত্র তোমাকে দেখিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ কর, তোমার শনির উগ্রভাব চলিয়া যাইবে, বিপদ আপদের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। তখন মোহবশতঃ শুনিলে না,তাহারই ফলে কত কষ্ট পেয়েছ। আমি একে একে সমস্তই বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু সে সকল আলোচনার আর কোন প্রয়োজন নাই। বিধির বিধি বুঝা ভার, তা নাহ'লে রামেশ্বরের ছেলে পথের পথিক হইয়া দেশে দেশে ও বনে বনে কেন ঘুরিবে? যাহা ঘটে সকলই মঙ্গলের জন্য, এখন তোমার শনিত্যাগ হইতেছে, আমার সঙ্গে চল, উপযুক্ত সময়ে দীক্ষা পাইবে এবং ত্বরায় শুভদিন সমুপস্থিত হইবে।

যে পরম বস্তুর সংস্পর্শে উদ্ধত ব্যক্তি অবনত—দাম্ভিক বিনীত হয়—দুরন্ত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, উপরোক্ত সাধুর জীবনে প্রচুর পরিমাণে সেই পরম ধন সঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহার সৌম্য-সুন্দর মূর্ত্তি সেই ধনের গুণে শত গুণে স্বর্গীয় শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই কণকাভ কান্তিপূর্ণ দেহ হইতে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তাঁহার মহিমাময় মুখমণ্ডলে যেন দ্বিতীয় বালার্কের উদয় হইয়াছে, তাই অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ চারিদিকে দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার দেবোপম পবিত্র মুখের দিকে কত শত চক্ষু পলকশূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে! কমল-কুমার ভয়-ভক্তিতে গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া বলিল, "গুরুদেব! আপনার সেই মূর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু আপনার সে পরিচয়ের চিহ্নমাত্র নাই। আপনি তখন সংসারী ছিলেন, এখন যোগী, তখন সামাজিক রীতিসঙ্গত পরিচ্ছদে ছিলেন, এখন গৈরিক, জটাজুট ও রুদ্রাক্ষ শোভিত মূর্ত্তি ভিন্নরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছ, তাই দর্শনমাত্র চিনিতে পারি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করুন। বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া এতদিন জীবিত থাকা আজ সার্থক হইল। আর এই অধমকে অভয় দান পূর্ব্বক সংসারে পথ দেখাইয়া দিন, আমি যথাসাধ্য সেই পথেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব। কতদিন কত সময়ে বিপন্ন হইয়া, অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে আপনার কোমল কান্তিপূর্ণ মধুর মূর্ত্তি ও ঐ দেবমুখ নিঃসৃত সে সময়ের বেদবাক্যগুলি স্মরণ করিয়াছি, কিন্তু এক দারুণ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ বলিয়া জন্মভূমি ও সুহৃৎ-

সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সান্নিধ্য নিষিদ্ধ, তাই পঙ্গুর ন্যায় অসহায় হইয়া অবস্থার দাসত্ব করিয়াছি—যে দিকে তাকাইয়াছি সেই দিকই আমার নিকট ঘোর তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে—পথ আর দেখিতে পাইতাম না। কেবল——।" গুরুদেব প্রসন্ন দৃষ্টিতে সুব্রতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সুব্রত, শুন শুন, বালক কি বলিতেছে। বল, বৎস বল, কেবল——কি ?" কমলকুমার আর কথা কহিতে পারিল না। ইহাঁকে সিদ্ধ পুরুষ জানিয়া নীরব স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ব্যাধবিতাড়িত, যুথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় বিলাসিনী ফুল্‌কামুখী হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বৃদ্ধা জননীও চলিয়াছে। ক্রমে সেই জনতায় নিকটস্থ হইয়া সে ভাবিল "এখানে হয়ত কোন তামাসা কি ভেল্‌কী বাজী হইতেছে, এই খানেই দেখা পাইব।" এই ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে তাহারই জীবনসর্ব্বস্ব ব্রহ্মচারীর ক্রীড়নক হইয়াছে,তাই সেই ভেল্‌কীবাজী দেখিবার জন্য ক্রমশঃই জনতা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া বিলাসিনীর চক্ষুস্থির! কয়েক দিন ধরিয়া তাহার দক্ষিণাঙ্গ নৃত্যের কারণ বুঝিল। কমলকুমার সাগর-স্নানে আসিলে, সে যে কেন আর ফিরিবে না, তাহার সহজ কারণটা সহজেই বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণটা অবলম্বনশূন্য হইল—সে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারীর বিচারে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় শিষ্যবর্গের মধ্য হইতে একজনকে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিয়া দিলেন "তোমার আসনের পশ্চাদ্দিকে উপবিষ্টা বিপন্না রমণী ও তাহার মাতার প্রতি দৃষ্টি রাখ। অল্প বয়স্কাকে কাতরা দেখিলে, শান্ত করিবে, প্রয়োজন হইলে, উহার পরিচর্য্যাও করিবে, জনতাজাত গোলোযোগে যেন উহাদের কোন ক্লেশ না হয়।" লোকের কৌতূহলবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ হইলে অনেকেই একে একে চলিয়া গেল, তবুও অল্প লোক রহিয়া গেল। তখন ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করিলেন। বিলাসিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন :—"মা লক্ষ্মি! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" বিলাসিনীর মা ঐ দেবোপম সাধুমূর্ত্তি সন্দর্শনে ভয়-ভক্তিবিজড়িত কুণ্ঠিত ভাবে নতজানু হইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কন্যাকেও ঐরূপ করিতে ইঙ্গিত করিল। আত্মহারা বিলাসিনীও জননীর ইঙ্গিতানুসারে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইয়া নত মস্তকে তাঁহার চরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। ব্রহ্মচারী বিলাসিনীর মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বৎসে! আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি সুখী হও, ও সংসারে নিরাপদে জীবন যাপন কর। তোমার উচ্চ কুলের পরিচয় না থাকিলেও, আমি জানি তুমি সুশীলা ও সৎস্বভাবা। অনেক কুলগৌরব সম্পন্ন গৃহস্থের ভাগ্যে তোমার ন্যায় গুণবতী কন্যা লাভ সকল সময়ে ঘটে না। তাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, মা, তুমি সুখী ও নিরাপদ হও।"

বি। ঠাকুর! যদি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তবে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

ব্র। মা লক্ষ্মি! সংসারে মানুষের সকল সাধ কি পূর্ণ হয়? তাহা হইলে পরকালের জন্য আর কি রাখিলে? এই দেখ, আমি অতুল সুখ ও সম্পদের অধিকারী হইয়া, শেষ দশায় সকল ত্যাগ করিয়া পথে পথে ঘুরিতেছি। কেন? সংসারে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না বলিয়াই ত?

বি। দেবতা! তাহা হইলে "সুখী ও নিরাপদ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন কেন? আপনি ব্রাহ্মণ—তাতে ব্রহ্মচারী—যোগী—আপনার মুখের কথা অন্যথা হইবার নহে। আমার সুখী হওয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে।

ব্র। মা! এতাবৎকাল তোমার যে টুকু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, উত্তর কালে তাহারও সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখিনী ও বিপথগামিনী হইবার কোন কারণ দেখি না; বরং আমার উপদেশ গ্রহণ করিলে, সুদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ববৎ সুখের পথে সুরক্ষিত হইলেও হইতে পার।

বি। আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি লোকের মনের অবস্থা বুঝিতে পারেন, বলুন দেখি, আমার ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে, আমার কিছুমাত্রও সুখের সম্ভাবনা আছে কি?

ব্র। মা! তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, ভবিষ্যতের অন্ধকার [illegible] কথাই বাহির করিতে [illegible] শাস্ত্রে তাহার নিষেধ আছে। [illegible] মাত্র বলি তাহা [illegible]ন। [illegible]বে।

বি। আপনি কে জানি [illegible] হাতে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না, এই দুই বৎসর যে অবস্থায় আমার দিন কাটিয়াছে, অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ তাহা জানে না। আপনার যদি তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র বুঝিবার শক্তি থাকে, আর আপনার শরীরে যদি দয়া থাকে, তাহা হইলে কখনই আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বিমুখ হইবেন না।

ব্র। বৎসে! আমি তোমার বর্ত্তমান ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব না। কমলকুমার আমার সহোদরপ্রতিম আত্মীয়ের পুত্র। আমার পিতা তাহার পিতার দীক্ষাগুরু, সুতরাং আমিও তাহার শিক্ষা ও দীক্ষার [illegible]য়, বহু পূর্ব্বে

অসৎ সঙ্গে পড়াতে, উহাকে হস্তগত করিতে পারি নাই, আজ দৈবানুগ্রহে উহাকে পাইয়াছি, আশ্রয় দিব ও রক্ষা করিব। ও বালক যখন শিশু ছিল, তখন উহার কোষ্ঠীপত্র আমিই প্রস্তুত করিয়াছিলাম; তাহাতে উহার জীবনে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইবার কথা, তাহার বাল্যলীলা মাত্র পরিসমাপ্ত হইল। আমি জানি তোমার সহকারিতায় ঐ বালক নানা বিপদে উত্তীর্ণ হইয়াছে। হে সুচরিতে! আজ তোমার মহাব্রত গ্রহণ করিবার দিন; এত দিন যে আশালতা অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলে, আজ তাহা এই পুণ্যতীর্থে বিসর্জ্জন দাও!

সমস্যার শেষ মীমাংসায় বিলাসিনীর বক্ষে অশনি-সম্পাত হইল। সেই চিরদুঃখিনী আজ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। পড়িতে পড়িতে অস্ফুটস্বরে বলিল:—"এ কি হইল?" পড়িয়া ভীতকাতরকণ্ঠে বলিল:—"শ্যামকান্তি কাদম্বিনী-ক্রোড় বজ্র-দণ্ড ধারণ করে বলিয়া—মোহনমূর্ত্তি বারিধিবক্ষ বাড়বানল উদ্গীরণ করে বলিয়া, আপনিও কি তাহাদেরই অনুসরণ করিবেন? আজ, পরম যোগী, সাধু, ব্রহ্মচারীর হস্তে আমার আশার বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হইবে? আপনি কে? ভুতভাবন ভগবান কি এই যোগীবেশে ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবলার প্রাণসংহার করিতে আজ উদ্যত? হে কৃপাকুশল পরম পুরুষ! আজ দয়া করিয়া——"বলিতে বলিতে বিলাসিনী অশ্রুপূর্ণ নয়ন মুদ্রিত করিল। সে মুখরা মূক হইল—ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস দেখিয়া সন্ন্যাসী গুরুতর বিপদ গণনা করিলেন এবং তাঁহার ক্ষুদ্র কুক্ষি হইতে কি একটা ঔষধ বাহির করিয়া বিলাসিনীর নাসিকাগ্রে ধরিবা মাত্র নিশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইরূপ সুকৌশলে তাহার জীবন রক্ষা করিয়া দুইজন শিষ্যের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া বৃদ্ধাকে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার সময় যখন বিলাসিনীর সামান্য চৈতন্যোদয় হইল, ক্ষীণ দৃষ্টিতে সে যখন চারিদিকে তাকাইতে লাগিল, অতি কাতর ভাবে যখন সে সেই যুবক সন্ন্যাসীদ্বয়ের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছিল, তখন সে তাহার সাধের জন্মভূমি শৈশব-স্মৃতিমিশ্রিত—সুখের সুবাসজড়িত বজবজের ঘাটে নৌকা বক্ষে শায়িতা। সেই অর্দ্ধ জাগরিতা, উন্মাদিনীপ্রায় বিলাসিনীকে তখন গৃহে লইয়া যাইবার আয়োজন হইতেছে।

নবীন সন্ন্যাসীদ্বয়ের উপর তাহাদের প্রভুর এই আদেশ আছে যে, ঐ যুবতী উপযুক্ত রূপে আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত উহারা নিকটে কোথাও অবস্থান পূর্ব্বক উহার চিত্তবৈকল্য দূর ও স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিবে। উন্নতির লক্ষণ দেখিলে, দুইজনের একজন থাকিবে, অপর জন ত্বরায় পুরুষোত্তমে গুরুর সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু বিশেষ ভাবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহার সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। বহু বিলম্ব হইলে, উপযুক্ত সময়ে গুরুদেব নিজেই আবার আসিয়া উপস্থিত হইবেন ও যথা-কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করিবেন।
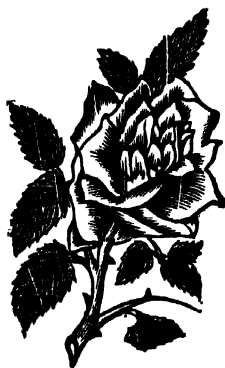
অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী শ্রীধরপুরে।

প্রায় আড়াই বৎসর হইল, জননীর বড় সাধের, পিতামহের বড় আদরের সুন্দরী বিধবা হইয়া গঙ্গাধরের সহিত পিতৃগৃহে পদার্পণ করে। সে যখন অসম্পূর্ণ বিবাহ-সূত্রে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুরদাদাব সঙ্গে শ্রীধরপুরে আসিয়াছিল, কমলকুমার তখন আত্মোন্নতির আশাসূত্র ধরিয়া কলিকাতা পশ্চাতে রাখিয়া বজবজের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইহার পর কমল-কুমারের জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার সমগ্র চিত্র পাঠকের সম্মুখে বিদ্যমান। কিন্তু উপেক্ষিত বিধবার সুকুমার জীবনক্ষেত্রে যে কি ভীষণ পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কে তাহার দাহিকা শক্তির পরিমাণ করিবে? সুখের আস্বাদনসিক্ত সহৃদয় ব্যক্তি বিপন্ন ও দুঃখী জনের বিষাদে সমবেদনা দেখাইতে পারে—কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই অনুভব করিতে—বুঝিতে পারে না। পিতামাতা বালিকা বিধবা কন্যার যৌবনসুলভ জীবন-সংগ্রামের মর্ম্ম-স্পর্শী দীর্ঘনিশ্বাসে ও হাহাকারে অশ্রুপাত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার জীবনব্যাপী একাকীত্বের গুরুভার হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সে জীবনের সংগ্রামে সহকারিতা করিতে অগ্রসর, এরূপ পিতামাতা সংসারে অতি অল্প। অল্প বলিয়াই বিধবার জীবনযাত্রা দুঃসহ ও শতবিধ বিপদ-জড়িত। কিন্তু নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ গঙ্গাধর পৌত্রীর প্রিয় সাধনে এবং তদ্দ্বারা তাহার সুখ সম্পাদনে সদা ব্যস্ত। সুন্দরীর নবীনা বিধবা জননী কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা ও সুখসাধনে জীবন বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এই বালিকার সুখসাধন চেষ্টা, তাঁহাদের পক্ষে ক্লীবের সংসার সুখ সম্ভোগের চেষ্টার তুল্য—মাটীর গড়া মূর্ত্তিকে শত সৌন্দর্য্যে শোভিত করিবার চেষ্টা মাত্র। গঙ্গাধর ও তাঁহার পুত্রবধূ নিজেদের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখী ও দুঃখিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া বালিকা বিধবা কন্যার সুখ সাধনের যে সকল উপায় উদ্ভাবন করেন, সে সকলের কোনটীই তাঁহাদের মনের মত হয় না—কিছুতেই তাঁহাদের হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায় না। অনেক আত্মীয় স্বজন ঐ বিধবা বালিকা পৌত্রীকে উপেক্ষা করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণের পরামর্শ দিল। গঙ্গাধর দুই তিনবার কোন কোন বন্ধুর এরূপ পরামর্শ দান নীরবে শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ অযাচিত পরামর্শ দান আর নীরবে উপেক্ষা করা অনুচিত বোধে একদিন এক আত্মীয়কে তীব্র তিরস্কারে অপদস্থ করিলেন এবং বলিলেন "বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে তাহা বিতরণ করিব, কোন বিপন্ন দুঃখীকে দিয়া যাইব, সেও ভাল তবু একটা বাঁদর পুষিব না। তোমরা নিজেরা অপদার্থ হইয়াছ, আর অন্যকেও অপদার্থ করিতে চাও। তা না'হলে কোন্ বুদ্ধি বিবেচনাবিশিষ্ট লোক ঐরূপ অসঙ্গত ও নির্ব্বোধের কার্য্য করিতে যায় ও অন্যকে পরামর্শ দেয়? গঙ্গাধর ক্রমে আত্মীয় স্বজনগণকে বুঝিতে দিলেন যে তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি সুন্দরীর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়মত কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। তাহার প্রীত্যর্থে যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইবে, তাঁহার সম্পত্তির শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত তাহাতেই ব্যয়িত হইবে। তিনি যেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও স্থির বুদ্ধির লোক, তাহাতে তাঁহার এই উক্তিতেই লোকের জল্পনার পরিসমাপ্তি হইল।

সুন্দরী ষোড়শী—তাহার যৌবনের তরঙ্গে তরঙ্গে—দিনে দিনে—ক্ষণে ক্ষণে—নূতন নূতন মাধুরী ফুটিয়া উঠিতেছে—সে কিশলয়-কোমল বাহুলতাদ্বয়ে রূপের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে চম্পক-কলিকা-কোমল-করপল্লব কাতরতা সহকারে যেখানে পড়ে, সেস্থান জুড়াইয়া যায়, তাহার যৌবনোদ্গম-ভারাক্রান্ত সৌন্দর্য্যের লীলা-বিলাস সর্ব্বদাই তাহাকে কুণ্ঠিত, ভীত ও বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাই সে জনসমাগমে সদাই জড়সড়। সে তন্বঙ্গী সুন্দরীর মুখ-কমল পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিতে আর অল্পই বাকি আছে। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার ললাটে যে অশা-

ন্তির রেখা পাত হইয়াছিল—তাহার চক্ষের উভয় পার্শ্বে যে কালী পড়িয়াছিল—তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলে যে বিষাদ ও অশান্তির গভীর ঘন ছায়া পাত হইয়াছিল—আজ আর তাহার তাহা নাই। সে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ, শান্ত ও সমাহিত। তাহার মা ও ঠাকুরদাদা তাহার জন্য কাতর ও চিন্তিত, কিন্তু সে আর নিজের জন্য ব্যস্ত ও বিব্রত নহে। তাই বলিয়া যে তাহার জীবনের সকল সাধ মিটিয়াছে বা ফুরাইয়াছে তাহা নহে। তাহার কোন কামনাই পূর্ণ হয় নাই—তাহার কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় নাই। দিবানিশি তাহার হৃদয়দেবতা তাহার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধ আর এই মানব সংসারের সম্বন্ধ নহে। সে বিধুভূষণের চিতানলে সংসার-সুখের আশাপুষ্প অঞ্জলি ভরিয়া আহুতি দিয়াছে। এখন কমলকুমারের স্মৃতির অনুবর্ত্তিনী বৃত্তি লালসাশূন্য—নির্ম্মল—পবিত্র প্রীতির শুভ্র প্রাসাদে পরিণত হইতেছে, তাই সে সংসারে বাস করিয়াও সংসারী নহে। দুঃখের অনলে দগ্ধীভূত তাই খাঁটি স্বর্ণের ন্যায় মলামুক্ত, সুন্দর ও স্বাধীন। কিন্তু তবুও কোথা হইতে কি যেন একটা বিষাদমাখা পূর্ব্বস্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া তাহার জীবনের উদ্যানে উঁকি মারে,আর তাহার অপূর্ণ ও পরিত্যক্ত বাসনার মহা শূন্যতায় তাহার সুখ-স্মৃতির চরিতার্থতার প্রলোভন দেখায়! তখনই কেবল সুন্দরী ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইয়া পরাধীন হৃদয়ের পরিচর্য্যায় ও পরে পুনরুদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই ভাবে দুঃখমাখা সুখের স্মৃতির সিংহাসনে প্রেমের দেবতাকে বসাইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহারই বন্দনা করিয়া হৃদয়কে শান্ত করে এবং লোকান্তরে লৌকিক বন্ধন মুক্ত হইয়া তাঁহারই সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছে। একটী একটী করিয়া এই ভাবে সংসার-তাপদগ্ধ দুঃখিনী সুন্দরীর দিন গুলি চলিয়া যাইতেছে। এই ভাবেই পূর্ণ দুটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখন তৃতীয় বৎসর চলিতেছে। পিতামহ গঙ্গাধর ও বিধবা জননী দুঃখিনীর দুঃখ দূর করিতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রাণের মর্ম্মস্থানে লুক্কাইত জীবনের জোয়ার ভাঁটার কণামাত্রও বুঝিতে, বুঝিয়া তাহা দূর করিতে সমর্থ হইলেন না। গঙ্গাধর শাস্ত্রজ্ঞ লোক, এরূপ বালিকার দুঃসহ দুঃখময় জীবনের ভার লঘু করিবার বিবিধ শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একদিন সুন্দরী শ্রাবণের শেষে অপরাহ্লের রৌদ্রে বসিয়া স্নান জন্য আর্দ্র কেশ শুকাইতে শুকাইতে মাকে বলিল, "মা এই এক বোঝা মোট ব'য়ে কি লাভ, এগুলা কাটিয়া ফেলি " বলিয়া অন্য কার্য্যে নিয়োজিত নিজ হস্তের কাঁচিখানি লইয়া একধার হইতে সেই রমণীপ্রিয় ঐশ্বর্য্যরাশির মূলোচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিল ! জননী চকিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখেন সুন্দরী, মুখের কথা বাহির করিতে না করিতে,কাজ আরম্ভ করিয়াছে,শোক-সন্তপ্তা ও বহুবিধ মনস্তাপ-পীড়িতা জননী পলকমধ্যে কন্যার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা ! আর দুদিন পরে ফেল্‌বে, বুড়ো যে কদিন আছে, আর আমি হতভাগিনী যে কটা দিন আছি, সেই কটা দিন রাখ, তার পর ফেলে দিও।"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবন-সংগ্রামে।

ভয় ভক্তি বিমিশ্রিত এক অব্যক্ত শক্তির অধীন হইয়া কমলকুমার ভবানী-পতির সঙ্গ লইয়াছে। তাহার এমন সামর্থ্য নাই যে, সে, সে সঙ্গ ত্যাগ করে। ভবানীপতির সঙ্গ তাহার নিকটে বর্ত্তমানে সুখকর ও ভবিষ্যতে বিবিধ মঙ্গলের আকর বলিয়া মনে হইতেছে, তাই সে আর সে সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া সে যে নিশ্চিন্ত হইয়াছে তাহা নহে। একদিকে সাধুসঙ্গের গুণে তাহার হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলি বসন্তের পুষ্পোদ্গমের ন্যায় মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে, অপর দিকে তাহার হৃদয়ের নিভৃত কুটীরের এক প্রান্তে শৈশবসহচরী সুন্দরী অপর প্রান্তে ঘোর পরীক্ষাপূর্ণ দুঃখময় জীবন-সংগ্রামের সঙ্গিনী দুঃখিনী বিলাসিনী বিরাজ করিতেছে। ইহাদিগকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলা তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য ক্লেশকর। সুন্দরী প্রিয় হইলেও সুন্দরী এতকাল ধরিয়া যে তাহার জন্য বসিয়া থাকিবে না—তাহার মা ও ঠাকুরদাদা যে ষোল বছরের মেয়ে নিয়ে বসে থাক্‌বে না, ইহা এক প্রকার ঠিক। কিন্তু সেই শৈশব-সুখের সঙ্গী সুন্দরী বিবাহে স্বামী সঙ্গে কেমন সুখে সংসার করিতেছে, জানিতে ইচ্ছা হয়—তাহার দুঃখ কষ্টের কারণ থাকিলে, আর সম্ভব হইলে, তাহা দূর করিতে ইচ্ছা হয়। কমলকুমারের অবস্থাবৈগুণ্যেই সে সুন্দরীকে হারাইয়াছে এই চিন্তা যখনই তাহার মনে পড়ে—যখনই মনে হয় সেই লোকবিরল সৌন্দর্য্যের কলিকা, সংসার-বাত্যাবিতাড়িত, বিধ্বস্ত ও পরিশেষে বৃন্তচ্যুত হইয়া

জীবন-সংগ্রামে সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে ভাজা ভাজা হইতেছে—তখনই তাহার পরিণাম ভাবিতে কমলকুমারের মাথা ঘুরিয়া যায়—তাহার বাম বক্ষে কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার সঞ্চার হয়। ইহার উপর যখন বিলাসিনীর বিলাসবৈভবপূর্ণ যৌবন-সৌরভ তাহার হৃদয়কে উন্মত্ত করে—যখন তাহার সেই অযাচিত অনুগ্রহ—স্বেচ্ছায় গৃহীত আত্মনিগ্রহ স্মরণ হয়, তখন তাহাকে আর মানুষ বলিয়া মনে হয় না—মনে হয়, তাহার দুঃখের অনন্ত পারাবারের আশ্রয়—তাহার উদ্দেশ্যহীন নিরাশ জীবনের যাতনাময় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে শান্তি-বিধায়িনী সখী ও সহচরী—তাহার ঘোর কঠোর পরীক্ষাপূর্ণ সংসার শরশয্যা-পার্শ্বে সুখদাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা বলিয়া তাহার মনে হয়; আর অমনই সেই বিয়োগবিধুরা অবলার নিকটস্থ হইবার জন্য, সে কেমন আছে, কি করিতেছে, কি অবস্থায় তাহার দিন কাটিতেছে, জানিবার জন্য প্রাণের ভিতর একটা গভীর ইচ্ছার উদয় হয়। তাহার মনে হয় আসিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের দীর্ঘকালব্যাপী উপেক্ষার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া—সংসারে তাহার বিন্দু পরিমাণ সুখ সম্ভোগের সুবিধা ও সুযোগ থাকিলে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম না কেন? যখনই তাহার হৃদয়ে এইরূপ উচ্ছ্বাসপূর্ণ যাতনাদায়ক চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তখনই সে একাকী একান্তে বসিয়া অশ্রুপাত করে। যে যে দিন এরূপ ঘটে, সেই সেই দিন ভবানীপতি, যেন কোন দুর্লক্ষসূত্রে সমস্ত অবগত, তাই অপরাহ্নে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময়ে কমলকুমারের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করেন এবং এরূপ ভাবের উপদেশ দেন যে, কমলকুমার গুরুদেবের অজ্ঞতার অন্তরালে নিজকে লুকাইতে অসমর্থ হইয়া নতমস্তকে নীরবে বসিয়া থাকে এবং গুরুদেবের মধুমিষ্ট সম্ভাষণপূর্ণ উপদেশে হৃদয় আর্দ্র হইলে নতমস্তকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এইরূপে ভবানীপতির আনুগত্য স্বীকারে ও অনুগ্রহ লাভে কমলকুমার ক্রমে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনে অধিকতর সক্ষম হইতে লাগিল। গুরুদেবও প্রীতমনে এই পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্রের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে অধিকতর যত্ন তৎপর হইলেন; কিন্তু প্রবল প্রবৃত্তি পরিচালিত মানবমন সহজে সুপথে চলিতে পারে না। বহু সাধন ও সংযমের প্রয়োজন, বিশেষতঃ সুন্দরীর ন্যায়, বিলাসিনীর ন্যায়, কমলকুমারেরও জীবনের কোন সাধই পূর্ণ হয় নাই, তাই তাহার হৃদয়নিহিত অশান্তিরমাত্রা এত উগ্র, আর তাই তাহাকে

অত সহজে কাতর ও অধীর করিয়া ফেলে। কিন্তু ভবানীপতির স্নেহপূর্ণ, প্রিয়-দরশন ও সৌম্য মূর্ত্তি যুবকের যৌবনসুলভ চিত্তচাঞ্চল্যের উপর সহানুভূতিপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিণতির উপযোগী উপদেশ দান দ্বারা এবং সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া নিজের আচার আচরণ দ্বারা, তাহার হৃদয়ে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি, আপনার সুখ-চিন্তা অপেক্ষা অন্যের সুখ সুবিধা সাধনের প্রতি, অধিকতর মনোযোগ দানে উৎসাহিত করিতেছেন। কমলকুমার গুরুদেবের এতাদৃশ ধর্ম্মানুমোদিত উচ্চ চরিত্রের আদর্শ লাভ করিয়া তাহার অনুকরণে ধীরে ধীরে আত্মোন্নতি সাধন করিতেছে। তাহার হৃদয়জাত অনুরাগের প্রস্ফুটিত কুসুমকেশরে ভবানীপতির উচ্চ জীবনের আধ্যাত্মিক-সৌরভ-কর নিপতিত হইয়া যে পবিত্র আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছে, তাহারই বলে কমলকুমারের জীবনে অপূর্ব্ব ধর্ম্মধন ফলিবে, ভবানীপতি ধীরে ধীরে তাহারই সূত্রপাত করিতেছেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বেণী তীর্থে।

রামেশ্বরের গুরুপুত্র ভবানীপতি ভট্টাচার্য্য ছয় বৎসর হইল সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে বিধিপূর্ব্বক বাণপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। যে সাধু-সন্ন্যাসীপ্রবর ভবানীপতির বানপ্রস্থের পথ-প্রদর্শক, তিনি লোকালয়ের কোথাও দীর্ঘকাল বাস করেন না। তীর্থ হইতে তীর্থান্তর পর্য্যটন ও সাধু সজ্জনের ধর্ম্মলাভে সহায়তা করা তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আর পথে বিপন্ন পথিক, অসহায় স্ত্রীলোক ও পীড়িত জনগণের সেবা, সুখ ও সুবিধা সাধনে সহায়তা করাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত।

ভবানীপতি তাঁহার গুরুদেবের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য লোকহিত সাধনেও আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে একদিন গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে পত্রাদি প্রদান বা সংবাদ দিবার অন্যান্য সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত নাই, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুরু কখন্ কোথায় অবস্থান করেন এবং কোন্ সময়ে, কোথায় কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাহা জানাইবার কোনরূপ অসুবিধা হয় না। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীসম্প্রদায় মধ্যে সাধারণের অজ্ঞাত এক বিচিত্র উপায়ে পরস্পরের হৃদয়ের আদান প্রদান ও সহকারিতা চলিয়া আসিতেছে।

ভবানীপতি সাগরে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া সশিষ্য কমলকুমারকে সঙ্গে লইয়া

পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। তথায় ফাল্গুণী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। ইত্যবসরে সম্ভব হইলে বিলাসিনীর সমভিব্যাহারী শিষ্যদ্বয় আদিষ্ট কার্য্য যথাবিধি পালন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গুরুদেবের সহিত মিলিত হইবে, তাহাদের প্রতি এইরূপ আদেশ আছে।

কমলকুমার পিতৃদেবের গুরুপুত্রের সঙ্গ ও আশ্রয় লাভে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। ভবানীপতির আদেশে কমলকুমারের উপস্থিত কাজ দুটী। প্রথম কার্য্য, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শুদ্ধ শরীরমনে ভবানীপতির পূজার আয়োজন করা; অপর কার্য্য, অপরাহ্ণে তাঁহার নিকটে বসিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ। এই ভাবে দিনের পর দিনক্ষয়ে ফাল্গুণের পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলাচলের লোকলীলার অন্তরালে লুক্কায়িত সৌম্যসুন্দর সাধু সমাগমজাত দেবলীলা দর্শন না করিলে সকলই পণ্ডশ্রম। ধর্ম্ম কর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানাদিতে যাহারা সন্তুষ্ট, তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝে না—বুঝিতে চেষ্টাও করেনা, কিন্তু যাহারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তুর জন্য লালায়িত, দৈবানুগ্রহে এই সকল স্থানের সাধুমণ্ডলীর সংস্পর্শ লাভে তাহাদের প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণের—সেই মহামূল্য বস্তু লাভের সুযোগ ঘটিয়া থাকে।

এই অল্প দিনের মধ্যে কমলকুমারের মুখে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয়ের শান্তিতে শরীরের কান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার বিপদরুদ্ধ যৌবন-সমাগম দুঃখের শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া পূর্ণ শোভায় ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে একদিন ভবানীপতি অপরাহ্ণে শাস্ত্রচর্চ্চা ও উপদেশ দান কালে কমলকুমারকে বলিলেন "বৎস! আজ প্রাতঃকালে পূজার আয়োজনের সময়ে তোমার মুখাবলোকন করিয়া আমার প্রাণে গভীর প্রীতির উদয় হইয়াছিল। তোমার প্রকৃতিতে তোমার স্বর্গীয় পিতার চরিত্র ও নিষ্ঠা প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়া, আমি গভীর আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। কাঞ্চন কুস্থানে পড়িলেও তাহার মূল্য হ্রাস হয় না। অবস্থা বৈগুণ্যে তোমার আচরণে যে মলিনতা মিশিয়াছিল, দেবপ্রসাদে তাহা দূর হইতেছে। ক্রমে তুমি মলামুক্ত হইয়া আপন প্রকৃতির অনুরূপ রীতি নীতির পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেছ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি শীঘ্র মন্ত্রগ্রহণের উপযুক্ত হও।" কমলকুমার নীরবে সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইল।

এই ভাবে কমলকুমার, ভবানীপতির সেবকরূপে পঞ্চবটী, বিন্ধ্যাচল, মথুরা ও বৃন্দাবন, ভ্রমণ করিয়া প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া প্রয়াগে পৌঁছিতে প্রায় একবৎসর কাল চলিয়া যায়। শরতের সৌরকর যখন কৃষকগণের বহু শ্রমের ফলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সকলের কোমল কান্তি বৃদ্ধি করিতেছিল—খরকরজাল যখন কণকান্ত শস্যক্ষেত্রে স্নিগ্ধ সুন্দর উত্তাপ ঢালিয়া উৎপন্ন ফল পরিপক্ক করিতেছিল—প্রকৃতির চারিদিক যখন মধুর মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতেছিল—ধরা যখন দিনেরেতে সুখের হাসি হাসিয়া আটখানা, তখন সেই সুখপূর্ণা—শান্তিময়ী ধরাবক্ষে ক্লান্ত পাদবিক্ষেপে ভবানী-পতির শিষ্যদল ভাদ্রের শেষভাগে বেণীতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরদিন প্রয়াগের নানা স্থানে প্রচারিত হইল, বেণীঘাটে এক ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন, তিনি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক। তাঁহার শিষ্যেরাও "এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ্" দলের যাহার মুখের দিকে তাকাইবে, তাকেই সাধু, সজ্জন, সরল ও অমায়িক লোক বলিয়া মনে হইবে, যাকে দেখ্‌বে তাকেই ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা হইবে। এরূপ সংবাদ প্রচারের ফলে তীর্থ পর্য্যটনকারী ও এলাহাবাদের অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। একদিকে সেই সুপুরুষের সৌম্যমূর্ত্তি, শান্ত স্বভাব, মিষ্ট কথা শুনিয়া লোক মোহিত হইতে লাগিল; অপর দিকে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে লোক অধিকতর চমৎকৃত হইল। সেই অসংখ্য লোকমণ্ডলীর মধ্যে আবার যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু ও সৎকর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা বার্ত্তায় তাঁহাদের সুখের সীমা রহিল না। অনেক গৃহস্থ তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অনেক ভক্তিমান সম্পন্ন গৃহস্থ তাঁহার কার্য্যে অর্থানুকূল্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি বলিতেন "দরিদ্রান্ ভর—মা প্রজচ্ছেশ্বরে ধনম্"—"আমার কিছুরই অভাব নাই। ভাই যাহার নাই তাহাকে দাও"। কিছুদিন কুশলে ও শান্তিতে প্রয়াগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বেণীতীর্থ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মানবের বুদ্ধিকৌশল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশে বেণীতীর্থ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয়েরই প্রতি পূর্ণ অনুরাগের সৃষ্টি করে। যাহার অনুকরণে কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ গঠিত হইয়াছিল,

সেই অজেয় দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাচীরের তলদেশ ধৌত করিয়া জাহ্নবী—যমুনা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহারই বা শোভা কত? শ্যামপ্রিয়া শ্যামসলিলা যমুনা, যেখানে ভূতভাবন ভবানীপতির জটা নিঃসৃত মন্দাকিনীর শুভ্রধারায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে—যেখানে হরি—হর পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়াছেন—যেখানে শাক্ত বৈষ্ণবের মিলন হইয়াছে। সেই শোভন দৃশ্য মহাতীর্থে শারদীয় পূর্ণিমায় কমলকুমার ভবানীপতির বিশেষ কৃপায় মন্ত্র গ্রহণ করিল—তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত হইতে পাইয়া সে কৃতার্থ হইল ও অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল। মন্ত্রগ্রহণের সময়ে কমলকুমার জানিতে পারিল তাহার গুরুই এক আশ্চর্য্য উপায়ে তাহাকে বজবজ হইতে সাগরে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি দৈবশক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ।

অদ্য কোজাগর পূর্ণিমার সন্ধ্যা—সন্ধ্যার সময়ে ভবানীপতি শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া তীর্থতটে উপবেশন করিয়াছেন। বামে জাহ্নবীজলে সৌরকর ত্বরিতগতিতে লুকাইতেছেন, দক্ষিণে যমুনা-পুলিনে শরতের পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশপ্রান্তে দেখা দিতেছেন, ক্রমে কৃষ্ণকায়া যমুনা-সলিলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের সে মুখমাধুরী শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। এক সময়ে একদিকে একের তিরোধান, অন্যদিকে অপরের অভ্যুদয় সর্ব্বদা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। ভবানীপতি প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে বামে ও দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া, মধুর হাসি হাসিয়া শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ দেখ, ধরণী আজ কি সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পশ্চিমাকাশের প্রান্ত দেশে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কে যেন শয়ন করিতেছেন, আবার পূর্ব্ব গগনে প্রকৃতির মাধুরী-লীলার অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠিতেছে। ভূতপতি ভগবান এমনই করিয়া নিয়ত লীলা করিতেছেন। যাহার চক্ষু আছে, সে দিনে দিনে—ক্ষণে ক্ষণে, এইরূপ লীলা-তরঙ্গে তাঁহারই অঙ্গুলিসঙ্কেত সন্দর্শনে প্রীত মনে তাঁহাকেই প্রণাম করে। বিধাতার এই লীলাখেলা ধার্ম্মিকের হৃদয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব—ধর্ম্মভাব—কবির হৃদয়ে কল্পনার কোমল ভাব সঞ্চারিত করে—সাধুর হৃদয়ে স্বর্গীয় সুধার ধারা সিঞ্চন করে—বলিতে বলিতে ভবানীপতি নীরব হইলেন। তাঁহার মুদিত নয়নপ্রান্ত হইতে জাহ্নবী ও যমুনার ন্যায় দুটী ধারা প্রবাহিত হইল।
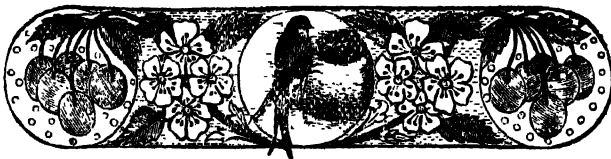
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শনে।

বিলাসিনী সাগর হইতে সেই যে পীড়িত হইয়া আসিয়াছে, সেই যে শয্যাগত হইয়াছে, তাহার পর একদিন দুদিন করিয়া অনেক দিন অতীত হইয়াছে—কিন্তু এখনও সে প্রকৃতিস্থ হইল না। তাহার কি পীড়া, কোথায় সে পীড়ার বসতি, কেহই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। ডাক্তার কবিরাজ দেখিল, ঔষধ-পত্রও হইল, সেবা শুশ্রূষারও অভাব নাই, কিন্তু বিলাসিনীর শরীর দিন দিন ভগ্ন ও অধিকতর রুগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয়ের আবেগে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বিলাসিনীর অবসন্ন শরীর যখন শয্যায় মিশিয়া যায়—ক্লান্ত হৃদয় মনের ভার বহনে অসমর্থ হইয়া সে যখন নয়ন মুদ্রিত করে—দারুণ মর্ম্মবেদনার পরিচায়ক সর্ব্বাঙ্গব্যাপী একটা ভয়ানক উত্তেজনা যখন তাহার শরীরে প্রকাশ পায়; তখন তাহাকে শয্যাতে শায়িত রাখা কঠিন হইয়া পড়ে—সে ভীষণ যাতনার পরিচায়ক হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস শ্রবণ করিয়া ও সিক্তনয়ন প্রান্তে অশ্রুধারা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। এইরূপ অবস্থা দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার হইবেই,—কথন কথন দুই তিনবারও হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনার সময়ের কোন স্থিরতা নাই।

নবীন সন্ন্যাসীদ্বয়ের যিনি পুরুষোত্তমে গুরুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার নাম সুকণ্ঠ। যিনি বিলাসিনীর রোগমুক্তির সংবাদ লইয়া যাইবেন বলিয়া

উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সুকর্ম্মা। ছয়মাস অতীত হইয়া গিয়াছে এখনও তিনি বিলাসিনীর আরোগ্য সংবাদ লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যত বিলম্ব হইতেছে ততই তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিলাসিনীর মা বিবিধ রোগের ঔষধ জানিলেও, নানাপ্রকার মুষ্টিযোগ প্রয়োগের সামর্থ্য থাকিলেও, প্রাণসমা কন্যার পীড়ায় সে সকলের কার্য্যকরী শক্তি বিফল হইয়াছে। তুকৃতাকে—মুষ্টিযোগে এ রোগের কিনারা হইবার নহে। বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি পূর্ব্ব হইতেই ক্ষীণ হইয়াছিল, এখন কাঁদিয়া চক্ষু দুটী একবারেই দৃষ্টিশক্তিশূন্য হইল। কমলকুমারকে বৃদ্ধা পুত্রাধিক স্নেহ করে, তাই বৃদ্ধার মুখে তাহার বিরুদ্ধে ভ্রমক্রমেও তিরস্কার, নিন্দা বা রূঢ় কথা বাহির হয় না। কেবল কন্যার দুঃখে, কন্যার বিপদে, কন্যার রোগে, কন্যাগতপ্রাণা জননী কাতরা, তাই নিয়ত অশ্রুপ্লাবিতা। সাত মাস চলিয়া যায়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। এই সময়ে, একদিন সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধা সুকর্ম্মাকে বলিল "ঠাকুর এমনই ভাবে মেয়েটাকে নিয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কি আমার শেষের দিন কয়টা কাটিবে?

সু। তাই ত, আমিত কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

বৃ। হয় আপনি আপনার ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞাসা করুন, নাহয় আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমার মেয়ের রোগ সারে, তার উপায় করি।

"যাতে আমার মেয়ের রোগ সারে, তার উপায় করি।" মায়ের এই কয়টী কথা বিলাসিনীর বিষাদস্থির গম্ভীর হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিল। তাড়িত-শক্তি প্রবিষ্ট মানব-শরীরের উত্তেজনার ন্যায় বিলাসিনীর সমগ্র শরীর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু রোগের উত্তেজনার ন্যায় বহুক্ষণব্যাপী না হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। অতি ধীরে অঙ্গুলি সঙ্কেতে মাকে নিকটে ডাকিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া, চুপে চুপে কাণে কাণে বলিল "উপায় যদি করিতে চাও, তবে প্রয়াগে চল। কাল রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিছি, সেখানে গেলে আমার সকল [illegible] সারিয়া যাইবে। যদি পার, আর ইচ্ছা হয়, তবে যাইবার আয়োজন কর, কিন্তু এই সন্ন্যাসীকে এ কথার কিছুই বলিও না।" মেয়ে এতদিন পরে ডেকে কথা কয়েছে, এতেই বৃদ্ধার আর আনন্দের সীমা রহিল না। বৃদ্ধা বুদ্ধিমতী ও

সাবধান, তাই কন্যার সহিত কথাবার্ত্তার একটী কথাও সন্ন্যাসীকে বলিল না—চুপ করিয়া রহিল।

স্থ। রোগী তোমাকে কি বলিল? এতদিন গিয়াছে, এক দিনও ত এরূপ ভাবে ইহাকে কথা বলিতে দেখি নাই।

বৃ। উহার কথা এত জড়ান যে ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

স। এটাকে ত আরোগ্যের লক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়?

বৃ। হ্যাঁ বাবা, তাই বোধ হয়, তাই এত দিনের পর আমার একটু আশা হ'লো যে মেয়েটা বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারে। হে হরি! রক্ষা কর, হে বাবা-ঠাকুর! রক্ষা কর, হে বাবা সত্যনারায়ণ! আমার অন্ধের চক্ষু, শেষ জীবনের একমাত্র সুখ ও সম্বল রক্ষা কর, তোমাকে সিন্নি দিব। হে মা কালি! আমার বাছাকে রক্ষা কর, আমি গরিব তবুও তোমাকে রূপার বিল্বপত্র আর জোড়া পাঁটা দিয়ে পূজা দিব। মা—গো—রক্ষা কর।

বিলাসিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার কথা কহিবার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। তাই প্রকৃতিস্থ থাকিলে,নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা দৈবাৎ ইঙ্গিতেই কহিয়া থাকে। কিন্তু ঐ ঘটনার পরের কয়েক দিনে তাহার মায়ের গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা, প্রতিবেশিগণের সহিত মায়ের কথাবার্ত্তার ভাব ভঙ্গিতে বুঝিয়াছে যে,তাহার মা দীর্ঘকালের জন্য কোথাও যাইবার আয়োজন করিতেছে—তাই সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিনীর হৃদয়ের লুপ্ত আশার পুনঃসঞ্চার ও ভগ্ন হৃদয়ের পুনর্গঠন হইতেছে। তাই সে অল্পে অল্পে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই ভাবে ভাদ্র শুক্লপক্ষও অতীতপ্রায়। সন্ন্যাসী বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমার কন্যা এখন আরোগ্য লাভ করিতেছে, আমি কি বিদায় হইতে পারি?"

বৃ। হ্যাঁ বাবা, আপনি এখন যেতে পারেন।

স। আমার প্রতি গুরুদেবের আর এক আদেশ আছে।

বৃ। আমাদের সম্বন্ধে?

স। হাঁ।

এই কথা শুনিয়া ভয়ে বিলাসিনীর গায়ে কাঁটা দিয়াছে। জননী বিভক্ত অধরওষ্ঠে—বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "কি বাবা, আবার কি আদেশ আছে?"

স। তিনি সাগর হইতে চলিয়া যাইবার সময়ে, আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছিলেন,আমি তাহা করিয়াছি। এখন আমার যাওয়ার কোন বাধা নাই, তবে আমার শেষ এবং বিশেষ কাজ এই যে, তিনি কমলকুমারকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাইবার সময়ে,এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি নিজে উপযুক্ত সময়ে এই বজবজে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। যতদিন এই থানে তাঁহার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন তোমাদিগকে এই থানেই থাকিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন; আরও বলিয়াছেন, "কোনমতে ইহার অন্যথা না হয়, অন্যথা হইলে অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।"

এই সংবাদে বিলাসিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তাহার মাও চারিদিক অন্ধকার দেখিল। কিন্তু নিরুপায়। কারণ কমলকুমার ব্রহ্মচারী ভবানীপতির সম্পূর্ণ অধীন, তাহাকে পাইবার প্রত্যাশা রাখিলে, ভবানীপতির বিরাগভাজন হওয়া কোন মতেই বুদ্ধির কাজ হইবে না। কাজেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধা তাহাতেই প্রকারান্তরে সম্মত হইয়া বলিল "আমি আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় এই থানেই অপেক্ষা করিব।" নবীন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার মিলনে।

কোজাগরের পূর্ণিমার সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। রূপার থালের ন্যায় সুন্দর চাঁদখানি আকাশের পথে ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতেছে, কিন্তু আরও কতকদূর অগ্রসর হইলে, আজিকার চাঁদের বড় বিপদ। রাত্রি দশ দণ্ডের পর একাদশ দণ্ডের মধ্যে, মধ্য গগনে, সহসা চাঁদের পীড়া উপস্থিত হইল। চাঁদ কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টার রব ও জন-কোলাহল উত্থিত হইল। আজ চন্দ্রগ্রহণ, তাই বেণীঘাটে ভয়ানক ভিড়। অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বরে তীর্থতট পূর্ণ হইয়া গেল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার সংবাদ লয়, তাহার স্থিরতা নাই। নানা দেশীয় লোকের সমাগমে একদিকে যেমন তীর্থ-মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইরূপ অপর দিকে আবার এই বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী, বিভিন্ন মূর্ত্তি, বিভিন্ন রীতিনীতির অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের সমাগমে বেণীতীর্থ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে! ইহার উপর কণামাত্রে ক্ষয়প্রাপ্ত শরতের পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাসুধা বর্ষণ করিয়া জাহ্নবী-যমুনা-সঙ্গম ততোধিক মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

ভবানীপতি স্নানার্থে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যেরাও অনেকে স্নান করিতেছে। কেবল কমলকুমার এখনও তীরে দণ্ডায়মান। সে তাহার গুরুদেবের পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া, স্নানান্তে তাঁহার পরিধানের গৈরিক ও উত্তরীয় লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তিনি উঠিলে সে স্নানার্থে অবতরণ করিবে। এমন সময় এক দল লোক কমলকুমারের বাম পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থে

অগ্রসর হইতেছে। সেই দলের দুই তিন জন লোক দুই তিন বার সন্ন্যাসীর বেশধারী যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। দুই এক পা অগ্রসর হইয়া দলের একটী স্ত্রীলোক পশ্চাতে—কমলকুমারের চন্দ্রালোকে আলোকিত মুখের দিকে ফিরিয়া তাকাইল—তাকাইয়া চমকিত হইল—পার্শ্ববর্ত্তিনী অপর এক স্ত্রীলোককে চুপে চুপে কি জিজ্ঞাসা করিল—তখন বয়স্কাও একবার সেই যুবকের মুখের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু নিশ্চিতরূপে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদের স্নানের সময়—তাঁহারা স্নানার্থে জাহ্নবী-সলিলে অবতরণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নবীনা ও প্রবীণা উভয়েরই মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছে। এই ব্যক্তি সত্য সত্যই তাঁহাদের সন্দেহের পাত্র কি না, কিরূপে জানিতে পারিবেন, এই চিন্তা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। চন্দ্রালোক ক্রমে ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিল, কাজেই আর মুখ দেখিয়া চিনিবার কোন উপায় রহিল না। শেষে গোলমালে কে কোথায় গিয়া পড়িবে, এই ভাবনার ভারে যখন ঐ নবীনা রমণীর চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল—যখন তাহার শরীর অবসন্ন ও হৃদয় বিকল হইয়া পড়িতেছিল—শীতল সমীরধৌত সলিল স্পর্শেও যখন সেই যুবতীর ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল, ঠিক সেই সময়ে যুবকের গুরুদেব ভবানীপতি স্নানান্তে উপরে উঠিতে উঠিতে অতি মিষ্ট স্বরে ডাকিলেন "কমলকুমার! কমলকুমার—তুমি কোথায়? আমার পরিধেয় ও উত্তরীয় দাও, দিয়ে তুমি স্নান কর।" গুরুমুখে এই 'কমলকুমার' নাম উচ্চারিত হইতে না হইতে, স্নানার্থে সলিলপ্রবিষ্টা যুবতী শক্তিশূন্য—অবলম্বনশূন্য—চেতনাশূন্য হইয়া পড়িল, প্রবীনাও 'কমলকুমার' নাম শুনিয়া এবং কন্যার অবস্থা দেখিয়া অতি কাতর স্বরে বলিলেন "একি হ'লো—কে ধর্‌বে—গা—ওমা—ওমা কি সর্ব্বনাশ, আমার মেয়ে যে জলে ডুবে গেল—কি হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কে ধর্‌বেগো।" "আমার মেয়ে যে জলে ডুবে গেল" রমণী-কণ্ঠের এই কাতরতামাখা বিপদবার্ত্তা কমলকুমারের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে, কমলকুমার গুরুদেবের হাতে কাপড় দিয়া এক লম্ফে জলে ঝাঁপ দিল। গুরুদেব কমলকুমারের এরূপ চঞ্চল গতি, এরূপ ব্যস্ততা, ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। কমলকুমারের জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপতিও শুনিলেন যে

একটী মেয়ে জলে ডুবে গেছে, শুনে বড় ভাবনা হইল, আবার কমলকুমার অত ত্বরিত পদে জলে ঝাঁপ দিয়াছে শুনিয়া, আনন্দিতও হইলেন। এক দিকে কমল-কুমারের এরূপ সাহস ও সত্বরতা, অপর দিকে একটী অসহায়া স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়াছে, কমলকুমারের যত্নে রক্ষা পাইবে, এই উভয় চিন্তা গুরুদেবের প্রাণে প্রীতির উদয় করিয়া দিল। পরক্ষণেই শুনিলেন মেয়েটী ডুবে স্রোতে অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া সেই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর জন্য ও পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র কমলকুমারের জন্য তাঁহার ভাবনা বাড়িয়া গেল, কিন্তু সে যুবক সাঁতার দিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়াছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহাকে সামলাইতে পারিতেছে না শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন বটে কিন্তু তখন আর উপায় নাই।

কমলকুমার বহু কষ্টে তাহাকে জলের উপর রাখিতেছে মাত্র, সে স্ত্রীলোক মৃত কি জীবিত তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। এইরূপে তাহাকে জলের উপর ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর গিয়া পড়িল। বহুক্ষণ এইরূপে অপর এক-জনকে লইয়া সাঁতার দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর নিজেকেও রক্ষা করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে তীরে কয়েকখানা নৌকা বাঁধা দেখিয়া ডাকিয়া বলিল "ভাই, না পর কই হায় ত হামলোগোকো উঠায় লেও।" এই বিপদবার্ত্তা শুনিয়া একখানা নৌকার মাঝি মাল্লারা নৌকা ছাড়িয়া আসিয়া ইহাদিগকে তুলিল। কমলকুমার নেয়েকে বলিল "ভাই যব্ মেহেরবাণী কর্‌কে উঠায়া, তব্ তীর্থঘাট্‌মে পৌছায় দেও, তোমারা বক্‌সিস্ মিলেগা।" তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া কমলকুমারের নির্দ্দেশ মত চলিল। পশ্চিমে নৌকা, স্রোতের বিপরীতে বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল। মাঝি জিজ্ঞাসা করিল "বাবু এ জননা আপ্‌কো কোন্ লাগ্‌তা হায়?" কমলকুমার বলিল "ভাই, এভি হামারা মাফিক মুসাফির হায়—আস্নান্ করনে আয়া রহা।"

কমলকুমার নৌকার একজন লোককে একটা আলো আনিতে বলিল। পশ্চিমে নৌকার বিচিত্রমূর্ত্তি প্রদীপের মিড়মিড়ে আলোটী আনিবামাত্র কমল-কুমার দেখিল পূর্ণযৌবনা রমণীর রূপে চারিদিক আলো করিয়াছে। সে বিধবা কি সধবা বুঝা যায় না। দ্বিতীয়বার তাকাইতে মুখখানি দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন,তাহার পরিচিত মুখ।এরূপ সুন্দরী বিধবা যুবতী তাহার পরিচিত,এই কথা

ভাবিতে প্রাণে কেমন একটা ক্লেশ ও ভয়ের সঞ্চার হইল—বুকের ভিতর বেগে শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তৃতীয়বার যুবতীর মুখের দিকে তাকাইয়াই শিহরিয়া উঠিল—ভয়ে ও যন্ত্রণায় কমলকুমার কেমন বিমর্ষ ও বিবর্ণ হইয়া গেল। সাহসে ভর দিয়া চতুর্থবার রমণীর মুখের দিকে তাকাইতে কমলকুমারের চক্ষু দুটী জলে পূর্ণ হইয়া গেল! অতি কাতরভাবে প্রদীপধারীকে আরও নিকটে আসিতে বলিল—দুঃখে অভিমানে ও হৃদয়ের যাতনায় যুবক ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে যুবতীর মুখখানি সোজা করিয়া দিয়া বার বার ডাকিয়া বলিতেছে, সুন্দরী—ও সুন্দরী—দেখ—দেখ, একবার চাহিয়া দেখ, তোমার শৈশব-সহচর তোমার আদরের কমলকুমার তোমার কাছে বসিয়া তোমাকে আদর করিয়া ডাকিতেছে। সুন্দরীর পলক পরিমাণ চৈতন্য হইল। স্পর্শমণির স্পর্শলাভে লৌহ যেমন স্বর্ণ হয়, সংসার-পীড়নরূপ রূপার কাঠির বিচিত্র শক্তি প্রয়োগে মৃতব্যক্তি, সোণার কাঠির ইন্দ্রজাল-বলে যেমন জীবন লাভ করে, তদ্রূপ হৃদয়মণির স্পর্শ-সুখ লাভে সুন্দরীর অচেতন জড়বৎ দেহে জীবন সঞ্চার হইল। শরতের আকা-শের পূর্ণচন্দ্র যখন রাহুমুক্ত হইয়া বিমল জ্যোৎস্না-ধারায় চারিদিক ভাসা-ইতেছে—হাসাইতেছে—যখন আঁধারমুক্ত ধরা শশধরের নীরব প্রীতিমাখা শুভ্র হাসির হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে—সোহাগিনী প্রকৃতি যখন এই সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া হাসিয়া আটখানা, তখন সেই মুক্তাকাশতলে পুণ্যসলিলা জাহ্নবীবক্ষে মলামুক্ত—রাহুত্যক্ত শরতের চন্দ্রমাধারাসিক্ত সুন্দরী সতৃষ্ণ কাতর দৃষ্টিতে একটীবার তাকাইল—অতি মধুর—সুন্দর দৃষ্টিতে সুন্দরী তাকাইল—সুন্দরী শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি করিল—বিধুভূষণের প্রতি যে শুভদৃষ্টির জন্য সকলে সাধ্য সাধনা করিয়া হার মানিয়াছিল, আজ পুণ্যধামে পুণ্যক্ষণে জড়পদার্থবৎ সুন্দরী যেন কোন যাদুকরের ইঙ্গিতে লোচন-সুধা বিতরণ করিল। কিন্তু সে পলকের জন্য। সে দৃষ্টিপাত অনুরাগীর হৃদয়ে কত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল, কে বলিতে পারে? কত অনুরাগ, অভিমান, অনুযোগ পলকে প্রলয় সাধন করিয়া গেল, কে বলিতে পারে?—কত দুঃখ যন্ত্রণা, কত মনস্তাপ, কিরূপ মর্ম্মব্যথার আভাস দিয়া গেল কে বলিতে পারে?—জাহ্নবী-বক্ষে সুন্দরীর মুদ্রিতনয়ন মুখকমল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল—যেন মন্দাকিনী-বক্ষে কমলিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে—অথবা শৈলজা ক্রোড়ে কমলা নিদ্রিতা বলিয়া বোধ হইতেছে। কাহার সহিত কাহার

তুলনা করিবে কমলকুমার তাহা বুঝিল না। আজ সুন্দরীই তাহার পূর্ণিমার রাত্রি, আজ তাহার জীবন-সংগ্রামে, জীবনের সর্ব্বস্ব ধন—পূর্ণিমার চাঁদ সংসার-মরণ রাহুর অনন্ত অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার জীবন-মরুক্ষেত্রে সুধা বর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু হতভাগ্য কমলকুমারের,আজ এই নির্জ্জনে—এই মধুর মিলনে—হৃদয় ভরিয়া সে সুখ-সুধা পান করিবারও অবসর নাই—তাহার সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী স্বর্গ-সুখ ফুরাইল, তাহার আর ভাবিবারও সময় রহিল না। সে আত্মবিস্মৃত। সুন্দরী সধবা কি না, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, সিঁতায় সিন্দুর-বিন্দু নাই, সধবার দ্বিতীয় লক্ষণ বাম হাতে লোহবেড়ও * নাই, সুতরাং সুন্দরী সধবা নহে। কমলকুমার যখন সুন্দরীকে হয় অবিবাহিতা, না হয় বিধবা স্থির করিতেছে, তখন নৌকা আসিয়া বেণীঘাটের একপার্শ্বে লাগিল।

* প্রাদেশিক ভাষায় ইহাকে কোথাও 'খাড়ু' কোথাও 'নোয়া' বলিয়া থাকে।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী রোগ-শয্যাতে।

গঙ্গাধর বহুবিধ উপায়ে সুন্দরীর সুখ-সাধনে ব্যস্ত, বহু চিন্তার পর তিনি তীর্থ দর্শন ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানই প্রশস্ত উপায় স্থির করিয়া, সুন্দরীর শ্বশুর নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া শ্রীধরপুরের বাটীতে আনাইলেন। নবীনকৃষ্ণ স্বীয় স্নেহপ্রবণতা বশতঃ সর্ব্বদাই কনিষ্ঠ পুত্রবধূর সংবাদ লইয়া থাকেন এবং ইচ্ছা হইলেই দেখিতে আসিয়া থাকেন। সংবাদ পাইবামাত্র নবীনকৃষ্ণ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গঙ্গাধরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সাক্ষাতের ফলে নবীনকৃষ্ণও, গঙ্গাধরের সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

গঙ্গাধর, পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে সঙ্গে লইয়া নবীনকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া, আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগেই তীর্থযাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। পথে একদিন নবীনকৃষ্ণকে বলিলেন, "গয়াতীর্থে পিণ্ডদানের প্রশস্ত সময়ই আশ্বিনের অমাবস্যা। এই সময়ে গয়াতীর্থে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ বিশেষ প্রশস্ত।" * গয়াধামে শৈলে শৈলে পিণ্ডদান সমাপন করিয়া এই ক্ষুদ্র যাত্রীদল কাশীধামে যাত্রা করিল। সেখানে ইহারা মণিকর্ণিকাস্নান—বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন ও অন্যান্য তীর্থানুষ্ঠান সমাপনান্তর কোজাগরের

* মীনেমেষে স্থিতে সূর্য্যে কন্যায়াং কার্ম্মুকেঘটে।
দুর্ল্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়ায়াং পিণ্ড পাতনং॥—বায়ুপুরাণ।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে প্রয়াগধামে উপস্থিত হন। সেখানকার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই পূর্ণিমা ও গ্রহণ। গ্রহণে নিগ্রহ ও তন্নিবন্ধন যে শুভ সম্মিলনের সংঘটন হইয়াছে, পাঠক তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়াছেন।

কমলকুমারের তীরে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই, গঙ্গাধর শুনিলেন যে জলমগ্না সুন্দরীর পশ্চাদ্ধাবিত যুবক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ভবানীপতির শিষ্য, নাম কমলকুমার। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত রামেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের একমাত্র সন্তান এখনও জীবিত এবং সাধু সঙ্গগুণে সজ্জন হইয়া উঠিয়াছে। এই সংবাদে গঙ্গাধর যুগপৎ হর্ষ বিষাদে আপ্লুত হইয়া গেলেন। দুটী চিন্তা সমান ভাবে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিয়া দিল। তিনি কাতর দৃষ্টিতে নবীনকৃষ্ণের দিকে তাকাইবামাত্র নবীন-কৃষ্ণ অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" তখন গঙ্গাধর পূর্ব্ববৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন। সুন্দরীর জননী মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের ন্যায় আনন্দের ধারা-সিক্ত মরুশুষ্ক হৃদয়ে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভবানীপতি জলমগ্না কন্যার আত্মীয়গণের অবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন ইঁহাদের কন্যাটীর উপস্থিত বিপদের পশ্চাতে আরও কিছু গূঢ় রহস্য আছে এবং বোধ হয় কমলকুমার সে রহস্যের নায়ক। তিনি সমস্যার এইরূপ সমাধান করিতেছেন, এমন সময়ে কমলকুমার তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নৌকা বাঁধিতে বলিল। কমলকুমার সর্ব্বাগ্রে গঙ্গাধরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নতমস্তকে পাদস্পর্শ করিয়া দাঁড়াইতে তিনি, অতি স্বাভাবিক ভাবে, অতি গভীর স্নেহভরে, যুবককে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া আর ছাড়িতে পারেন না। তখন ভবানীপতি অগ্রসর হইয়া এই নবীন প্রবীনের মিলন দর্শনে প্রীতমনে নিকটে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধের রুদ্ধ স্নেহের প্রবল স্রোতঃ আজ বিধি-নিষেধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। কমলকুমারের আজ আবার আর এক নূতন শিক্ষা লাভ হইল। বৃদ্ধের বিগলিত ও প্রবাহিত স্নেহের উত্তপ্ত ধারায় যুবকের জাহ্নবী-সলিল-সিক্ত শীতল পৃষ্ঠদেশ অমৃতধারা সিঞ্চিত হইতেছে। নবীনকৃষ্ণ অবাক—এই স্বর্গীয় দৃশ্যে সুন্দরীর মা বিস্ময়ে বিহ্বল—ভবানীপতি স্তম্ভিত! আকাশে রাহুমুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ—আর সুরধুনী-সৈকত ক্রোড়ে গঙ্গাধর-বক্ষে শনিমুক্ত কমলকুমার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। সুন্দরীর মা পলক মধ্যে শ্বশুরের পূর্ব্ব অনিচ্ছা ও উপস্থিত স্নেহ

প্রবণতা এই উভয়ের তাৎপর্য্য বুঝিবার পূর্ব্বেই কন্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাকে নৌকা হইতে নদীতটে উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া, গঙ্গাধর কমলকুমারকে ত্যাগ করিয়া পুত্রবধূর কার্য্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। সুন্দরীর মা নৌকায় কন্যার নিকটে গিয়া দেখিলেন, তাহার ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়িতেছে, দুই চক্ষের দুই প্রান্তে প্রবাহিত দুটি জলধারার রেখা বিদ্যমান, কিন্তু তাহার চেতনা নাই, ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না। সে অবস্থায় তাহাকে নৌকা হইতে নদীতটে নামান কোন মতেই পরামর্শসিদ্ধ নহে। ভবানীপতি ও নবীনকৃষ্ণের পরামর্শমত সেই রাত্রির জন্য নৌকাখানি ভাড়া করিয়া তাহারই আচ্ছাদিত অংশে বস্ত্রাদির দ্বারা কোন প্রকারে শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই তাহাকে রাখা হইল। সুন্দরীর মা রাত্রির অবশিষ্টাংশ কন্যার পার্শ্বে বসিয়া কাটাইলেন।

কমলকুমার, গঙ্গাধরের সহিত গুরুদেবের পরিচয় করিয়া দিয়া তাঁহার বিষয়ে দুই এক কথা বলিতে যাইতেছে, এমন সময়ে গঙ্গাধর যুবককে বাধা দিয়া বলিলেন "ভবানীপতির গুণগ্রামের কথা পূর্ব্ব হইতে শুনিয়াছি" এই কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া অতি বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া নবীনকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছেন দেখিয়া, কমলকুমার নৌকার উপর সুন্দরীর মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সেখানে তাঁহাকে নত মস্তকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সুন্দরীর মা অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন "বাবা! কেমন আছ?"

কমলকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণধারণ করিল ও মস্তক নত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন স্নেহের প্রতিমা মা বলিলেন, "বাবা তোমার জন্য কত কষ্টই যে পেয়েছি—সব ফুরাইয়া গিয়াছে। আর ফিরিবে না!"

সুন্দরী--বিধবা—চিরদুঃখিনী—মা—অনাথিনী—বৃদ্ধ গঙ্গাধর, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই সংসার-কীটদষ্ট কলিকা ক্রোড়ে লইয়া পথে পথে ঘুরিতেছেন! শুনিয়া কমলকুমার একবারে মর্ম্মাহত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল।

সু-মা। বাবা! তুমি কচি ছেলে, তোমার এ সন্ন্যাসীর বেশ কেন? কাল

সকালে আর এ পোষাকে আমার সাম্‌নে এস না। আমি তোমার মা—সন্ন্যাসীর বেশে মায়ের সাম্‌নে আস্‌তে নেই, ও পোষাক কালই বদ্‌লে ফেল্‌বে।

ক। মা, বিধাতার বিচার ঠিক। তিনিই আমাকে এই পোষাক পরাইয়াছেন। এখন এতেই আমার সুখ—এতেই আমার শান্তি লাভ হইবে। আমিও সংসারে আর অন্য কামনা কিছু রাখি না—আর রাখিবও না।

সু-মা। তুমি বেটাছেলে, তোমার ভাবনা কি? আমার মেয়ের চেয়ে কত ভাল মেয়ে আছে। তুমি কুলে শীলে, দেখ্‌তে শুন্‌তে সব রকমে ভাল, তোমার—তোমার আবার ভাবনা কি?

ক। আমার সব ভাল হয়েও বিধির বিপাকে এখন সবই মন্দ হ'য়েছে। শ্রীধরপুর ছেড়ে—আপনাদিগকে ছেড়ে—সেই যে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজও সে কান্না থামিল না, এ জীবনে সে কান্না আর থামিবেও না।

সু-মা। ছি বাবা, অমন কথা কি বল্‌তে আছে, তুমি ত আর মেয়ে নও, বেটাছেলে, তাতে কুলীন, একটার যায়গায় পাঁচটা বিয়ে হ'তে পারে, তোমার মুখে কি অমন কথা সাজে?

ক। মা! আপনার মেয়ের বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবনের সকল সাধ ফুরাইয়াছে। আমার অনেক দিনের এই সঙ্কল্প আজ এই পুণ্যতীর্থে শুভক্ষণে দৃঢ় হইল! সংসারে এমন লোক নাই যে আমার এই সঙ্কল্প উল্টাইয়া দিবে। আজ ৮ বৎসর একাকী সংসার-সাগরে ভাসিতেছি। ভাবিতাম, একদিন কূল পাইব। কিন্তু বিধাতা যখন আমার জীবনটাকে এই ভাবে ভাসাইয়া লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, তখন আমাকে আমার সেই পথে চলিতে দেওয়াই উচিত। আপনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, কিন্তু তাই বলিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যাঘাত জন্মাইবেন না। আমি এই ভাবেই এতদিন জীবন কাটাইয়াছি—এখনও তাহাই করিব।

গ। কি ভায়া—"এখনও তাহাই করিব।" কি করিবে?

সু-মা। কচিছেলে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজেছে। তাই তা ছাড়্‌তে বল্‌ছিলুম, তা শোনে না। বলে, এই ভাবেই জীবন কাটাবে!

গ। ব্রহ্মচারী ভবানীপতির সঙ্গে এখন এই কথাই হইল, তিনি উহার গুরু। বড় ভাল লোক, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক। তাঁহার মুখে উহার প্রশংসা ধরেনা।

সু-মা। কেন? সন্ন্যাসী হ'য়েছে ব'লে?

গ। না মা, সেজন্য নয়। ছেলে ভাল ব'লে। বুদ্ধিমান, শান্ত, ধীর ও ধর্ম্মানুরাগী ব'লে।

সু-মা। আমাদের কপাল মন্দ, তা না হ'লে অমন ছেলে পেয়েও পেলুম না।

গ। পেলেনা কিসে? এইত পেষেছ!

সু-মা। একে কি আর পাওয়া বলে?

গ। একেই পাওয়া বলে, আগে পেলে আর ওকে পেতে না।

এমন সময়ে নবীনকৃষ্ণের সঙ্গে ভবানীপতি সুন্দরীকে দেখিতে গেলেন। কমলকুমার সেস্থান ত্যাগ করিল। প্রদীপহস্তে গঙ্গাধর নিকটে বসিয়াছেন। ভবানীপতি সুন্দরীর অবস্থা বেশ সুন্দররূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "জ্বরের সম্ভাবনা আছে। আর নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, জ্বর হইলে, খুব বেশী জ্বর হইবে। তিনি তাহা নিবারণের চেষ্টা করিলেও তাহার নিবারণ হইল না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীর শরীরে প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাধর ও নবীনকৃষ্ণ।

ভবানীপতি, শিষ্যদলকে এলাহাবাদে রাখিয়া, পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, একাকী গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শোনপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় হরিহরছত্রে তীর্থস্নানের জন্য ও মেলা দেখিবার জন্য অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদিও বিক্রয় হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট হস্তী ও ঘোটক হরিহরছত্রের মেলায় পাওয়া যায়। ভবানীপতির গুরুদেব যোগাচার্য্য শাস্ত্রী, হিমালয়ের নিভৃত নিলয় হইতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলের সহজ পথে সমতলক্ষেত্রে অবতরণ ও লোকালয়ের মুখাবলোকন করেন। হরিহরে গঙ্গাস্নান করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর আবার নিজ অভি-প্রায় মত সময়ে হিমালয়াভিমুখে যাত্রা করেন।

যাইবার সময়ে, ভবানীপতি কমলকুমারকে গঙ্গাধরের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া গেলেন। তিনি যাইবার সময়ে সুন্দরীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সে তখনও শয্যাগত ও রোগক্লিষ্ট। সুন্দরীর সেবা-শুশ্রূষায় দূর হইতে সাহায্য করিবার অনুমতি থাকিলেও, সুন্দরীর নিকটস্থ হইতে কিম্বা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গুরুদেব কমলকুমারকে একবারে নিষেধ করিয়া

গেলেন। এবং বিশেষ ভাবে লেখা পড়ার কাজ কিছু দিয়া গেলেন, যাহা করিলে তাহার উন্নতি ও কল্যাণ হইবে।

নবীনকৃষ্ণ এই যুবকের প্রতি প্রথম দর্শন হইতেই পরিতুষ্ট। ক্রমে ইহার প্রতি আকৃষ্টও হইতেছেন। এই যুবকের সুন্দর মুখশ্রীতে প্রথম দর্শনেই যেমন সরলতামাখা সাহসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তেমনি ক্রমশঃ তাহার আচার আচরণে সচ্চরিত্রতা ও ব্যবহারে উদারতা দেখিয়া,দিন দিন তাহার প্রতি স্নেহের প্রবলতা অনুভব করিতেছেন। একদিন অপরাহ্নে কমলকুমার ভবানীপতির নির্দ্দেশমত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, সুন্দরীর মায়ের হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছে। নবীনকৃষ্ণ ও গঙ্গাধর বেড়াইয়া আসিয়া বাহির বাটীতে উপবেশন করিতেছেন দেখিয়া, সে সসম্ভ্রমে নতমস্তকে দূরে দাঁড়াইল। তাহার সেই নতমস্তকে দণ্ডায়মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের মধ্যে এমন একটু সৌন্দর্য্য—এমন একটু অমায়িকতা—এমন একটু মনুষ্যত্বের ভাব প্রকাশ পাইল যে, সহজেই নবীনকৃষ্ণের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঙ্গাধরকে বলিলেন, "দেখুন দেখুন, ছেলেটাকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আহা! এমন ছেলের মা বাপ নাই, এ শোভা দেখে কে? দেখ্‌তে কতকটা আমার ছোট ছেলেটার মত।"

গ। কতকটা আদল আসে বটে, তা আরও যদি ছেলের সাধ থাকে, তবে ওকেও নিয়ে নিতে পারেন।

ন। কি জানি ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

গ। ভবানীপতি আসিলে, তাঁকে ব'লে ও ছেলেটাকে আপনাকেই দিয়ে দিব—কি বলুন?

ন। আমার একটী ফুটফুটে সুন্দরী দৌহিত্রী আছে, তার সঙ্গে ছেলেটীর বিবাহ দিতে এবং ছেলেটীকে সর্ব্বদা কাছে রাখিতে ইচ্ছা হয়। বেশ ছেলে।

গ। আমার বৌমার কাছে শুনলুম যে ও গেরুয়াই ছাড়তে চায় না, তা বিয়ে ক'র্‌বে কি? বলে বিয়ে খা কর্‌বে না।

ন। কেন?

গ। আপনাকে ত বলেছি, খুব ছোট বেলা একবার সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ের কথা হ'য়েছিল, তার পর ছেলেটীর খোঁজ লওয়াও হ'য়েছিল, পাওয়া যায় নাই। সেই ছেলেবেলার ছেলে খেলাটা ছেলেটা ভুল্‌তে পারেনি। সুন্দরী বিধবা, এক

দিনের জন্যও সংসারে সুখী হয় নাই, এ দুঃখটা ওর বড়ই লেগেছে। তাই আর গেরুয়াও ছাড়্‌তে চায় না—বিয়ের কথাতেও কাণ দেয় না।

ন। বটে! তা হ'লে ত ছেলেটার মনটা খুব ভাল! বাঁচলে বড় লোক হবে। ভাল—ভাল।

গ। তা ত বটেই, কেমন বাপের ছেলে। ওর বাপ যে খুব বিদ্বান—বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁর অনেক গুণও ছিল।

ন। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

গ। করুন্।

ন। শাস্ত্রমত ধরিতে গেলে, বিধুর বিবাহটা অসম্পূর্ণ। মেয়েটার পুনরায় বিবাহ দিলে কি বিধিবিরুদ্ধ কাজ হয়?

গ। না। বিধিবিরুদ্ধ কাজ কেন হইবে?

ন। তবে, সে চেষ্টা করিলে ত সকল দিক রক্ষা হয়।

গ। দেশাচারবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়াই আপত্তি।

ন। যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয়, তবে দেশাচারবিরুদ্ধ কেন হবে? শুনিছি বিদ্যাসাগরমহাশয় অনেক বিধবার বিবাহ দিয়েছেন, এখনও দিতেছেন।

গ। শাস্ত্রে যাহা আছে, লোক যদি তাহাই পালন করিত, তাহা হইলে এ দেশের এত দুর্দ্দশা কেন হইবে?

ন। এরূপ বিধবার বিবাহ দেওয়া যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়, তাহা হইলে এই পাত্রের সহিত নাতিনীর বিবাহ দিতে সম্মত আছেন কি?

গ। অনেক বাধা।

ন। কি কি?

গ। প্রথমতঃ সুন্দরীর ইচ্ছা হবে কি না, দ্বিতীয়তঃ আমার বৌমার মত হবে কি না, তারপর কমলকুমারের বর্ত্তমান অভিভাবক ও গুরু ভবানী-পতির মত হবে কি না—তারপর ও ছেলেটারও মত হবে কি না, জানি না।

ন। যদি এই সকল অনুকূল হয়, তাহা হইলে আপনার অভিপ্রায় কি?

গ। সকলের মত হইলে, আমার অমত কেন হইবে?

ন। আপনার পৌত্রী আমার পুত্রবধূ, তথাপি যদি আপনি উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ বিধবা পৌত্রীর বিবাহ দিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমি

উপস্থিত থাকিতে এবং এ কার্য্যে সহায়তা করিতে সম্মত আছি। আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি। আপনি শাস্ত্র বুঝেন, আমি আপনাকে অগ্রণী করিয়া দুটী কারণে এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে সম্মত—প্রথম কারণ, আমার বৌমাটীকে আমি নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখি—আর এমন মেয়েও সংসারে অতি বিরল, তাহাকে সংসারে সুখী দেখিলে সুখী হই। অপর কারণ, এই ছেলেটীকে আমি বড়ই ভাল চখে দেখি। ইহাকেও দেখিবামাত্র আমার স্নেহ উথলিয়া উঠে।

গ। ভবানীপতি অতি ধার্ম্মিক, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ লোক। তাঁহার নিবাসও দেশের প্রধান স্থানে। তিনি আসুন, এ বিষয়ে তাঁহার মত জানিয়া শেষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেই ভাল হয় না?

ন। সেই কথাই ভাল।

গ। ভবানীপতির সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবার পূর্ব্বে এ কথার আর উল্লেখেরই প্রয়োজন নাই। ভবানীপতি এরূপ সাবধান লোক যে, কমল-কুমারকে সুন্দরীর নিকটস্থ হইতে ও সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ছেলেটীও আবার এত ভাল ও তাঁহার এত অনুগত যে, প্রাণান্তেও সুন্দরীর নিকটে যায় না। বাহিরে বাহিরে থাকিয়া দূর হইতে গুরুর আদেশমত সকল কার্য্য করিয়া থাকে।

ন। আমি এই এক মাস দেখ্‌ছি, ও ছোকরার সবই ভাল। গত পরশ্ব দিন ঠিক এই সময়ে ও ব'সে সংস্কৃত পড়্‌ছিল, এমন সুস্বরে পড়িতেছিল যে, আমার কর্ণে যেন অমৃত সিঞ্চন করিতেছিল। অনেকক্ষণ নিকটে দাঁড়াইয়া পড়া শুনিলাম। পরে দুই এক কথা জিজ্ঞাসাও করিলাম। তাতেও কেমন সপ্রতিভ ভাব—কেমন বিনয়! এমন ভাবে নিজের অনুপযুক্ততা ও গুরুর অনুগ্রহের উল্লেখ করিল যে, আমার ভবানীপতির উপরও গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইল।

গ। ভবানীপতি সাধু লোক—ক্ষমতাও অসীম। দেখা যাক্ সুন্দরীর বিবাহ প্রস্তাবে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা-যমুনার মিলনে।

ভবানীপতি হরিহরে গঙ্গাস্নান ও গুরুদেবের চরণবন্দনান্তর প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গুরুদেব কামরূপ যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নীলাচলে ও বৈশাখে পঞ্চবটীর রম্যকাননে অবস্থান করিবেন।

ভবানীপতি মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন, কাশীর গাড়ী আসিয়াছে। ষ্টেশন লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাড়ীতে বসিয়া সেই জনতার মধ্যে দুটী লোককে দেখিয়া তাঁহার একটু সন্দেহ হইল, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরবর্ত্তী ২।৩টী ষ্টেশনে নামিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু যাহাদিগকে সন্দেহ করিয়া বার বার অনুসন্ধান করিলেন, তাহাদের সন্ধানই পাইলেন না। তখন নিজের দেখার ভ্রম স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী এলাহাবাদের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশনের এক একটী গৃহদ্বারে, ষ্টেশনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের পরিচায়ক লেখাবিশিষ্ট এক একখানি কাষ্ঠফলক লম্বমান। বহুবিধ বিলাতি দ্রব্যাদি ও ঔষধ পত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়ালের গায়ে সংলগ্ন—ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর ব্যস্ততা সহকারে দলে দলে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি দেখিতে সুন্দর, ইহাদের কার্য্যকুশলতা ও তৎপরতার ষোল আনা চিত্র রেলওয়ে ষ্টেশনে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৃহৎ ষ্টেশন। ষ্টেশনের পাদমঞ্চ (প্ল্যাটফর্ম্ম) বহু দূর-

ব্যাপী। তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত দেখা যায় না। মধ্য স্থলে আসিয়া গাড়ী থামিল। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে কমলকুমার ভবানীপতির অপর একজন শিষ্যের সহিত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীতে ভবানীপতিকে দেখিতে পাইয়া,শিষ্যদ্বয় গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দৌড়াদৌড়ি করিতে কমলকুমার গাড়ীর অসংখ্য যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কত লোক বিশেষতঃ কত স্ত্রীলোক অমন সুন্দর যুবা পুরুষকে সন্ন্যাসীর বেশে ছুটাছুটী করিতে দেখিয়া তাকাইয়া আছে। এই সুযোগে কমলকুমারকে দেখিতে পাইয়া ভবানীপতির লক্ষচ্যুত লোক দুটী ধীরে ধীরে ভবানীপতির সম্মুখস্থ কমলকুমারের নিকটবর্ত্তী হইল। ভবানীপতি বিলাসিনী ও তাহার জননীকে দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। কমলকুমার বাহিরে অবাত-কম্পিত—ধীর–স্থির হইলেও তাহার হৃদয়াভ্যন্তরালে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। দুর্দ্দিনের সঙ্গীর প্রতি সমাদরপূর্ণ দৃষ্টিপাতে নীরবে অভ্যর্থনা করিল,কিন্তু একটী কথাও কহিল না। বিলাসিনী ও তাহার জননী অগ্রসর হইয়া ভবানীপতির চরণ বন্দনা করিল। তিনি গম্ভীর ভাবে মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভবানীপতি ষ্টেশন হইতে বেণীঘাটে নিজ আশ্রমে যাইবার সময়ে মুঠিগঞ্জে এক শিষ্যের আলয়ে বিলাসিনী ও তাহার মাতার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কমলকুমারকে তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও তখনকার আহারের আয়োজন করিয়া দিতে আদেশ দিয়া অপর শিষ্য সমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ব্রহ্মচারী, বিলাসিনী ও তাহার মাতার সহসা উপস্থিতি নিবন্ধন, তাহাদের উপস্থিত বাসস্থান নির্দ্দেশ ও ভবিষ্যত ব্যবস্থার ভাবনা বশতঃ ইতিপূর্ব্বে গঙ্গাধর ও তাঁহার পরিবারবর্গের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে অগ্রগমনোন্মুখ শকটের গতি রোধ করিয়া কমলকুমারকে আহ্বান পূর্ব্বক গঙ্গাধরের গৃহের, বিশেষ ভাবে সুন্দরীর পীড়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলকুমার গুরুদেবের আদেশমত যেরূপ যেরূপ করিয়াছে এবং তাহার ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিল। ভবানীপতি অতি হৃষ্টমনে আশ্রমে গমন করিলেন। যাইবার সময়ে কমলকুমারকে শীঘ্র গঙ্গাধরের গৃহে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়া গেলেন।

ভবানীপতির স্নেহভাজন ও বিশ্বাসভাজন শিষ্য কমলকুমার গুরুদেবের ইঙ্গিতমত সাবধানতার সহিত সত্বর ইহাদের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কাহাকেও একটী কথা কহিতে দিল না। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, "আমারই অপরাধের ফলে তোমাদিগকে এত ক্লেশ পাইতে হইল। আমার দ্বারা তোমার জীবনব্যাপী দুঃখ আরও বাড়িয়া যাইবে' জানিলে, আমি কখনই তোমার সহিত এরূপ স্নেহের বন্ধনে বদ্ধ হইতাম না। আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, তোমার সঙ্গচ্যুত হইয়াছি, লোকে দেখিতেছে আমি শ্রীক্ষেত্র, পঞ্চবটী, বিন্ধ্যাচল, মথুরা ও বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া আজ মাসাধিক হইল এখানে আছি, কিন্তু আমার হৃদয়—আমার প্রাণ—আমার মন, মোট কথা আমার 'আমিটা' সেই বজবজের পর্ণকুটীর-প্রাঙ্গণেই প্রতিদিন ছুটাছুটি করিতেছে। এ দুঃখময় জীবনের নিত্য নূতন ক্লেশে, তোমার ও তোমার মায়ের স্নেহ মমতা—অনুগ্রহপূর্ণ সেবা, এ হতভাগার জীবনের চিরসম্পদ—তাই তোমার নিকট অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত। এখন আমার পণ এই যে, যখন এ জীবন বিক্রয় করিয়াও এই কৃতজ্ঞতা ঋণের কিয়দংশেরও পরিশোধ করিবার উপায় নাই—তখন ইহার পরিশোধার্থে অন্যবিধ সদুপায় অবলম্বন করিব।" বিলাসিনী নীরবে নেত্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে গৃহতল সিক্ত করিতে লাগিল। তাহার মা নিকটে দণ্ডায়মানা। কমলকুমার বিদায় হইল। বিদায়ের সময়ে বিলাসিনী একটীবার কাতরদৃষ্টিতে কমলকুমারের দিকে তাকাইল। দীর্ঘ-কাল পরে পুনরায় চারি চক্ষের মিলনে অপার আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল।

পীড়া নিবন্ধন সুন্দরীকে ব্রহ্মচারীর আশ্রম হইতে বহুদূরে লইয়া যাওয়া সঙ্গত বোধ না হওয়াতে, গঙ্গাধর বেণীঘাটের অনতিদূরে সহরপ্রান্তে বাস করিয়াছিলেন। এখনও সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। ভবানীপতি আশ্রমে পৌঁছিয়া সর্ব্বাগ্রে স্নান পূজা সমাপন করিয়া, গোধূলি অতিক্রান্ত হইলে, কিছু ফলমূল ভক্ষণ ও তৎপরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া গঙ্গাধরের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কমলকুমার ইতিপূর্ব্বে গঙ্গাধরের গৃহে উপস্থিত হইয়া গুরুদেবের পৌঁছান ও সন্ধ্যার পরে সেখানে উপস্থিত হইবার সংবাদ জ্ঞাপন করিল। নবীনকৃষ্ণ ও গঙ্গাধর উভয়ে ব্রহ্মচারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভবানীপতি গঙ্গাধরের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র নবীনকৃষ্ণ ও গঙ্গাধর

গাত্রোত্থান করিলেন ও অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে সসম্ভ্রমে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন। পরস্পরের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইলে, ব্রহ্মচারী সুন্দরীকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময়ে কমল-কুমারকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। কমলকুমার কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে নৌকাবক্ষে অচেতন অবস্থায় সুন্দরীকে দেখিয়াছিল। তাহার পর আর দেখে নাই। ব্রহ্মচারী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরীর মা ব্রহ্মচারীকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন এবং কন্যার শয্যাপার্শ্বে অতি নিকটে স্বতন্ত্র আসন পাতিয়া দিলেন। ঠাকুরদাদার সঙ্গে শ্বশুর ও সন্ন্যাসীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুন্দরী দুর্ব্বল হস্তে মস্তকের আবরণ টানিয়া দিল। এবং শয়নাবস্থাতেই বহু কষ্টে মাতার অনুকরণে ভবানীপতির পাদস্পর্শ করিল। ব্রহ্মচারী সুন্দরীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে গেলেন "মা তোমার——" কিন্তু উপযুক্ত মঙ্গল বাক্য না পাইয়া মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। ব্রহ্মচারী বাষ্পাকুললোচনে,রুদ্ধস্বরে আবার বলিতে গেলেন "মা লক্ষ্মি ! বিধাতা———" আর কোন কথাই মুখে আসিল না। শেষে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ভবে গঙ্গাধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে পথ্য দিয়াছেন ?"

গ। গতকল্য।

ব্র। বেশ ক্ষুধা হইয়াছে ?

গ। বৌমা বলিতে পারিবেন।

সু-মা। (অনুচ্চ স্বরে) কাল খেতে পারেনি,আজ বেশ খিদে হয়েছিল।

ব্র। ঔষধটা এখনও কিছুদিন খাওয়াইতে হইবে।

সু-মা। হাঁ, আজও সকালে একটা, এবেলা একটা বড়ি দিয়েছি।

ব্র। মা ! আর তিন দিন দুবেলা দুটী দিয়ে চারদিনের দিন থেকে কেবল সকালে একটী দিলেই হবে। তবে এখন উঠি। আমার আবার একটু দূরে একস্থানে একটু বিশেষ কাজে যেতে হবে। কমলকুমার কোথায়, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি ?

ক। আপনার যেরূপ অনুমতি। আমাকে বলেন ত আশ্রমেও যেতে পারি।

গুরুদেব কমলকুমারের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে আশ্রমে যাইতে আদেশ দিলেন এবং একাকী যাওয়াই স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সুন্দরী রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইলেও সকল বিষয় ভাবিবার শক্তি হইয়াছে, কমলকুমারের সহিত তাহার এই একমাস সাক্ষাৎ না হইলেও, সে যে কমল-কুমারের বিষয়ে ভাবিতে বিরত ছিল এমন নহে। তাই ব্রহ্মচারীর মুখে কমল-কুমার নাম উচ্চারিত হইতে না হইতে, সে কমলকুমারের সান্নিধ্য অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা উত্তেজনাপূর্ণ অবশ ভাবে তাহার চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল—সমস্ত শরীর ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল—অতি ক্ষীণ—কাতর স্বরে মাকে বলিল "মা—বাতাস"।

নবীনকৃষ্ণ ও গঙ্গাধর ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া বাহির বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি বড় ব্যস্ত আছেন ?"

ব্র। আমার পূর্ব্ব পরিচিত দুটী লোক আজ প্রয়াগে আসিয়াছে। তাহাদিগকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে,এই জন্য ব্যস্ততা,তা হ'লেও আমি দুএক দণ্ড সময় অপেক্ষা করিতে পারি। বিশেষ কথা থাকে, আমাকে বলুন।

ন। কথাটা বড়ই গুরুতর, পাছে আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন এই ভয়।

ব্র। আপনারা সজ্জন ও ধর্ম্মাত্মা। আপনাদের কথায় আমি অপরাধ লইব ! এ কেমন কথা ?

ন। (গঙ্গাধরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনিই বলুন।

গ। কেন আপনিই বলুন না।

ন। না, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞ, আপনিই বলুন।

গ। আমার বালিকা পৌত্রী আপনার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আপনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেন না কেন ?

ব্র। আমার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইলেন ? আমি নিজেই বলিতে যাইতে ছিলাম। চিকিৎসা-সূত্রে কয়েক দিন আমি কন্যাটীকে পীড়িতাবস্থায় দেখিয়াছি। এমন সুলক্ষণাক্রান্তা বালিকা আমি অল্পই দেখিয়াছি। মেয়েটী কেবল নামে সুন্দরী নহে, সর্ব্বাংশেই সুন্দরী। আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া যখন স্মরণ হইল,সংসারের এই সুন্দর—নির্ম্মল—পবিত্র ফুলটী ফুটিবার আগেই বৃন্তচ্যুত হইয়াছে, তখন আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত বাক্য পাইলাম না, তাই অতি কাতর-ভাবে বিধাতাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলাম "ইহার ধর্ম্ম লাভ হউক।" কিন্তু হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া গেল, তাই নেত্রনীরে ভাসিলাম।

গ। ইহার কি কোন প্রতিবিধান হয় না?

গঙ্গাধরের মুখে এই কথা কয়টী বাহির হইতে না হইতে, ব্রহ্মচারীর চক্ষু হইতে যেন এক ঝলক অগ্নি উদ্গীরিত হইল। তিনি ত্রিকালদর্শী লোকের ন্যায় প্রশ্নের সমগ্র অর্থ অনুধাবন করিয়া—পলকের তরে একটীবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন সমগ্র বিশ্বরাজ্য পরিদর্শন করিয়া লইলেন—যেন চরাচর বিশ্বপতি ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিবার, ও উপদেশ লাভের প্রয়াসী হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ইঙ্গিতে যেন কাহার সহিত কি কথা কহিয়া পরক্ষণেই গঙ্গাধর ও নবীনকৃষ্ণের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। নবীনকৃষ্ণ বিস্মিত ও ভীত হইলেন। গঙ্গাধর, অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান ও স্থির দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর দিকে তাকাইয়া প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করিতেছেন। ব্রহ্মচারী গঙ্গাধরের দিকে তাকাইয়াই স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন "লোকাচার-নিষিদ্ধ মাত্র দোষ। শাস্ত্রে বিবাহের ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রের আদৌ নিষেধ নাই। এরূপ স্থলে লোকাচারের প্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করিতে, তদভাবে উহা অতিক্রম করিতে পারিলে, বিবাহে বাধা নাই। আমি আজ কয়েকদিনই ভাবিতেছিলাম যে, ঠিক এই সকল লক্ষণাক্রান্তা আমার একটী কন্যা সংসারে সর্ব্বাংশে সুখী হইয়াছে, তবে ইহার ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল কেন ফলিল। এখন আমার সে সংশয় দূর হইল, আপনাদের ইচ্ছা থাকিলে এবং সাহসে কুলাইলে, ইহার বিবাহ দিতে পারেন; এবং আমি সে সময়ে নিকটে থাকিলে সে অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিব।"

ন। এ বিবাহ দেওয়া এবং দিলেও এই বিবাহ হওয়া আর একটা বিষয়ে আপনার ইচ্ছা ও অনুমতির উপর নির্ভর করিতেছে।

ব্রহ্মচারী তাৎপর্য্য বুঝিয়াও বলিলেন "বলুন।"

গ। রামেশ্বরের পুত্রের সহিত এই বিবাহে আপনার অনুমতি পাইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

ব্র। পাত্র পাত্রীর বিষয়ে এবং ইহাদের কুলগৌরব ও বংশ-মর্য্যাদা যত দূর জানিয়াছি তাহাতে আমার অসম্মতির কোন কারণ দেখি না। তবে যদি কোন নূতন অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে ভিন্ন কথা। মনে মনে বলিলেন, "গঙ্গায় যমুনা আসিয়া মিলিত হইয়াছে—কি হবে কে জানে?"
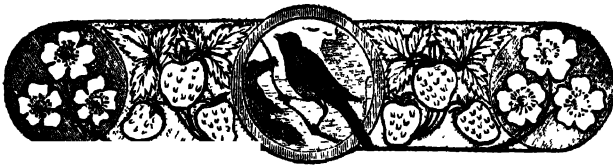
ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মা ও মেয়েতে।

ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলে, গঙ্গাধর ও নবীনকৃষ্ণ উভয়ে আহার করিতে বসিলেন। সুন্দরীর পীড়ার জন্য তাহার মা পাকের কার্য্য নিজে করিতে পারিতেন না। স্বতন্ত্র লোক রাখা হইয়াছিল। সেই লোকই এখনও কাজ করিতেছে। কিন্তু তিনি শ্বশুর ও বৈবাহিকের নিকটে বসিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। এমন সময়ে নবীনকৃষ্ণ গঙ্গাধরের পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে, সুন্দরীর বিবাহ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া বলিলেন "প্রয়াগকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে, বৌমারও রোগ-শান্তি হইয়াছে। এখন এখান হইতে কবে রওনা হইবেন বলুন ত?"

গ। কোন্ দিকে?

ন। "কোন্ দিকে" কেমন কথা?

গ। তামাসা যাক্, ব্রহ্মচারী কেমন লোক?

ন। খুব ভাল লোক। কিন্তু আপনার ঐ কথার উত্তর দিবার সময়ে আকাশের দিকে তাকাইয়া কার সঙ্গে যেন কি কথা কহিয়া তবে উত্তর দিলেন। কেন বলুন ত? চেহারা দেখে আমার ভয় হ'য়েছিল।

গ। জানি না। তবে ছেলেটা নিয়ে বড় বিপদ—ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিল।

ন। কি রকম?

গ। ছেলেটাকে এক দিকে ব্রহ্মচারী ধরে আছেন—আর এক দিকে আমার বৌমা ত অনেক দিন হইতে দখল করে আছেন—এখন আপনি আবার এক নূতন সত্ব স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। এখন দেখা যাক্ কার দাবির জোর বেশী।

সু-মা। কেন? কমলকুমারকে নিয়ে কি কোন কথা হয়েছে নাকি?

গ। ছেলেটী তোমার সম্পত্তি, এখন ব্রহ্মচারীর দখলে, এর উপর তোমার বেয়াই আর এক নূতন দাবি চালাইতেছেন। উনি বলেন, ছেলেটী দেখ্‌তে কতকটা ওঁর ছোট ছেলে বিধুর মত, তাই ওকে নিয়ে গিয়ে ওঁর একটী দৌহিত্রীর সহিত বিবাহ দিতে চান, তাহলে তোমার দাবি ত চলে যায়।

সু-মা। আহা তা হোক্, ছেলেটী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরবে তার চেয়ে সে ভাল, সে কি তাতে রাজি হবে?

ন। বেয়ান! সে কেন রাজি হবে না?

সু-মা। কর্ত্তা জানেন, আমি তাঁকে সব বলেছি।

ন। আমিও শুনেছি,বহুপূর্ব্বে আপনার কন্যার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। তা সে যদি এখনও সুন্দরীকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়,তাহ'লে দিন না কেন? শুনেছি শাস্ত্রমতে বিধুর বিবাহ অসম্পূর্ণ ও অসিদ্ধ। গঙ্গাধরের দিকে তাকাইয়া, আপনাদের কি তাতে আপত্তি আছে? আমার আপত্তি নাই।

সু-মা। (সাশ্রুনয়নে) তাও কি কখন হয়?

গ। হবেনা কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক বিধবার বিবাহ দিতেছেন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। যদি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে অগ্রসর হও, তোমার বড় আদরের ছেলে তোমারই থাকিবে, আর যার জন্য এত যন্ত্রণা ভোগ ও অশ্রুপাত, সেও সংসারে সুখী হইবে।

সু-মা। আচ্ছা, বাবা, আপনি সে সময়ে কমলের সঙ্গে বিবাহে আপত্তি করেছিলেন, আর এখন যে বিধবা নাতিনীর বিবাহ দিতে অগ্রসর, ইহার গূঢ় কারণটা আমাকে বলিবেন কি?

গ। মা! সে অনেক কথা। এখন তুমি কি সম্মত আছ?

সু-মা। আমিত শাস্ত্র টাস্ত্র বুঝি না। কমলকুমারকে পেয়ে পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ চিন্তাই আপনা আপনি আমার প্রাণের মধ্যে উদয় হই-

তেছে। আমি স্ত্রীলোক আমার আর কেহ নাই, একটী মেয়ে, তাকে সংসারে স্থায়ী করিতে পাইব—সে সুখী হইবে, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে।

সুন্দরীর শয়নকক্ষ হইতে পাকশালা কিঞ্চিৎ দূরে হইলেও, ইচ্ছা করিলে ও মনোযোগ দিলে, সকল কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। পিতামহ, শ্বশুর ও জননী একযোগে তাহার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহার শুনিবার ইচ্ছা হইল। এরূপ ইচ্ছা স্বাভাবিক, কাহার না হয়? সে উঠিয়া বসিল। বসিয়াই শুনিতে পাইল, তাহার মা বলিতেছেন "আর এখন যে বিধবা নাতিনীর বিবাহ দিতে অগ্রসর" শুনিয়া সে বিস্ময়ে অভিভূত হইল। অব্যক্ত উত্তেজনাবশতঃ তাহার বুকের ভিতর কেমন একটা শব্দ হইতে লাগিল—তাহার রোগক্লিষ্ট কপোলে শোণিত সঞ্চারিত হইল—বক্ষ প্রসারিত, সমুন্নত ও কম্পিত হইতে লাগিল। সহসা যেন কোন অজ্ঞাত কারণসম্ভূত আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহার নৃত্যশীল লোচনদ্বয় বাষ্পাকুলিত হইয়া উঠিল, মস্তক নত করিতে গিয়া নৃত্যশীল বক্ষ অশ্রুসিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল দেখিয়া,নিজে নিজেই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইল ও বুঝিল, কমলকুমারের বিবাহপ্রস্তাবের সহিত তাহার অস্তমিত সুখ সূর্য্যের পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সুন্দরী তাহা চায় না। সে ত সংসারের সুখ-সম্পদ-সম্ভোগ-লালসা মুক্ত হইয়া একাকী সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে স্থির করিয়াছে। কমলকুমার হৃদয়ের প্রিয়তম দেবতা হইলেও, পৃথিবীতে আর তাহার সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না। লোকাচারমুক্ত লোকান্তরে মিলিত হইবার বাসনা-সূত্র ধরিয়াই সুখানুভব করে।

শ্বশুর ও বৈবাহিকের উৎসাহ ও আগ্রহে সুন্দরীর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্ত্রীলোক, একমাত্র বালিকা বিধবা কন্যার জননী, শাস্ত্রসঙ্গতি অপেক্ষা তাঁহার কন্যার সদ্গতিই অধিক বুঝেন। আজ তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লুকাইত বাসনার ক্ষুদ্র অঙ্কুরটী আপনা আপনি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল দেখিয়া, তিনি তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে গলবস্ত্রে শত শত বার প্রণাম করিলেন।

সুন্দরী সকল কথাই শুনিয়াছে, কিন্তু কিছুই ভাল বুঝিতে পারে নাই, ভাল বুঝিতে না পারার কারণ এই যে এই নূতন কথার প্রসঙ্গে নূতন চিন্তার স্রোতঃ

এমন প্রবল ভাবে তাহার হৃদয় মন অধিকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের এমন একটা নূতনত্ব তাহার সমস্ত শরীর মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, যে সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না—শান্ত ভাবে কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে পারিল না।

সুন্দরীর মা পাকশালার কাজ শেষ করিয়া—কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুন্দরীর মুখে এক অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা দেখিলেন, কন্যার মুখে রোগের চিহ্নমাত্র নাই, সুন্দরী আজ স্মিত মুখে—নত মস্তকে, জননীর প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, যতই তিনি নিকটে আসিতেছেন, ততই সে কুণ্ঠিত হইতেছে, আর সেই সুন্দর মুখখানিকে লজ্জার অবগুণ্ঠনে আবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে আজ সে কার্য্যেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। ঘন নিবিড় মেঘমালায় আকাশ-পথ আবৃত হইলেই যেমন দিবালোক চলিয়া যায় না—অমাবস্যার ঘন অন্ধকার দেখা দেয় না, তদ্রূপ সুন্দরীর লজ্জার আবরণ তাহার হৃদয়ের সুখ-সমারোহ লুকাইতে পারিল না। মা আরও নিকটে আসিয়া দেখিলেন, কন্যার মুখে কি এক নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত সমাগমে পদ্মাকরে স্ফুটনোন্মুখ কমল-কলিকা যেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে—যৌবনভারে মৃণালসহ অপাঙ্গ দৃষ্টিতে যেমন সলিল-শোভা দর্শন করে, সুন্দরীও তেমনি করিয়া তাহার মৃণাল-গণ্ড-ধৃত মুখ কমল নত করিয়া সলজ্জ নত দৃষ্টিতে আপনার অশ্রু প্লাবিত বক্ষের শোভা দর্শন করিতে লাগিল। জননী কন্যার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, সে তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছে এবং সে সংবাদে তাহার মনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত, তাহাও বুঝিলেন—বুঝিলেন যে তাঁহার নিজকৃত দুই ভাগে বিভক্ত প্রাণটী একত্র করিলেই সুন্দরীর সংসার-জীবন সফল হয়। গৃহিণী কন্যার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "মা! আজ কেমন আছিস্ বল্‌তো?" লজ্জাবনতমুখী সুন্দরী নত মস্তকেই উত্তর দিল "মা! আমি আজ ভালই আছি।" মা বলিলেন "ভাল আছিস্ ত মাথা হেঁট ক'রে কেন? মুখখানা তুলে আমার দিকে তাকা দেখি।" মেয়ে লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বসিল। তখন মা নিকটে গিয়া কন্যার চিবুক ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যার প্রীতিমাখা—আশার হিল্লোলে আন্দোলিত—সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া তাকাইয়া, নীরবে সে মুখ-কমল-মকরন্দ পান করিয়া প্রীতি-

বিস্ফারিত নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ করিয়া, হৃদয়ের আবেগে সেই কমল-মুখে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। অবশেষে দীর্ঘকালব্যাপী যাতনার পাষাণখণ্ড হৃদয় হইতে আজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন "মা! আজ ছেলেটা কাছে থাক্‌লে, তাকেও পাশে বস্‌'য়ে এমনই করে আদর করতুম্।"

পরদিন প্রাতঃকালে পূজান্তে ব্রহ্মচারী কমলকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "গঙ্গাধরের পৌত্রী কেমন আছে একবার সংবাদ লইতে হইবে। তুমিই যাও। বহু পূর্ব্বে বালিকার সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তাই তাহার পীড়াকালে তাহার সম্মুখস্থ হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সে রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে, তুমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎও করিতে পার। কিন্তু একটু শীঘ্র আসিবে, কারণ বজবজের স্ত্রীলোক দুটী শ্রীধরের সঙ্গে স্নান করিতে আসিবে, তাহারা এখানকার কিছুই জানে না। তুমিই তাহাদিগের পরিচালক হইয়া সকল কাজ সম্পন্ন করাইবে।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জয় পরাজয়ে।

এই ভাবে কয়েক দিন অতীত হইলে পর, ব্রহ্মচারী ভবানীপতি একদিন সন্ধ্যার পর কমলকুমারকে একাকী আশ্রম-প্রান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন "বৎস! আজ এক বৎসরকাল তোমাকে সঙ্গে রাখিয়া দেখিলাম, তুমি পৈতৃক গুণে ও সুশিক্ষার প্রভাবে সজ্জনসমাজের উপযোগী হইয়াছ—তোমার জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রবল হইয়াছে—বিদ্যাশিক্ষায় তোমার অনুরাগ জন্মিয়াছে দেখিয়া, আমি তোমাকে সংস্কৃত চর্চ্চার পথ দেখাইয়া দিয়াছি। শাস্ত্রচর্চ্চা কর, সামান্য ইংরাজী শিখিয়াছিলে, নিজের চেষ্টায় হউক, বা অন্য লোকের সাহায্যেই হউক সেই ইংরাজী শিক্ষার প্রসরও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে; এবং যে কোন সদুপায়ে হউক দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া সজ্জনের ন্যায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিবে। তোমার পিতামাতা লোকান্তরিত। এক্ষণে আমিই তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া সর্ব্বদা তোমাকে সৎপথ দেখাইয়া দিব। তোমার জন্মভূমি ত্যাগ করার পর, দীর্ঘকাল ধরিয়া নানাস্থানে তোমার সন্ধান করিয়া পাই নাই। শেষে সাগর-যাত্রার সময়ে বজবজে তোমার সন্ধান পাইয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার অবস্থা অবগত হইয়া সেখানে সাক্ষাৎ করা উচিত বোধ করি নাই। কিন্তু 'তোমার সাগর-স্নানের ইচ্ছা হউক' এইরূপ ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই। তাহারই ফলে তুমি সাগরে আমার নয়নপথে পতিত

হইয়াছিলে। তোমার বিষয়ে আমার আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছা দুই পূর্ণ হইয়াছে। আপাততঃ আমি কিছু কালের জন্য বদরিকাশ্রম যাত্রা করিব। অপরাপর শিষ্য গুলিকে কোন নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়া যাইব, আর তোমাকে তোমার আত্মীয় ও আমার সুহৃদ্ গঙ্গাধরের নিকট রাখিয়া যাইতেছি। তিনি তোমাকে যেখানে যে অবস্থায় থাকিতে বলিবেন, তাহাই করিবে। তাঁহাকে আমার প্রতিনিধি জ্ঞানে ভক্তি করিবে এবং তাঁহার আদেশ পালন করিবে। আমি সর্ব্বদা তোমার সংবাদ লইব এবং প্রয়োজন হইলে, তুমি ইচ্ছা করিবা-মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

ক। আমার প্রতি সহসা এরূপ বিরূপ হইলেন কেন? আমি ত জ্ঞাতসারে, আপনার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করি নাই।

ভ। বৎস! তুমি কোন অপরাধ কর নাই। আমিও তোমার উপর বিরূপ হই নাই।

ক। তবে এ হতভাগাকে এত ত্বরায় সঙ্গচ্যুত করিতেছেন কেন?

ভ। আমি বনবাসী, আমি পথিক, বনে বনে—পথে পথেই এই ভাবে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। তুমি বালক। তোমাকে সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইবে, পিতার নাম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিতে হইবে। তুমি গঙ্গাধরের ন্যায় বিজ্ঞ জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা সদনুষ্ঠান নিরত হইয়া সুখে সংসার-ধর্ম্ম পালন কর। তাহার পর ইচ্ছা হইলে জীবনের শেষ ভাগে আমার মত নানা দেশ ও তীর্থ ভ্রমণ করিবে। আর অধিক বাক্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নাই। আমার পরামর্শ মত কার্য্য কর।

ক। আমি তাঁহার সহিত যাইব না। শত ক্লেশ সহ্য করিয়া আপনার শিষ্য-মণ্ডলীর সহিত আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পড়িয়া থাকিব।

ভ। গঙ্গাধরের সহিত বাস করিতে অসম্মত কেন?

ক। সে অনেক কথা, আপনি গুরুদেব—সে সকল কথা বলিতে আমার————।

ভ। আমি গুরুদেব তাই গোপন করিতে চাও?

ক। আজ্ঞা না, বলিতে——।

ভ। বলিতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? বল।

ক। সুন্দরীর বিবাহের পূর্ব্বে,বাল্যাবস্থায় একবার আমার সঙ্গে বিবাহের কথা হইয়াছিল। আর আমার জীবনের উপর সে ঘটনার একটা স্থায়ী দাগ পড়িয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে, তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করা আমার পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

ভ। কেন? গঙ্গাধর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে তাঁহার বিধবা পৌত্রীর পুনরায় বিবাহ দেন এবং তোমার সহিত সে বিবাহে যদি আমার সম্মতি থাকে?

কমলকুমার চমকিত হইল। পরক্ষণেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একটী বার ভবানীপতির মুখের দিকে তাকাইয়া মস্তক নত করিল এবং অনুচ্চ স্বরে বলিল "আমি চিরদিন অকৃতদার থাকিব স্থির করিয়াছি।"

ভ। সে কি? রামেশ্বরের বংশ লোপ পাইবে যে!!

ক। কি কবিব—নিরুপায়।

ভ। কেন?

ক। কেন জানি না—ঠিক বুঝিও না।

ভ। তুমি কি মনে কর, আমি তোমার মুখখানি দেখিয়া তোমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারি না? এখনও প্রকৃত কারণ আমাকে বল, আমি তাহার প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

কমলকুমার এইবার আর একবার গুরুদেবের মুখের দিকে তাকাইয়া অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহার চরণের উপর পতিত হইয়া অতি কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিল।

ভবানীপতি বহুবিধ মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। বহু ক্ষণ পরে কমলকুমার গুরুদেবের সমক্ষে নিজের হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে লুকাইত মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া, পরে বলিল "আমার পক্ষে অবিবাহিত থাকা ভিন্ন গতি নাই। আমি আপনারই অনুগ্রহে আত্মনিগ্রহের মূলমন্ত্র শিখিতেছি। অন্যের অশান্তি ও অসুখ বৃদ্ধি করিয়া সংসারে নিজের জীবন-পথ কণ্টকশূন্য, নিরাপদ, কসুমাস্তীর্ণ সুখকর করা, কোন মতেই প্রশস্ত ধর্ম্ম-বুদ্ধির কার্য্য নহে। তাই আপনার অনুগ্রহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি সংসার-সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আর আমাকে সে পথে প্রেরণ করিবার প্রয়াসী হইবেন না। আমি

দুর্ব্বল, দৈবানুগ্রহে সবলের সঙ্গ-লাভে ক্রমে সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইতেছি কিন্তু—। আপনি প্রভু ও পথ-প্রদর্শক হইয়া আমার চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিবেই। আপনার

ভবানীপতি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বহুক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া। তি হইবে, করিলেন। পরে এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পুনরপি কমলকুমারকে অত মিষ্ট ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি অনেক চিন্তা করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছি এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তোমার নিকট এ কথার উত্থাপন করিতেছি। এখন এ কার্য্যে তোমার অসম্মতি বিপত্তির কারণ হইবে। বিশেষতঃ সেই নিরপরাধিনী বালিকা কন্যাটীকে অধিকতর বিপন্ন করা হইবে। তাহার প্রতি তোমার গভীর স্নেহ ও হৃদয়ের টান আছে জানিয়াই, আমি এই প্রস্তাবে তোমার অজ্ঞাতসারে সম্মতি দিয়াছি। এখন তুমি অসম্মত হইলে সকল দিক যায়। এখন উপায় ?" কমলকুমার বলিল "প্রভো! এই বিবাহ করিলে আমি প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারি ; আমার সংসারের কোন অভাবই থাকে না, তাহা আমি জানি। এই বিবাহ করিলে আমি সংসার সুখের প্রধান সহায় সুস্বভাবা ও সুশীলা স্ত্রী লাভ করি ; ইহাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহার পর সংসারে আমার আমার, বলিবার কেহই নাই। সুন্দরীর জননী আমাকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখেন। গঙ্গাধর আমাকে যে কত ভাল বাসেন, তাহা কোজাগরের রাত্রিতে আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমার পিতামাতার অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে, আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পাইয়াছি বলিয়াই, এ সকল সুবিধা সহজেই উপেক্ষা করিয়া দীনহীন সেবকের ন্যায় আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে ব্যাকুল হইয়াছি।

গুরুদেব আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি রামেশ্বরের উপযুক্ত পুত্রই বটে। আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই। রামেশ্বরের বালক পুত্র আজ তাহাও করিল। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।" পুনরপি অতি বিষণ্ণ মুখে কমলকুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এখন উপায় ?"

কমলকুমার গুরুদেবের পদধূলি লইয়া সাশ্রুনয়নে দূরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তিনি ইঙ্গিতে বালককে ফিরাইলেন এবং পুনরপি অতি কাতর ভাবে

ন "এমন কি উপায় আছে, যাহাতে এ কার্য্য সংসাধিত হইতে

বিবাহ সম্ভব হইলে,আমি সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া চরিতার্থ হইতাম। আমার বাল্য-চপলতা মার্জ্জনা করিবেন, আমার জীবন আমার আয়ত্তাধীন নহে। শৈশব-সরলতা-জাত স্নেহ সূত্রে আমি সুন্দরীকেই ভাল বাসি। দুঃখ দুর্দ্দিনের যাতনাময় জীবন-সংগ্রামে সহচরীরূপে—সখীরূপে—এমন কি শান্তিবিধায়িনী দেবীরূপে ঐ ব্রাহ্মণেতর জাতীয়া বিলাসিনীই আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে! আমি একাকী নির্জ্জনে বসিয়া সুন্দরীর সুন্দর মূর্ত্তি ভাবিতে গেলে, বিলাসিনী চুপে চুপে আমার হৃদয়-প্রান্তে আবির্ভূতা হয়, আবার বিলাসিনীর বিলাস-বৈভব যখন আমার হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তখন সুন্দরীর সরলতামাখা সৌন্দর্য্যের শুভ্রালোকে আমার আঁধার হৃদয় আলোকিত হয়। অনেক সময়েই আমার মনোরথের বামে সুন্দরী দক্ষিণে বিলাসিনী যুগপৎ অভ্যুদিত হইয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে! আমার হৃদয় কাহাকে রাখিয়া কাহার অভ্যর্থনা করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না, আমি অমনি অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া পড়ি এবং অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দিই। এরূপ ঘটনা অনেক দিন ঘটিয়াছে। দেখুন! বহু দূরে দূরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেশ কাল ও অবস্থার মধ্য দিয়া এই দুটী জীবনের ধারা প্রবাহিত হইয়া অবশেষে প্রয়াগে আমার শ্রীগুরুদেবের চরণ প্রান্তে উভয়েই আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আপনি আকাশ সদৃশ উচ্চ—সাগর হইতেও গভীর। আপনার উচ্চ উদার হৃদয়ের আশ্রয় লইয়া একজন সফল মনোরথ হইয়া সংসারে সুখে কালাতিপাত করিবে, অপরা, পরাজিতা ও ব্যর্থকামা হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে সংসার-অন্ধকারে মিশিয়া যাইবে, আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমি এরূপ নীচতার পরিচয় দিতে পারিব না। আপনি কি ঐ দুঃখিনীকে দুঃখের অপার পাথারে ভাসাইয়া দিতে বলেন?

ভ। না বৎস! আমি তোমাকে সেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলি না। আমি আমার শৈশব জ্ঞানের সহিত যাঁহার উপদেশ শুনিয়া ও যাঁহার জীবনের মহান আদর্শ দেখিয়া আজ এই অবস্থায় এখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, সে আদর্শ অতি পবিত্র—অতি উচ্চ, সে দেব-চরিত্রে এ ক্ষুদ্রতার স্থান হয় না।

আমি তোমাকে তোমার অভিপ্রেত পথে চলিতেই অনুমতি দিচ্ছি কিন্তু—।

ক। আমাকে অনুমতি দিন্, আমি বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত হ আপনার আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলেচ্ছা আমার পণ ভঙ্গ করিলে, আমার অধোগতি হইবে, আপনাতে প্রত্যব্যয় স্পর্শিবে।

ভবানীপতি "তথাস্তু" বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন্। সেই যে আশ্রমপ্রান্তে ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন, আর সে রাত্রিতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। শিষ্যেরা তাঁহার জলযোগের আয়োজন করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিল এবং বহুবার তাঁহার সংবাদ লইল,কিন্তু তিনি উঠিলেন না। অতি প্রত্যূষে ভবানীপতি গাত্রোত্থান করিলেন। সিদ্ধকাম হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। তৎপরে দৈনিক পূজা আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন—যাইবার সময়ে কাহাকেও কিছুই বলিয়া গেলেন না।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্ম-সমর্পণে।

অন্যান্য বহুবিধ কথা বার্ত্তার পর ব্রহ্মচারী বিলাসিনীকে একটু নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন "মা! আমি নানাপ্রকারে তোমার দুঃখের কারণ হইয়াছি। আর তুমি বালিকা, সেজন্য হয়ত মনে মনে আমাকে কতই না তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি যে কোন অবস্থাতেই পড় না কেন,কোন দিনই আমার স্নেহে বঞ্চিত হইবে না।"

বি। আপনি দেবতা, আপনাকে কি আমি মন্দ ভাবিতে পারি? তাহা হইলে আমার ইহপরকাল দুই বিনষ্ট হইবে। আপনার হাতে আমার যেরূপ পরিণামই হউক, আমি সহ্য করিব, সহ্য করিবার জন্যই আমার জন্ম। আমার তাহাতে দুঃখ বা অভিমান কিছুই নাই।

ব্র। মা! তোমার কথা শুনিলে,পাষাণ গলে, তোমার কথাগুলি এত মিষ্ট, তুমি এমন শান্ত ও ভদ্র; তোমাকে সংসারে সুখী করিতে পারিলে, আমি যারপর নাই সুখী হইতাম। কিন্তু মা লক্ষ্মি! কোন উপায় নাই।

বিলাসিনী নতমস্তকে ব্রহ্মচারীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কোন কথাই কহিল না। ভবানীপতি বলিলেন "দেখ মা! আমি বিপদে পড়িয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।" বিলাসিনী চমকিত, কুণ্ঠিত ও ভীত হইয়া বলিল "এ কেমন কথা! আপনার ন্যায় মহাপুরুষের মুখে, আমার ন্যায় দয়ার পাত্রীর প্রতি এরূপ তীব্র উক্তি কি ভাল শুনায়?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "মা! সত্য সত্যই তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি।" বিলাসিনী দেশ কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া, উন্নতগ্রীবা ফণিনীর ন্যায় ব্রহ্মচারীর দিকে তাকাইয়া বলিল "ঠাকুর! আপনি এই অস্পৃশ্যা ও অধমা অবলার শরণাপন্ন হইয়াছেন বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না? আমি কি আপনার ন্যায় সাধু ব্যক্তির এইরূপ বিদ্রূপের পাত্রী?"

ব্র। মা! আমি বিদ্রূপ করি নাই। তুমি আমার সমস্ত কথা শুনিলে, কখনই এরূপ উত্তেজিত হইতে না।

বি। যেরূপ অবস্থাতেই পড়ুন না কেন, আমার 'শরণাপন্ন' হইয়াছেন, বলিলে, আমার সর্ব্বনাশ করা হয়। যাহা হউক, আপনার কথা বলুন। আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে,অবশ্য তাহা সাধন করিব, এমন কি আপনার ইষ্ট সাধনের জন্য যদি অনলে বা সলিলে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাতেও ভীত বা অসম্মত নহি। আপনি বলুন।

ব্র। দৈবক্রমে তোমাদেরই মত একদল যাত্রী কোজাগরের সময়ে প্রয়াগে উপস্থিত হয়। ঘটনা-সূত্রে প্রকাশ পাইল যে, তাঁহাদের সঙ্গের একটী বালিকার সহিত বহু পূর্ব্বে কমলকুমারের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ সে সময়ে সে বিবাহ হয় নাই। এখন সেই বালিকার আত্মীয় স্বজন কমলকুমারের সহিত তাঁহাদের সেই কন্যার বিবাহ দিতে অগ্রসর। এই ব্যাপার অবগত হইয়া আমি কমলকুমারের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলাম। কিন্তু কমলকুমারের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করায় সে 'বিবাহ করিবেনা' বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। সে চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া আমার সঙ্গে পথে পথে ঘুরিতে চায়। কোন মতেই তাহার অভিপ্রায়ের দৃঢ়তা শিথিল করিতে পারিলাম না। এখন উপায় কি?

বি। আমি এ বিষয়ে কি বলিব?

ব্র। সে বলে, সে তোমাকে সংসারে ভাসাইয়া দিয়া, নিজে সুখে সংসার-ধর্ম্ম করিতে চায় না—করিতে পারে না; তাই চিরদিনের জন্য বিবাহ ও সংসারধর্ম্মের প্রবৃত্তি লোপ করিয়াছে।

বি। (অশ্রুপূর্ণ নয়ন নত করিয়া) তিনি মহৎ! এখনও এ দাসীর প্রতি তাঁহার যে এতাদৃশ অনুগ্রহ আছে, এ সংবাদে আমার ভগ্নহৃদয়ে শান্তিজল

সিঞ্চিত হইল। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন। আমাকে আর এই সকল বিষয়ে কোন কথা বলিয়া অধিকতর বিপন্ন ও কাতর করিবেন না। তিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, তিনি আমারই দেবতা, আমি এ জীবনে জন্মদোষে ও সুকৃতির অভাবে সে মহামূল্য ধন পাইয়াও পাইলাম না। এ জীবন ভরিয়া তপস্যা করি, পরজন্মে যেন তাঁহার সঙ্গলাভে স্বর্গ-সুখের অধিকারী হইতে পারি। আপনি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্র। আশীর্ব্বাদ করি, মা! যেন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

বি। হাঁ, তাই বলুন। আমি এ জীবনে কোন প্রত্যাশাই রাখি না। আর আমার জীবন যে ভাবে ভাঙ্গিয়াছে, ইহার মেরামতের চেষ্টাও বৃথা।

ব্র। তবে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এত দূর কেন আসিলে?

বি। কেবল একটীবার প্রাণ ভরিয়া চক্ষের দেখা দেখিবার জন্য। একবার ভাল করিয়া দেখিয়াই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। তাহার পর তিনি পৃথিবীর রাজা হউন, তাহাতে আমার সুখ বই, বিন্দুমাত্রও দুঃখের কারণ নাই। যে কয়দিন বাঁচিব, কেবল এক একবার দেখ্‌তে পেলেই হইল। আপনি বিশ্বাস করুন, স্ত্রীলোক সকলই সহ্য করিতে পারে।

ব্র। সে রাজা হ'লে—তাহাকে এক এক বার দেখ্‌তে পেলেই, সুখী হও এবং সকল দুঃখ সহ্য করিতে পার, এমন স্থলে তাহার সুখের পথ একটু পরিষ্কার করিয়া দাও না।

বি। কেমন করিয়া?—মরিয়া?

ব্র। মা! আমার প্রতি এরূপ পরুষ বচন, তোমার মুখে, ভাল শুনায় না। আমি কি তোমাকে মরিতে বলিতেছি?

বি। আপনি দেবতা হইয়া, তাঁহার গুরুদেব হইয়া, আমার 'শরণাপন্ন' হইয়াছেন বলিলে যদি দোষ না হয়, তবে আমার অজ্ঞতার দোষ ধরিবেন কেন?

ব্র। সে যখন তোমাকে উপেক্ষা করিয়া, তোমাকে ভুলিয়া, তোমাকে ত্যাগ করিয়া, সংসারে সুখী হইতে পারিতেছে না বলিয়া, বিবাহের সঙ্কল্প একবারে ত্যাগ করিল, তখন স্নেহের খাতিরে, অনুরাগের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, তোমারও কি তাহার সুখ ও সুবিধা সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে?

বি। প্রভো! তিনি এখন আপনার। আপনারই তাহা করা কর্ত্তব্য।

এখন তিনি যেমন আপনার, তিনি এক সময়ে আমারও তেমনই ছিলেন। তিনি আমার যেমন ছিলেন, তেমনই থাকিলে, আজ আমি আনন্দের সহিত নিজের সুখচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া—নিজের স্বার্থ-চিন্তা চরণে দলন করিয়া, তাঁহার সুখ সাধনে অগ্রসর হইতাম—আর সেই ভাগ্যবতী রমণীকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া দুবেলা সেই যুগল মূর্ত্তির পূজা করিতাম, কিন্তু আপনি আমার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন। আমার আর কি আছে—কি রাখিয়াছেন,যে,আজ আবার আমার 'শরণাপন্ন' হইতে আসিয়াছেন ? আর এ দগ্ধ হৃদয়ের শোকাবেগ বৃদ্ধি করিবেন না। আপনি আপনার কার্য্যে অগ্রসর হউন। আমি এই পুণ্যতীর্থে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিব এবং যথা সময়ে এই পুণ্যধামে তনু ত্যাগ করিয়া আমার হৃদয়-দেবতার জন্য অপেক্ষা করিব। ঠাকুর! আর আমাকে বিরক্ত করিবেন না—আমি দুঃখিনী ও ভিখারিণী, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এই বলিয়া বিলাসিনী গলবস্ত্রে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া যাইতে উদ্যত। ব্রহ্মচারী বিলাসিনীকে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। গৃহকর্ত্তা শ্রীধর বাবুর দ্বারা ত্বরায় একবার কমলকুমারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি গত রজনীতে আশ্রম-প্রান্তে একাকী এই অন্ধকার-পথে দিব্যালোক লাভ করিবার জন্য ত্রিলোকপতি ভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। সিদ্ধকাম ব্রহ্মচারী বিলাসিনীর নিকটও পরাজিত হইয়া আবার চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, এবং পুনরপি দেবপ্রসাদ লাভের জন্য মুহূর্ত্তের জন্য শূন্য দৃষ্টিতে বিধাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি পলক মধ্যে সেই অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হইল, ভবানীপতি কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইয়া পুনরায় নূতন উৎসাহের সহিত বিলাসিনীর দিকে তাকাইয়া কিছু বলিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই অনুসন্ধানে বহির্গত কমলকুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গুরুদেব কমলকুমারকে গৃহের অপরাংশে যাইতে দেখিয়া ইঙ্গিতে ডাকিলেন। কমলকুমার নিকটস্থ হইবামাত্র, তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, বাম হস্তে বিলাসিনীর দক্ষিণ হস্ত লইয়া, তদুপরি কমলকুমারের হাতখানি রাখিয়া বলিলেন "বৎসে! আজ বুঝিলাম, বিদ্যা বুদ্ধি, মান সম্ভ্রম, ও ধর্ম্মকর্ম্মে যাহা

না হয়, এক প্রেমেই তাহা সংসাধিত হইতে পারে, একজনের যদি আর কিছুই না থাকে, কেবল এক কণা প্রেম থাকে, তবে সে সেই কণার বলে সংসারের সকল প্রতিকূলতাই জয় করিতে পারে; আজ তোমার এই নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রবাহ দর্শন করিয়া তাহাই শিখিলাম। বহু পুণ্য-ফলে মানব যে উচ্চ লোক-লাভ করে, শাস্ত্রে আছে, এক প্রেমের বলে মানুষ তাহার শত গুণ সুখের অধিকারী হয়। আমি আজ এই বালকের নিকট, আর মা লক্ষ্মি! তোমার নিকট, কেবল যে পরাজিত হইলাম তাহা নহে, বুঝিলাম যে তোমাদের দুজনেরই হৃদয় আমার সংসার-সঙ্কীর্ণতার প্রান্তরে আবদ্ধ হৃদয় অপেক্ষা শত শত গুণে উচ্চ ও গভীর। আমার চক্ষে তোমরা বয়সে শিশু হইয়াও আমাকে অনেক শিখাইলে। মানব হৃদয়ের বিবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রেমই মহামূল্য ধন। যাহার জীবনে তোমাদের সংসার-সুখ-চিন্তা-শূন্য স্বর্গীয় প্রেমের ছায়া মাত্র পড়ে, সে ব্যক্তিও ধন্য, আজ আমি তোমাদের হৃদয়ের এতাদৃশ লোকবিরল মহদ্ভাব দর্শন করিয়া পুলকিত হইলাম। তাই আজ এই প্রয়াগধামে আমার সহোদরপ্রতিম স্নেহের পাত্র রামেশ্বরের একমাত্র পুত্রের দুঃখ দূর, সুখ বৃদ্ধি ও সর্ব্ববিধ শুভ সাধনের ভার তোমার হাতে ন্যস্ত করিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি। জীবনের যে ক্ষেত্রে তোমরা দণ্ডায়মান, আজ দেবপ্রসাদে বুঝিলাম, ব্রহ্মচারীর সেখানে অধিকার নাই। ব্রহ্মচারী দর্শক হইতে পারে, কিন্তু পরিচালক হইতে পারে না। মা লক্ষ্মি! তুমিই ইহার বর্ত্তমান শুভাশুভ নির্দ্দেশের ভার গ্রহণ কর। যেরূপ করিলে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধির অনুমোদিত বলিয়া বুঝিবে, তাহাই করিবে। আর আমি তাহাতে বাধা দিব না।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী বিদ্যুৎবেগে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

কি সুন্দর দৃশ্য! বহুক্ষণ পরস্পরে ব্রহ্মচারীত্যক্ত ধৃতহস্তে দণ্ডায়মান। পূর্ণিমার জোয়ারের জলের ন্যায় বেগে এক একবার প্রণয়ীযুগলের হৃদয়ে আকুলতার উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের হাতে প্রবল উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছে। গাঢ়তর অনুরাগের সহিত—গভীর নিরাশার সহিত—দারুণ মনস্তাপের সহিত, তাহারা পরস্পরের হাত বার বার দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতেছে—অনুরাগপূর্ণ, অবলম্বনশূন্য দেহ মনের সমগ্র শক্তি ঐ হস্তগ্রন্থির উপর আসিয়া পড়িতেছে! বিলাসিনীর হৃদয়ে সেই পূর্ব্বের প্রথম মিলনের সুখোচ্ছ্বাস দেখা

অসমর্থ হইয়া সে পড়িয়া যাইতেছিল, কমলকুমার তাহাকে ধ
...ন পূর্ব্বক নিজ ক্রোড়ে শয়ন করাইল। সময় এবং স্থান বি
...য়ের আবেগে বার বার তাহাকে নিজ ক্রোড়ে চাপিয়া ধ
...। বিলাসিনী শিথিল দেহে—ফুল্লহৃদয়ে—কমল-ক্রোড়ে—সুখের শ
...য়িত। আজ তাহার হৃদয় আর্দ্র—প্রাণটা পুলকপূর্ণ—আজ সে
সুধাসিঞ্চিত, তাই ক্রমে সবল ও সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। প্রফুল্ল
প্রফুল্লমুখী বিলাসিনী আজ সুখের হাসি হাসিয়া বলিল, "দেখ, সংসারে ত
ভাগ্যে ইহার অধিক সুখ নাই। আমিও প্রত্যাশা করি না। ত
ভাগ্যে যথেষ্ট হইয়াছে, আর না। এখন তুমি আমার—ষোল আনা আম
তোমার গুরুদেব তোমাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছেন। এখন
তোমাকে যাহা বলিব, তাহাই করিতে হইবে।"

ক। বজবজে যখন ছিলাম, তখন তোমার ছিলাম, তোমার কথা শু
এখন আমি কাহারও নহি, আমি আমার নিজের। তাই তোমার কথা
পারিবনা।

বি। শুনিতেই হইবে। শুনিবে কিনা স্পষ্ট বল। না শোন—আমি
আমার পথ দেখিব।

এই কয়টী কথা বিলাসিনী এমন দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত ব
কমলকুমার তাহার প্রত্যেক কথার পশ্চাতে অভিপ্রায়ের দৃঢ়তা
করিয়া ভয়ে ভীত ও বিশুষ্ক মুখে বিলাসিনীর মুখের দিকে তাকাইল।

বি। দেখছ কি? তুমি কি আমাকে মারিয়া ফেলিতে চাও?

কমলকুমার বিক্ষিপ্ত চিত্তে—সভয়ে বলিল "না—না—অমন ক
আনিও না।" বলিতে বলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বি। তবে বল—তুমি আমার—আমি যাহা বলিব তাহাই করিব

ক। আমি তোমারই, কিন্তু যা বলিবে তাই করিতে পারিব না।
আত্মবিক্রয় করিয়াছি—আত্মরক্ষাও করিতে চাহি।

বি। দুই হয় না। আমার হবে, আবার নিজেরও থাকবে, তা
যদি বিক্রয় ক'রে থাক, তবে তোমার দাবিই বা কোথায়, আর র
কিসের? কার জিনিস্ কে রক্ষা করে?

আমি আমাকে যাঁহার নিকট বিক্রয় ক'রেছি, তিনি ত ইহার মালিক। ...র সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমি দায়ী, তাই রক্ষা করিব—ছাড়িয়া দিব না। ... অন্যে দাবি করিলে রক্ষা করিও। মালিক নিজের জিনিসের উপর ...রিলে, জিনিসটা কি উঠে বল্‌বে তোমার জিনিস হ'লেও এতে হাত দিও ...মার তুমি, আমি তোমাকে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিব, যাহার নিকট ...খিয়া দিব। এতে তুমি কথা কহিবার বা বাধা দিবার কে? তোমার এখন আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, আমার কথার প্রতিবাদ করিও না, আমার বাধা দিও না, দিলে প্রমাদ ঘটিবে। বরং আমি তোমাকে যাহা যাহা ...ই গুলি কর।

... তোমার যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু আমায় দিক্ করিও না। তোমার ...য় মত চলা, যদি আমার শক্তিতে না কুলায়, তাহা হইলে কি করিব? ...সিনী বলিল "পুরুষ মানুষ, স্ত্রীলোকে যাহা পারে, তুমি তাহা পার না? ... পারিতেই হইবে। না পারিলে চলিবে না। তাও বল, যদি আমার ... মত কাজ হতে দাও ভালই, না দাও, তাও বল। কিন্তু এখনও বলি- ...বধান হও—এখনও আমার কথা শুনিলে উভয়েরই সুখের কারণ ...া শুনিলে, তোমার ভাগ্যে অনন্ত দুঃখ আছে। তুমি আমার কথা ...ল, আমি যাহা করিব এই দেখ।" বলিয়া জীবননাশের সহজ উপায়টী ... বলিল, "আমি ব্রহ্মচারীর কবল হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব ...সিয়াছিলাম। উদ্ধার করিতে না পারিলে জীবন বিসর্জ্জন দিব ...া তাহার আয়োজন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এখন তুমি আমার— ...আমার। তুমি যদি আমার কথা না শুনিয়া ... ... এ...শষ—কিন্তু এখনও বাঁচিতে... ...বা করিয়া সুখী হইতে সাধ যায়—তাই বলি... ...ম'লে এ ... পাবে না, আমিও আর পারব না।" ক...কুমার আর বিলা- ... তাকাইতে পারিল না। ... দিকে তাকাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন ...গিল। স্ত্রীলোকে এই মহত্ত্ব—এই দেবত্ব—এই স্বর্গশোভা দর্শনে ... প্রান্তে অবিরল ধারা প্রবাহিত হইল।

... বিলাসিনী কমলকুমারের দ্বারা ভবানীপতিকে আর একবার

ডাকাইয়া অতি বিনীত ভাবে তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া নিজের প্র
জন্ম বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল "দেবতা! আমি দুঃখিনী, এ ম
রত্ন লইয়া কি করিব? সংসারে আমার এ ধন রাখিবার স্থান নাই।
যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই লোকদুর্ল্লভ ধন দিয়া গিয়াছেন, ইহাই
জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য ফল—আমি কৃতার্থ হইয়াছি—ধন্য হইয়াছি। এক্ষণে
নার শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা এই যে, যেখানে যে অবস্থায় ইহাকে র
ইনি সুখে থাকেন এবং ইহার পিতার সুনাম রক্ষা হয়, তাহাই
আমি তাহাতেই সুখ এবং শান্তি পাইব। আপনার অনুগ্রহ হইলে, আ
সেই সুন্দরী ভাগ্যবতীকে বিবাহের পূর্ব্বে একবার দেখিতে পাই না?" ব্রহ্ম
ভবানীপতি বাষ্পাকুল লোচনে বিলাসিনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন।
তোমার হৃদয় কত বড়—তোমার প্রকৃতি কত সুন্দর, আমি তাহা
পারিলাম না; আর আমি ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী হইয়াও তোমার প্রতি কি
নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। আম
অপরাধের মার্জ্জনার্থে তুমি আমার নিকট এক বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ
আমি এ সকল কার্য্যের সুসম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে পারি।"

বিলাসিনী কমলকুমারকে দেখাইয়া বলিল "আমিও ইহার মতন অ
নিকটে আত্ম সমর্পণ করিতেছি। যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতে
যাহা করিতে বলিবেন, আমি তখন সেই খানে থাকিতে ও সেই কাজ
প্রাণপণ যত্ন করিব। ব্রহ্মচারী প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত
"মা! বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হইল।"

উপসংহার।

বিলাসিনীর জননীর বড় সাধ ছিল যে, মরিবার সময়ে কমলকুমারের পার্শ্বে উপবিষ্টা স্নেহের পুত্তলি বিলাসিনীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া কথা কহিতে কহিতে মরিবে। বৃদ্ধার ভাগ্য ভাল—তাহাই ঘটিল। বেণীতীর্থে ব্রহ্মচারী ভবানী-পতির আশ্রম-প্রান্তে কমলকুমারের সম্মুখে—বিলাসিনীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া কথা কহিতে কহিতে দেহত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কন্যার হাতখানি লইয়া কমলকুমারের হাতে রাখিয়া বলিল "বাবা! আমি চলিলাম, ওর আর কেউ নেই তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে উহাকে রক্ষা করিও।" কমলকুমার নতমস্তকে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কন্যা কাঁদিয়া আকুল। ভবানীপতি নিজের লোক দ্বারা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। নিরাশ্রয়া বিলাসিনীকে গঙ্গাধরের গৃহে রাখিয়া আসিলেন এবং তাহার এই শোকের অবস্থায় তাহার প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন ও যত্নের প্রয়োজন, তাহারও ইঙ্গিত করিয়া আসি-লেন। আসিবার সময়ে সুন্দরীকে বলিয়া আসিলেন "মা! ইহার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে, ইহার প্রতি সহোদরার ন্যায় ব্যবহার করিবে। তোমার আচরণে এই অনাথিনী তোমার প্রতি অধিকতর অনুরক্তা হইয়াছে দেখিলে, যারপর নাই সুখী হইব।"

দে গঙ্গাধরের মথুরা ও বৃন্দাবন-যাত্রা এযাত্রা স্থগিত রহিল। পরিজনবর্গসহ বাটীহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভবানীপতিও সশিষ্যে কমলকুমারকে সঙ্গে লইয়া স্থি:থা সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে অভিভাবকরূপে আ:মলকুমারকে লইয়া শ্রীধরপুরে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সহকারিতা দর্শনে করমলকুমারের দাদা কালীকুমার বরকর্ত্তারূপে এবং আত্মীয়রূপে ভগীপতি তো অন্যান্য স্বজনবর্গ অনেকে বিবাহে বরযাত্রী হইয়া শ্রীধরপুরে গমন করিলেন। নবীনকৃষ্ণও বিবাহে উপস্থিত হইলেন।

সি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার জীবনে যে প্রীতির রেখাপাত হইয়াছিল, যে প্রেমের অনুরাগের সূত্রপাত হইতে না হইতে, শুক্ল প্রতিপদের চাঁদের মত অদৃশ্য হইয়াছিল, যে সুখ-চন্দ্রের মুখ দেখিবার আশাসূত্র ছিন্ন হইতেছিল—দীর্ঘকাল বিরহ ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে—বিবিধ বিষাদ ও যন্ত্রণায় নিগৃহীত হইতে